আদান-প্রদান

লাল টিনের ছাদ

নির্মল বর্মা

অনুবাদ

তপশ্রী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইন্ডিয়া

ISBN 81-237-2916-2

1999 (শক 1921)

প্রচ্ছদ : লক্ষ্মা গৌড় কৃত তৈলচিত্র

Original Hindi title : Lal Teen Ki Chhat
Bangla translation : Lal Teener Chhad

মূল্য : 60.00 টাকা

নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

ভূমিকা

নির্মল বর্মা আধুনিক হিন্দি সাহিত্যে একটি সুপরিচিত নাম। 1974 সালে তাঁর লেখা উপন্যাস "লাল টিন কি ছত" (লাল টিনের ছাদ) হিন্দি সাহিত্যের একটি নতুন দিক খুলে দিয়েছে। এক জটিল ও বিচিত্র মানসিকতার ছবি তিনি এঁকেছেন তাঁর এই কালজয়ী উপন্যাসে যা ইতিপূর্বে হিন্দি সাহিত্যে সৃষ্টি হয়নি এবং পরেও যে হতে পারে সেরকম কোনও পূর্বাভাসও পাওয়া যাচ্ছে না।

প্রত্যেক মানুষ তার নিজের মধ্যে এক একটি বিচ্ছিন্ন দ্বীপ বিশেষ। তার মনের গহনে নানা রহস্যের আনাগোনা, যে রহস্য সম্বন্ধে সে নিজেই অনেক সময় সচেতন নয়। সে রহস্য তার অন্তরের আর এক 'আমি'র অস্তিত্ব, তার নিজেরই মধ্যে লুকিয়ে।

এই উপন্যাসের নায়িকা কায়া-এক কিশোরী বালিকা। কিশোরী বালিকা বলার অর্থ এই যে তার বাল্যসুলভ সরল বোধে সে এখনও বয়ঃসন্ধিক্ষণের জটিলতা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারেনি। আর এই জটিলতার মানসিকতা নিয়েই এই কাহিনী গড়ে উঠেছে। কায়া নামটিও একটি প্রতীক বিশেষ। বস্তুত এই মানসিক জটিলতার বিশ্লেষণেই মানবকায়ার রহস্য লুকিয়ে রয়েছে।

কাব্যে ও সাহিত্যে ইতিপূর্বে বয়ঃসন্ধিক্ষণের নায়িকাকে আমরা দেখেছি। বৈষ্ণব সাহিত্যের রাধিকা তাঁর শারীরিক বিবর্তন ও পরিবর্তনে উল্লসিত, আহ্লাদিত, বিস্মিত ও বিমোহিত হয়েছেন। তাঁর এই "ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি" রূপটির সঙ্গেই পাঠক পরিচিত। কিন্তু শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর মানসিক পরিবর্তন বা যন্ত্রণার কোন উল্লেখ কাব্যে পাওয়া যায়না।

উল্লিখিত উপন্যাসের কিশোরী নায়িকা বয়ঃসন্ধিক্ষণের এই জটিল মানসিকতায় উদ্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তার প্রতি মুহূর্তের যন্ত্রণা, উদ্ভ্রান্তি ও নিঃসঙ্গতার চুলচেরা বিশ্লেষণ লেখক করেছেন। তিনি যেমন যেমন সুতোর জট পাকিয়ে তুলেছেন, তেমনি ধীরে ধীরে সে জট তিনি খুলেও দিয়েছেন। "লাল টিন কি ছত" পড়ার সময় লেখকের এই চুলচেরা বিশ্লেষণের মানসিকতা নিয়েই পড়তে হবে। অন্যথায় এই উপন্যাসটি জটিল, ভারাক্রান্ত ও দুর্বোধ্য বলে মনে হতে পারে।

কিশোর বয়সের মানসিক উদ্ভ্রান্তি ও তার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের যথেষ্ট নজির

বিশ্বসাহিত্যে পাওয়া যায়। জেমস জয়েসের "পোর্ট্রেট অব দ্য আর্টিস্ট অ্যাজ এ ইয়ংম্যান" এর একটি দৃষ্টান্ত। হিন্দি সাহিত্যে শ্রীঅজ্ঞেয়-র লেখা "শেখর"-এও এই বিশেষ 'থিম'টি দেখতে পাওয়া যায়। তবুও "লাল টিন কি ছত" উক্ত রচনা দুটি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এই উপন্যাসটির সঙ্গে ধ্রুপদী মার্গ সঙ্গীত বা আধুনিক চিত্র শিল্পের তুলনা করলে বোধকরি অত্যুক্তি হবে না। মার্গ সঙ্গীত বা আধুনিক চিত্র শিল্প সকলে উপভোগ করতে পারেন না। যাঁরা পারেন, তাঁরা রসের সাগরে ডুবে যান—অন্যেরা "ও রসে বঞ্চিত গোবিন্দদাস" হয়ে থাকেন। এই উপন্যাসটির ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য।

বয়ঃসন্ধিক্ষণের মানসিকতা যেমন জটিল, তেমনই গহীন। সুতরাং তার বিশ্লেষণও প্রচলিত সাহিত্যিক ভাষায় সব সময় সম্ভব নাও হতে পারে। সেজন্যই বোধকরি লেখকও তাঁর বর্তমান উপন্যাসে সাহিত্যের প্রথম সারির ভাষা ছেড়ে (হিন্দি সাহিত্যে) সম্পূর্ণ কথ্য ও অপ্রচলিত ভাষা ব্যবহার করেছেন—যা ইতিপূর্বে কেউ করেননি। এ ধরনের কথ্য ভাষা বস্তুত হিন্দি সাহিত্যে নির্মল বর্মাই প্রথম ব্যবহার করেছেন বললে সত্যের অপলাপ হবে না। কাজেই ভাষা ও আঙ্গিকের দিক থেকে তিনি হিন্দি সাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছেন।

তাঁর উপন্যাসের বর্ণিত চরিত্রগুলি ঠিক সাধারণ মানসিকতার নয়। তারা যেন সব ছাড়া ছাড়া। ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে—কারুর সঙ্গে কারুর কোন যোগাযোগ নেই। মানুষের যে সহজাত সংবেদনশীলতা বা চেতনা থাকে, চরিত্রগুলির মধ্যে সে মানসিকতা পাওয়া যায় না, বরঞ্চ তারা এই সহজাত প্রবৃত্তিগুলির বাইরে কোন এক গূঢ় জটিল স্তরের মধ্যে ঘুমিয়ে থাকে। তাদের সেই অতল গহ্বর থেকে টেনে তুলতে হলে, ভাষাকেও ঠিক তাদেরই মতো অপ্রচলিত ও অবোধ্য হতে হবে। এই অবোধ্যতার মধ্যেও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণশীলতা রয়েছে, যার মাধ্যমে এক এক করে মানসিক জটিলতার জট খুলে গেছে। এখানেই লেখকের কৃতিত্ব। মানুষের, বিশেষত দুর্বোধ্য কিশোরীর মনের গহনে ডুবুরীর মতো ডুব দিয়ে এক একটি রহস্যকে উপরে টেনে তুলে তার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং তার উপর যবনিকার পর্দা ফেলে দেওয়ার জন্য যে দুঃসাহস ও ভাষার বন্ধনীর প্রয়োজন, সেই দুঃসাহসিকতার পরিচয় পাই কায়া, লামা ও "নথওয়ালী ঔরত"-এর চরিত্রে। ভাষার এই স্টাইল নির্মল বর্মাকে হিন্দি সাহিত্যে অগ্রণী করে তুলেছে। চরিত্রের রহস্যোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে লেখক খুব সহজ কিন্তু সূক্ষ্মভাবে জন্ম, মৃত্যু, অন্তর্দৃষ্টি, অতিপার্থিবতা ইত্যাদি মেটাফিজিকাল বা অধিবিদ্যানির্ভর তত্ত্বেরও অবতারণা করেছেন। যেহেতু এইসকল অভিজ্ঞতা একটি অপরিণত ও অপরিপক্ক কিশোর মনের ফসল, তাই লেখকও তাঁর বর্ণনাশৈলীতে সেইরকমই এক ভাষার কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করেছেন। গল্পের এই ঠাসবুনুনীর একটি সুতোও যদি কোনক্রমে পাঠকের

মনোযোগচ্যুত হয়ে পড়ে অথবা সম্যক পরিস্থিতিটুকু তার বোধগম্য না হয়, তবে এই উপন্যাসটিও সেই কিশোরীর মনের মতোই অন্ধকারাচ্ছন্ন গোলকধাঁধায় পর্যবসিত হয়ে পড়বে। ঔপন্যাসিক অসীম সাহসে সাহিত্যের দরবারে বিষয় ও ভাষার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে এক অদ্ভুত ঝুঁকি নিয়েছেন।

ইতিপূর্বে অনুরূপ বিষয় নিয়েই নির্মল বর্মা তাঁর "দহমিজ" নামক রচনাটি লিখেছেন। এই রচনা লেখকের সাহিত্যচর্চার প্রারম্ভের ফসল, প্রায় পনেরো/কুড়ি বছর আগেকার রচনা। এই বিষয়টিরই ব্যাপক ও বিস্তৃত রূপের প্রকাশ দেখতে পাই বর্তমান উপন্যাসটিতে। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, কিশোরীর মননশীলতা লেখকের একটি প্রিয় 'থিম' বা বিষয়বস্তু।

বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে কায়ার শারীরিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক পরিবর্তন ক্লিনিকল বা চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় 'biological transformation through menstrual cycle' এবং 'premenstrual tension' (রজোদর্শনের পর শারীরিক রূপান্তর ও প্রাক্-ঋতু মনঃপীড়ন) ছাড়া আর কিছুই নয়। কায়া ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে এবং হঠাৎ একদিন সে পূর্ণযৌবনা নারীর প্রথম সোপানে পদক্ষেপ করে। কিন্তু এই সহজ ও সামান্য বিষয়টিকে লেখক তাঁর সংবেদনশীল মন ও সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী শক্তিতে একটি পরিপূর্ণ মনোবিজ্ঞানের কাহিনী গড়ে তুলেছেন।

উল্লিখিত তত্ত্বগুলি ছাড়াও এই উপন্যাসের আর একটি দিক রয়েছে। সেটি হল, তৎকালীন ইংরেজ সভ্যতার অবদান — অতিরিক্ত অনুশাসনপ্রিয়তা ও একের সঙ্গে অপরের সহজ ও সরল সম্পর্কের অভাব। যেমন — কায়ার বাবু যখনই তার ও ছুটুর ঘরে ঢোকেন, তখনই দরজায় 'নক্' করে ঢোকেন। অথবা বিরু সন্ধ্যারাত্রেই একা একা খেয়ে নিয়ে তার নিজের ঘরটিতে বসে পিয়ানো প্র্যাকটিস করে। তার বাবা তার ঘরে এসে তার সঙ্গে দেখা করে যান। এই যে এক সহজ, সরল স্বাভাবিক সম্পর্কের ও স্নেহ-ভালোবাসার অভাব, এবং ঠিক এর বিপরীত একটি শ্বাসরোধকারী ভাব রয়েছে, এতে করে সকলেই যেন একক ও নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছে। শ্বাসরোধকারী পরিবেশ থেকে কায়া, ছুটু, মিস্ জোসুয়া বা কায়ার মা, এমনকি তার কাকা বা তাঁর রক্ষিতা নথধারিণী মহিলাটিও রেহাই পায়নি। সকলেই যেন নিজ নিজ গণ্ডীভুক্ত হয়ে এক অদৃশ্য নিঃসঙ্গতার জালে বদ্ধ হয়ে আছে এবং তার ফলস্বরূপ সকলেই অল্পবিস্তর মানসিক ভারসাম্য বজায় রাখতে অক্ষম হয়েছে। এই বিকৃতি ভয়াবহ। উপন্যাসের এই ভয়াবহ দিকটি তৎকালীন সমাজে অসার দম্ভেরই পরিচায়ক। 'স্লো-পয়জনের' মতোই এই আত্মশ্লাঘা চরিত্রগুলিকে কুরে কুরে খেয়েছে।

উপন্যাসের এই দিকটির সঙ্গে এমিলি ব্রন্টির "দ্য উইদারিং হাইট্সের" সাদৃশ্য

রয়েছে। যদিও এই উপন্যাসটির (উইদারিং হাইট্স) ভয়াবহতা "লাল টিন কি ছত" এর মধ্যে পাওয়া যায়নি। কিন্তু অস্বাভাবিক পরিবেশ, ভয়াবহ নির্জনতা, হলদে অবসন্ন পড়ন্ত রোদ বা ম্লান পীতাভ চাঁদ এবং বিভিন্ন চরিত্রের নিঃসঙ্গতা, পাণ্ডুর ও অসুস্থ অবসন্নতা—'মেলানকলি' তে 'দ্য উইদারিং হাইট্স্-এর' আভাস পাওয়া যায়।

লেখক তাঁর সূক্ষ্ম নিপুণ লেখনীতে যেমন এক এক করে জট বাধিয়ে তুলেছেন, উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু কায়ার যৌবনে উত্তীর্ণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে জট আপনি খুলে গিয়ে জীবন আবার স্বাভাবিক, স্বচ্ছন্দ গতিতে বইতে শুরু করেছে। এইখানেই উপন্যাসটির সাফল্য, লেখকের কৃতিত্ব। তাঁর সংবেদনশীলতায়, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণী ও জটিল মানসিকতার নিখুঁত বিশ্লেষণে উপন্যাসটি 'ক্লাসিক' হয়ে ওঠার মর্যাদা রাখে।

বিজয় মোহন সিং

প্রথম খণ্ড

এক নিঃশ্বাসে

লাল টিনের চালা

জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা—সব তৈরি। জিনিসপত্র বলতে বিছানা, পুঁটুলি ও একটা স্যুটকেস। বাইরে ঘোড়াগাড়ি দাঁড়িয়ে। ঘোড়ার লাগাম ধরে কুলি নির্বিকার চোখে তাকিয়ে রয়েছে বাড়িটার দিকে। বাড়ির গ্যালারীতে দাঁড়িয়ে চারটি পুরুষ, একটি নারী আর একটি ছোটখাটো মেয়ে—ছোটখাটো না বলে বামন বলাই বোধকরি ঠিক, আর একটু তফাতে দাঁড়িয়ে বয়স্ক পুরুষও নয় বাচ্চাও নয়, নেড়া মাথা একটি ছেলে, তার আকর্ণ বিস্তৃত হাঁ করা মুখে এক বিচিত্র হাসি! ... বাড়ির লাল টিনের ছাদ দুপুরের রোদে কাচের মতো ঝকঝক করছে।

মার্চ মাসের সময়! চারপাশে মধ্যদুপুরের স্তব্ধতা! কুলি এবার একটু অধৈর্য হয়ে ওঠে! আর কোনও মাল বোধকরি বাড়ির ভিতর থেকে আসবে না। সব তো এক কোণে জড়ো হয়েই রয়েছে। ... টাট্টু ঘোড়াটা মাথা নাড়লে। কুলি আর একবার নিস্পৃহ দৃষ্টিতে বাড়িটার দিকে তাকায়। সেই চারজন আগের মতই গ্যালারীতে রেলিঙের পিছনে স্থানুবৎ। ভাবটা, যেন রোদে পোজ দিয়ে ছবি তুলছে! নীচের তলার সব কটি ঘরের দরজা বন্ধ। শুধু বাগানের দিকের গেটটা খোলা। গেটের উপর আঙটায় ঝুলছে টিনের লেটার বক্স—ঠিক যেন একটা মরা পাখি উল্টো হয়ে ঝুলে রয়েছে। হাওয়াতে সেটা ঠকঠক করে নড়ে উঠতেই টাট্টু ঘোড়াটা চমকে উঠলে—তার ছলছলে চোখে রাজ্যের ক্লান্তি! ... হঠাৎ একটু চাঞ্চল্য! কুলির নজর এবার উপরের বারান্দায়। একটি মেয়ে বেরিয়ে এসেছে, তার পিছন পিছন একজন আধবুড়ো লোকও। হাবেভাবে মনে হয় বাড়ির চাকর। মেয়েটার কাঁধে একটা ব্যাগ। মাথার লম্বা বিনুনি কাঁধের উপর ছড়িয়ে আছে। পরণে আধময়লা কাপড়। লোকটার ঘসে ঘসে হাঁটার ঠেলায় নড়বড়ে বারান্দাটা নড়ে উঠল। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে, হঠাৎ মেয়েটি থমকে দাঁড়ায়। বোধকরি কিছু ভুলে ফেলে এসেছে—দ্রুত সিঁড়ি বেয়ে আবার উপরে ওঠে, বারান্দার পিছনের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যায়। কোথায় গেলরে বাবা, কুলি ভাবল! টাট্টু ঘোড়াটা আবার ল্যাজ নাড়ল। চাকরটা মেঝের উপর ব্যাগগুলো ফেলে দিয়ে তার পিঁচুটি ভরা নোংরা পিটপিটে চোখে পাহাড় দেখতে থাকে—মার্চের ঝকঝকে রোদে তুষারধৌত উত্তুঙ্গ উলঙ্গ পর্বতমালা।

মেয়েটি নিজের ঘরের পিছনে এসে দাঁড়ায়। একটি ছেলে সেখানেই দাঁড়িয়ে।

একটি অল্পবয়সী কিশোর, যার বড় বড় দুটি চোখে অনন্ত জিজ্ঞাসা। মাথার একরাশ এলোমেলো চুল। সে শুধু তাকিয়ে থাকে। —"আমি চললাম!" মেয়েটির ঠোঁট কেঁপে ওঠে। চাপা কণ্ঠস্বর শোনা গেল না। ছেলেটি পিছন ফিরল। মেয়েটি কাছে এগিয়ে যায়। তার একবার মনে হলো—ফিরেই যায়। কিন্তু পা সরল না। গত শীতের ছুটির দিনগুলি যেন এই মুহূর্তে আবার ফিরে আসে। ... শ্বাসে-প্রশ্বাসে সেই কবোষ্ণতা, হু হু শীতের হাওয়া আর বরফের স্পর্শ যেন আবার অনুভব করতে লাগল। মার্চের এই গরম রোদে ফেলে আসা সেই শীতের উষ্ণতা মূর্ত হয়ে উঠল।

—"কায়া, কায়ারে!", নীচ থেকে ডাক এলো। নীচের সকলে অপেক্ষা করছে, কায়া কখন নামবে। গ্যালারীতে অপেক্ষারত সেই চারজন কুলি, টাট্টু ঘোড়া, এমনকি বাড়ির চারদিক ঘিরে থাকা ঝকঝকে পাহাড়ও তখন নিঃশব্দ প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে।

এক

চোখ খুলেই আবার চোখ বন্ধ করে ফেলল। সময় এগিয়ে চলেছে। শরীর টানটান করে চাদরের খুঁট শক্ত করে হাতের মুঠোয় চেপে ধরে। একবার মনে হলো মাথাটা যেন পায়ের কাছে, যেখানে দরজা ছিল, সেখানে সরে এসেছে। ধ্যাৎ, তাই কখনো হয়? পা আর মাথা একজায়গায় একসঙ্গে কি করে থাকে? ওর বেদম হাসি পেল।

—"এই, স্... স্... স্... স্! দেখতে পেলে কিছু?"

—"নাঃ ...।"

—"তাহলে হাসছিলে যে?"

ছুটু এই ধরনের ছোটখাটো কথা একেবারেই বুঝতে পারে না। তাইতেই তার জেদ আরও বেড়ে যায়। অতি সমঝদারের মতো মাথা নেড়ে, নানান ছুতোয় ভিতরের কথা জানবার চেষ্টা করত ও। সবথেকে বেশি অসহ্য বোধ হতো তার, যখন সে তার বেদনা নিয়ে সহ্য শক্তির সীমানা ছাড়িয়ে রহস্যময়ী হয়ে উঠত। ছুটু যদি তার সঙ্গে সে সময় খেলা করতে পেত, তাহলে বোধকরি তার রহস্যময়তাটুকুও সে সহ্য করতে পারত।

ও কাঠ হয়ে শুয়ে রইল।

বাইরে কাঠের বারান্দাটা গুড়গুড় করে নড়ে উঠল। পুরো বাড়িটাই কাঠ দিয়ে তৈরি। কাজে কাজেই একটু চাপ পড়লেই শব্দ হয়। এমনকি জোরে হাওয়া দিলেও বারান্দাটা, মায় পুরো বাড়িটাই নড়ে ওঠে। যত না নড়ে, তার চেয়ে বেশি শব্দ হয়।

—"কায়া, কে এসেছিল?" ছুটুর জিজ্ঞাসা।

—"কেউ না!" কায়া উত্তর দিল। তবুও মনে হলো, কি জানি, হতেও পারে কেউ এসেছিল—আবার একটা ক্ষীণ আভা কায়ার মনে।

হঠাৎ মনে হলো, গলার মধ্যে একটা দলা যেন আটকে আছে। লামার চলে যাওয়ার পর থেকেই নানা বোঝাপড়ার মধ্যে ওদের নিজেদের যত টানাপোড়েন। ওরা তার ঘরের দরজা ভেজিয়ে রাখত, শিকল দিত না। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে দু'জনে রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকত, কখন হাওয়ায় খটাস করে দরজা আপনি খুলে যাবে আর লামা বাইরে বেরিয়ে এসে পায়চারি করবে ঠিক আগের মতো। তখন পাহাড়ের উপর থেকে অঢেল চাঁদের আলো ভেসে আসবে, যে আলোয় পুরো

বাড়ি, বারান্দা, চালা ভেসে যাবে, সেই আলোয় ওরা লামাকে দেখবে। ... কাজেই বারান্দা একটু নড়ে চড়ে উঠলেই ওদের মন দুলে ওঠে—কে এলো?

ও বিছানার উপর উঠে বসলে। এত বড় বাড়িতে, কোথাও না কোথাও সব সময় কিছু নড়ে-চড়ে ওঠে, ঠকঠক শব্দ হয়, মনে হয় ওই বুঝি এলো! বর্তমানের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে অতীতের সুতো ধরে প্রতিদিন রাতে কল্পনার জাল বুনে তাকে সঞ্জীবিত করে "নাই রাজ্যে" তাদের এই সংসার পাতা, যেখানে হলেও হতে পারে —আশা ও আশঙ্কার এই যে খেলা, এরও কি কোন অন্ত ছিল?

—"তুমি দেখোনি? আলো জ্বলছিল যে!"

—"কিসের আলো?"

—"ঘর ও গ্যালারীর মাঝে, সিঁড়ির উপরে!"

—"তুই একটা আস্ত পাগল ..." কায়া শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে বললে—"ও তো বাবু ছিলেন। মঙ্গতু যে ঘরের আলো জ্বালিয়ে রেখেছিল। কলঘরের কল খোলা ছিল, তুই কি জল পড়ার শব্দ শুনিসনি?"

—"কলের জল পড়ার শব্দ?" ছুটু হাসতে লাগল। ভয় পেয়ে ওর হাসিও যেন ভয়ানক হয়ে উঠেছে—"তুমি কি মিথ্যুক কায়া! প্রচণ্ড মিথ্যাবাদী তুমি!"

—"হ্যাঁ জলই তো পড়ছিল।" কায়া হাঁপাতে লাগলে। চোখ বন্ধ করে থাকলেও আমি সব শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু ... কিন্তু ... এছাড়াও আমি আরও অনেক কিছু শুনেছি ..." কায়ার স্বর কেঁপে উঠল। সে যেন বাতাসে অলীকের বুদ্বুদ ফেলে চরম মিথ্যাকেও সত্য প্রতিপন্ন করতে চলেছে।

—"কি শুনেছ তুমি, অ্যাঁ? কি শুনেছ? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে। কি শুনেছ বল!" —ছুটু ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলে। এখন আর ও মুরুব্বির সুরে কথা বলছে না। ও এখন জানতে চায় যে কায়া কোন রহস্যের উদঘাটন করতে চলেছে।

—"ঠিক আছে, আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" ও যেন ছুটুর কাছ থেকে সরে যায়—"আমি মিথ্যাবাদী।"

—এবার ছুটু কাঁদো কাঁদো—"আমি মোটেই তা মিন করিনি। কিন্তু তুমি শুধুমুধুই হাওয়ার পিছনে দৌড়ও। যা নয়, যা নেই, তাই কল্পনা করে কষ্ট পাও।"

—"কে বললে যে যা নয়, যা নেই? তাই-ই যদি হবে তাইলে তুমিই বা কি করে এখানে এলে ছুটু? বল তুমি কেন, কি করে এসেছ?" এমন ব্যাকুল স্বরে ও আগে কখনও এমন কথা বলেনি। ... প্রতিদিন ওরা এইভাবে রাত হলেই আলো বন্ধ করে, জানলা খুলে পথ চেয়ে বসে থাকত। বাইরে সোঁ সোঁ করে বাতাস বইত। অক্টোবর মাসের হিমেল হাওয়ায় চালের উপর গাছের শুকনো পাতা ও ডাল ঝরে পড়ত, সে শব্দও তাদের কানে যেত না। ওরা শুধু নিজেদের খেয়ালী দুনিয়ার খেয়া বেয়ে চলত—পাহাড়ের নিস্তব্ধ কোলাহলের মধ্যে নিজেদের বিলীন করে দিত।

শিকারী কুকুরের মতন, তারাও বাল্যস্মৃতির গহীন অরণ্যে ডুব দিয়ে সেই সময়ের এক-একটি শব্দ ও স্পর্শকে শুঁকে শুঁকে অর্ধ-চর্বিত করে, বর্তমানের কোঠায় সযত্নে রেখে দিত, যাতে করে গভীর রাতের নিস্তব্ধ জনারণ্যে সেগুলিই বার করে চর্বণ করা যায়। এই চর্বিত স্মৃতি-ভোজ্যের প্রধান উপকরণ ছিল লামা —পিসির মেয়ে কিছুদিন এখানে থেকে যে হঠাৎ চলে গেল। এখানে থাকাকালীন লামার আলাদা একটি ঘর বারান্দার অপরপ্রান্তে ছিল—তার প্রস্থানের পরেও সেটি সেভাবেই খালি পড়ে রয়েছে। কেউই সে ঘরের কোনও জিনিস ছোঁয়নি। ঘর যেমন কে তেমনই আছে, দেখলে বোঝা যাবেনা যে এঘরে এখন লামা থাকেনা— বরঞ্চ মনে হবে যে সে আছে এবং থাকবে তার কাছ থেকে কারুর নিস্তার নেই। তার এত স্মৃতিও ঘরটার সঙ্গে জড়িয়ে আছে যে তার অনুপস্থিতির বোধ এই দুজনের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব।

কায়া লেপ সরিয়ে চুপচাপ উঠে পড়লে। তারপর পা টিপে টিপে বারান্দায় গিয়ে হাজির হলো। ... বারান্দায় কেউ নেই! সিঁড়ির আলো জ্বলছিল। রাতে এটা জ্বালানোই থাকত। সিঁড়ির শেষ ধাপের কাছে, নীচে মিস জোসুয়ার ঘর। সিঁড়ির সবচেয়ে উপরের ধাপে সকলের জুতো রাখার জায়গা—বাবু, কায়া, ছুটু—সকলের আলাদা আলাদা জায়গা। কিন্তু এখন সব এদিক-ওদিক হয়ে গেছে। বারান্দার কম পাওয়ারের আলোয় এখন এদিক-ওদিক করা জুতোগুলোকে ঠিক যেন এক সরীসৃপ জাতীয় জীবের মতো দেখাচ্ছে। বাবুর জুতোয় তার মাথা তৈরি হয়েছে, কায়ার চটি জুতোয় পা! জুতো রাখার এই অভ্যাস এ বাড়ির এক বহু পুরানো নিয়ম। রাতে শুতে যাবার আগে সকলেই যে যার চটি-জুতো খুলে সিঁড়ির ধাপে রেখে দিত আর পরদিন সকালে চাকর হরিয়া সেগুলোকে বুরুশ করে চকচকে করে আবার যথাস্থানে রেখে দিত।

বারান্দার কোণে দাঁড়িয়ে কায়া একটুকরো খালি জায়গায় একদৃষ্টে চেয়ে রইলে। এখানে লামার চটি এককালে থাকত। অবশ্য জায়গাটা পুরোপুরি খালি নেই—শূন্যস্থান পূর্ণ করেছে এক পরত ধুলো। কায়ার ভেবে অবাক লাগল যে কখনই কোনও জায়গা খালি থাকেনা। লোকে ঘর ছেড়ে চলে গেলেও সেখানে শূন্যস্থান পূর্ণ করে ঝুল। ধুলোবাতাসে সেটি আরও পুষ্ট হয়ে ওঠে। কায়ার মনে হলো যে সে যেন ওই ঝুলের ধুলোর জটাজালে জড়িয়ে পড়েছে। কাছেই লামা— যদিও তাকে কেউই দেখতে পাচ্ছেনা, কিন্তু সে পাচ্ছে। —নাঃ কোনও জায়গাই খালি পড়ে থাকেনা—কেউ কাউকে কখনই ছেড়ে যেতে পারেনা—কায়া মনে মনে বলল।

ছুটু কায়ার ফেরার অপেক্ষায় অনেকক্ষণ একা একা চুপচাপ শুয়েছিল— কিন্তু

কায়ার দেখা নেই। ছুটু বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দার চারদিকে চোখ বুলোলে। বাড়ির অন্যান্য সকলে তখন ঘুমে কাদা। চতুর্দিকে শান্ত নিঃশব্দতা। এই নিঃশব্দতাকে চিরে লামার ঘরের দরজা ক্যাঁচকোঁচ করে কখনও খুলছে—কখনো বন্ধ হচ্ছে। দুজনে অন্ধকারে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে একে অন্যের শ্বাস-প্রশ্বাস অনুভব করলে।

—"তুমি কারুকে দেখতে পেলে?" ছুটু ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলে। কায়া কোনও উত্তর দিলে না। কেবল তার সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি বারান্দার আনাচ-কানাচ নিরীক্ষণ করছিল। ... জংলী আগাছার একটা বলয় বেল্টের মতো বাড়িটাকে ঘিরে রয়েছে। তারপরেই ঘন জঙ্গল। তারও ওপিঠে দূরে পাহাড়শ্রেণী। অন্ধকারে এখন পাহাড় দেখা যাচ্ছেনা, কেবল দু'একটি টিমটিমে আলো নজরে পড়ছে। অন্ধকারে ঠাহর করা যায় না যে টিমটিমে আলোগুলি বাতি না তারা! কায়ার মনে পড়ল এই বাতি নিয়ে সে, ছুটু ও লামা আলোচনা করত। তিনজনে জানলার ধারে বসে ঠাহর করত কোনটা বাতি, কোনটা তারা! লামা বলত—"একটা চোখ বন্ধ করে আর একটা চোখ দিয়ে দেখো, বুঝতে পারবে কোনটা তারা। যদি মিটমিট করে, বুঝবে ওটা তারা। তা নাহলে হয় সেটি বাতি কিংবা ল্যাম্পপোস্ট অথবা কোন জন্তুর জ্বলজ্বলে চোখ।" —লামা ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করত না। সে মনে করত আমরা মানুষেরা এক একটি জন্তু বিশেষ। অবশ্য আমরা কেউই এ বিষয়ে সচেতন নই। আমরা যে খাই-দাই তার কিছুই আমাদের নিজের জন্যে নয়, আমাদের শরীরে অবস্থিত সেই বিশেষ জন্তুটির জন্য। যখন এ তথ্য সম্পর্কে আমরা সচেতন হই, তখন লজ্জার দরুন এ কথাটি প্রকাশ করিনা—লামা সবসময় বলত।

ছুটুর গায়ে হঠাৎ কাঁটা দিয়ে উঠল। কতক্ষণ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে তারা?

—"কায়া, ঘরে যাবিনা?" ... আসলে ছুটু ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল, তাই একা ঘুরে ফিরে যাবার কথা ভাবতেই পারছিল না। এছাড়া ও কায়ার সঙ্গে ছিনে জোঁকের মতো আটকে থাকতে চাইত, কেননা ও জানত কায়া যা দেখে বা শোনে, সে কথা কখনও মুখ ফুটে প্রকাশ করেনা। দিদিকে গার্ড করে তাই ছুটু সঙ্গে সঙ্গে থাকে। যদি কোনও ঘটনা ঘটে যায় আর ও সঙ্গে না থাকে, তাহলে বোনকে কে আগলাবে? ছুটু ঘুমের মধ্যেও তাই সজাগ থাকার চেষ্টা করে।

কায়া একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে—নাঃ, কিস্যু হলোনা। তার সর্বশরীরে এবার ক্লান্তি এলিয়ে এলো। পিছন ফিরে ছুটুর কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে সে এক ধমক দিলে—"তুই এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? কেউ নেই এখানে। তুই কি মনে করিস লামা এখানে আসবে? যা যা, ঘরে যা।" —ছুটু আড়চোখে কায়াকে দেখলে। বেচারী! ওর রাগ দেখে দয়া হয়। কায়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকেও কেমন যেন বেচারা বেচারা বলে মনে হয়। কি লাভ হচ্ছে ওদের? ওরা যে এই ভরদুপুর রাতে

বারান্দায় ভূতের মতো দাঁড়িয়ে—না ঘুমে না জাগরণে—কোথায় খরখর হলো, কোথায় ঠকঠক করে কি শব্দ হলো, অমনি দেখতে ছুটলে, এটা পাগলামী ছাড়া আর কি? একটা অলীক স্বপ্নের জাল বুনে, যা অসম্ভব তাকে সম্ভব করার এই যে প্রচেষ্টা ও তাতেই আত্মতৃপ্তি খোঁজা, এতে গৌরবের কি কিছু আছে? একবার মনে হলো ও কায়ার দু'হাত ধরে মিনতি করে—"ঢের হয়েছে বাপু, এবার ক্ষ্যামা দাও বোন। আমি না হয় কাল থেকে মার সঙ্গে তাঁর ঘরে শোবো। তোমার প্রাণে যা চায় কর, যে চুলোয় যেতে চাও যাও, আমি আর এই পাগলামীর মধ্যে নেই।"

কায়ার ঘরও তারই মতো আগোছালো ও হাবিজাবি জিনিসে ভর্তি। দুটো খাট, একটি টেবিল, তার উপর রাজ্যের বইখাতায় ধুলোর পরত, দুই খাটের মাঝে একটি ছোট তেপায়ার উপর হিজিবিজি জিনিস—মরা প্রজাপতির পাখনা ক্যাডবেরী চকোলেটের মোড়ক ও কিছু শেকড়-বাকড় পরম অবহেলায় পড়ে থাকত। সব কিছু মিশিয়ে একটা উদ্ভট গন্ধ বেরুতো। এগুলি শুধু কায়ারই সম্পত্তি ছিল— এখানে ছুটুর কোনও স্থান ছিল না। সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়ে যেমন সব ভিজিয়ে একাকার করে ঢেলে দেয় অজস্র ঝিনুক ও নুড়ি, তেমনই কায়ার বাইরের ও ভিতরের জগতও একাকার হয়ে ছিল—গাছের লাল শুকনো পাতা, বাঁশের কঞ্চি, ন্যাতার টুকরো ... যেমন যেমন বাইরের আবহাওয়া বদলাতো, ঘরেরও জিনিস তেমন বদলাতো। আগে গিনী কুকুরও মুখে করে রাজ্যের অখাদ্য জিনিস ঘরে এনে পুরতো—মৃত পশুর হাড়গোড়, পাখির বাসা, কাঠকুটো! এখন গিনী মরে গেছে, কিন্তু তার জড়ো করা জিনিসগুলি এখনও কাঠের নীচে যথাবৎ রয়ে গিয়েছে।

দুজনে চুপিচুপি অন্ধকারের মধ্যেই ঘরে ফিরে এলো। বাতি জ্বালালেই মা জেগে যাবেন। শান্ত ভালোমানুষ মা এত রাতে বাতি জ্বলছে দেখে মুখে কিছু না বললেও মনে মনে অস্বস্তি ও বিরক্তি বোধ করবেন। কাজে কাজেই আলো জ্বালানো সমীচীন নয়। ... দুজনে চুপচাপ গিয়ে শুয়ে পড়লে।

এখন আর কেউ আসবে না —শুধু নিদ্রাদেবীর আগমনের অপেক্ষা! বাইরে পাহাড় থেকে বয়ে আসা মৃদু বাতাসে দরজায় খুটখুট করে শব্দ হচ্ছে, যেন কেউ খুব আস্তে আস্তে দরজার কড়া নাড়ছে—সোজাসুজি ভিতরে ঢুকতে ইতস্তত বোধ করছে। ... কায়ার মনে একটি পুরানো স্মৃতির কাঁটা খচখচ করে উঠল। অনেককাল আগে বাবু যখন হুট করে কোন খবর না দিয়েই দিল্লী চলে আসতেন, তখন ঠিক এভাবেই দরজার কড়া নাড়তেন। হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়তে বোধকরি তিনি সঙ্কোচ বোধ করতেন। ঘরে ঢুকে আগে তিনি ঘুমন্ত ছুটুর খাটের কাছে গিয়ে তার মাথায় হাত বুলোতেন। কায়া রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করে থাকত যে কখন তার পালা আসবে।

জোরে নিঃশ্বাস নিতেও তখন তার ভয়—পাছে বাবু জেনে যান যে সে জেগে রয়েছে। আবার এক একসময় মনে হতো যদি বাবু ছুটুকে আদর করে অন্ধকারে তাকে ঠাহর করতে না পেরে চলে যান? উপেক্ষা সে তিলমাত্র সইতে পারবে না। তাইতেই সে হুড়মুড় করে বিছানার উপর উঠে বসে বাবুর মনোযোগ আকর্ষণ করার চেষ্টায় বলে উঠত— "বাবু, এই যে, আমি এখানে!" তিনি মৃদু পদক্ষেপে তার কাছে এসে নরম স্বরে বলতেন—"জানি! তুমি এখনও জেগে রয়েছ?"

—কায়ার কান্না পেয়ে যেত। তার এই জেগে থাকা কি শুধু অন্ধকারেই বাবুর সঙ্গে দেখা হবার জন্য? দেখে দেখেও যেন আশ মিটত না। বলতে ইচ্ছে করত—'তুমি আবার চলে যাবেনা তো? এখানেই আমাদের বিছানার পাশটিতে বসে থাকবে তো? এখন থেকে এই বাড়িতেই থাকবে আমাদের সঙ্গে? আমাদের ছেড়ে আর কক্ষনো যাবে না?' ...

—"ছুটু, মনে পড়ে বাবু ঠিক এইভাবেই দরজার কড়া নাড়তেন?"

ছুটুরও স্মৃতিচারণ কায়ার কথায় রেলগাড়ির মতো হাওয়ায় দৌড়তে শুরু করলে। ... হ্যাঁ, মনে পড়েছে, এই গরমের সময়ই তো বাবু আসতেন। এইগরমে যখন পাইন গাছের ছুঁচলো পাতাগুলি রোদে চকচক করত, তখনই বাবুর আসার সময় হতো। ছুটু মনে করত বাবু বোধহয় পাহাড় ডিঙিয়ে সুদূর দিল্লী থেকে তাদের কাছে আসতেন। পাহাড়ি লোকেরা গরমকালকে চড়াই-এর মরশুম বলত। এই সময়ই দিল্লী, কানপুর, কলকাতা শহর থেকে লোকে এখানে বেড়াতে আসত। সে সব জায়গা সে কোনদিনই দেখেনি। ছুটু মনে মনে গর্ব বোধ করত যে বাবু এতগুলো পাহাড় ডিঙিয়ে তাদের কাছে আসেন। গর্বের সঙ্গে একটু সমবেদনাও—'আহা! এতগুলো পাহাড় ডিঙিয়ে আসতে বাবুর কত কষ্ট হয়েছে! ...এরপর আবার ছুটুর চোখের দৃশ্যগুলি বদলে যায়। গরমের শেষে লোকেরা পাহাড় থেকে নেমে ফিরে যাচ্ছে—দলে দলে। ঠিক যেন কীটপতঙ্গের সারি—সারে সারে সব নেমে যাচ্ছে। দূরে পাইনবনের গাছগুলি উপরে উঠে যাচ্ছে—আরও ... আরও উপরে —পাহাড় দূর থেকে দূরে ক্রমশ সরে যাচ্ছে!

—"হ্যাঁ, আমার মনে আছে কায়া!" মৃদুস্বরে উত্তর দেয় ছুটু—"বাবু এই গরমের সময়ই আসতেন, ঠিক এইভাবেই দরজার কড়া নাড়তেন।"

—"ছুটু, একটা কথা কি তুই জানিস?" —কায়া উত্তেজিত হয়ে বললে। ভাবটা যেন এমন এক রহস্যের কথা সে জানে, যা এখনও পর্যন্ত আর কেউ শোনেনি বা জানেনা। সেটি তার একান্ত আপন, নিজস্ব কথা!

—"কি কথা রে কায়া?"

—"এবার বড়দিনের ছুটিতেও বাবু আসবেন।"

ছুটু অধীর আগ্রহে উঠে বসে বললে—"তুমি কি করে জানলে?"—

উত্তেজনায় তার চোখদুটি চক্‌চক্‌ করে উঠল। এমনটি তো আগে কখনও ঘটেনি? ও তো জানে যে বাবুর গাড়ি শুধু গরমকালেই এখানে এসে পৌছয়। বাকি শীতের দিনগুলি কাটে এক অন্তহীন, অব্যক্ত অপেক্ষায়—যখন চতুর্দিকে শুধু বরফ আর বরফের ধোঁয়াশা, প্রকৃতিও যেন তখন মৃতবৎ হয়ে থাকে। শুকনো গাছের ডালপালা, গাছগুলি যেন প্রাণের অভাবে নুয়ে পড়েছে। সেই একঘেয়ে, নীরস, শীতে ম্রিয়মান হলুদ দিনগুলির মধ্যে বাবুকে তো কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না!

কায়া হঠাৎ চুপ মেরে যায়। এইরে, আর একটু হলেই সব কথা বেরিয়ে যেত! এখন যদি কথা না বলে? খুশীর চোটে ছুটুকে সব বলে ফেলছিল আরকি! ওর অদ্ভুত ধারণা যে কোন কথা বলে ফেললে সেটি কখনই ফলেনা। কাজেই ছুটুর আগ্রহ তাকে সচেতন করে দিল। সে বাকি কথা এমনভাবে গিলে ফেলে যেন খবরটির উপর ধামাচাপা দিয়ে তার উপর সে মাটির প্রলেপ দিয়ে দিলে। সে মাটির কোথাও ঢালু বা খাড়াই নেই—কোনও গরম হাওয়া বা বরফ তার মধ্যে প্রবেশ করতে পায় না—এমন শক্ত ও নিরেট জমির নীচে গেঁথে আছে তার একান্ত গোপন কথাটি—যেদিন বাবু তার কাছে এসেছিলেন।

বাবুর যাবার দিনটির কথা কায়ার মনে পড়ল। নীচে রিক্সার উপর বাবুর বিছানা-বাক্স সব তোলা হয়ে গেছে। মঙ্গতু সেপাই-এর মতো সেলাম ঠোকা কুলিগুলোকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছিল। প্রচণ্ড গরম! চড়চড়ে রোদ মিস্‌ জোসুয়ার বাগানের ফাঁক দিয়ে বারান্দায় এসে পড়েছে। সে মিস্‌ জোসুয়ার সঙ্গে এককোণে দাঁড়িয়ে বাবুর যাওয়া দেখছিল। উনি রিক্সায় উঠতে যাচ্ছিলেন। মাথার পাগড়ি সূর্যের কিরণে ঝকমক করছিল। তখনই ব্যাপারটি ঘটলো—কায়ার কাছে যা অতি আশ্চর্যের! এমনটি সে কখনই আশা করেনি। এক এক সময় এমন ঘটনা ঘটে যায় যে মনে হয় সেটি যেন পাথরে খোদাই হয়ে চিরস্থায়ী হয়ে রইল—তা সে ব্যথা-বেদনাই হোক বা আশা-আনন্দের কোন সংবাদ হোক—ঠিক হিয়েরোগ্লিফদের মতো —যা আর কেউ জানতে পারেনা বা খোদাই করা কথাটি পড়তে পারেনা সেগুলি কেবলমাত্র একটি ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে—যা বারবার ঘটেনা!

রিক্সাওয়ালা রিক্সা চালাতে উদ্যত হলে, বাবু হঠাৎ রিক্সা থেকে নেমে পড়লেন। জোর কদমে তিনি এসে মিস্‌ জোসুয়ার সামনে দাঁড়ালেন। সঙ্কুচিত স্বরে বলে উঠলেন—"মাফ করবেন, আপনাকে না বলে চলে যাচ্ছিলাম। সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, ঠিকমতো শরীরের যত্ন নেবেন।" মিস্‌ জোসুয়া মিটমিট করে তাঁর দিকে তাকালেন। উনি কানে খাটো। ঘটনা ও কথার পারম্পর্য অনুমান করেই কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করতেন—যদিও প্রশ্ন ও উত্তরের মধ্যে কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকত না। এবারও তিনি বাবুর কথায় মনে করলেন যে তিনি কায়ার জন্য চিন্তিত। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে তিনি পিনপিনে

গলায় চেঁচিয়ে জবাব দিলেন— "ডোন্ট ওয়ারী, শী উইল বি অল রাইট। শী উইল বি ফাইন!" ততক্ষণে বাবু কায়ার সামনে দাঁড়িয়ে—"কায়া, বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। এবার আমি বড়দিনের সময় আসব। ..." বাবু আরও অনেক কথা মা ও ছুটু সম্বন্ধে বলেছিলেন। কিন্তু সে দিকে তখন তার মন কই? সে তখন আনন্দে পাখির মতো ... ডানা মেলে উড়ছে। তার মনে হলো যেন বিষাদের মেঘ কেটে গিয়ে আনন্দের একটি বিদ্যুৎলহরী ইন্দ্রধনুর সাতরঙ নিয়ে তার মনের আকাশকে রাঙিয়ে তুললে। বাবুর একটি কথা—'বড়দিনের সময় আসব'—যেন তার মনে স্টীল ছবির মতো দাগ কেটে বসে গেল। সে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে রইলে। যখন হুঁস হলো, ততক্ষণে বাবুর রিক্সা দূর চড়াইয়ের ওপারে নেমে যাচ্ছে। দূর থেকে সেটিকে ঠিক একটি মাছির মতো মনে হলো।

... তার হাতে একটি সিকি—যা বাবু প্রতিবার দিয়ে যান। দু'আনা তার নিজের, দু'আনা ছুটুর। কিন্তু বাবুর ওই একটি কথা—সেটি তার নিজস্ব হয়ে রইল।

—"ভিতরে এসো। তোমার জন্য কেক বানিয়েছি, খাবে এসো।" মিস্ জোসুয়া তার হাত ধরে টানলেন।

মিস্ জোসুয়ার প্যাঁকাটির মতো চেহারা। মাথায় সবসময়ে একটা উলের টুপি। টুপির বাইরে দু-একটি সাদা চুল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকত। নীচের তলাতে তিনি থাকতেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় এখানে স্বামীর সঙ্গে এসেছিলেন—সবাই বলে। কিন্তু যুদ্ধের পরে স্বামীর সঙ্গে দেশে ফিরতে নারাজ মিস্ জোসুয়া এখানেই গেড়ে বসলেন। এই পাহাড়ি এলাকা তাঁকে সম্মোহিত করেছিল। প্রথম প্রথম স্বামী ভদ্রলোক বিলাত থেকে একবছর-দু'বছর অন্তর আসতেন। এরপর তাঁর আসা কমতে কমতে একদিন বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর স্থান নিয়েছে এখন বিলাত থেকে আসা চিঠিপত্র ও নানান্ রকমের ও সাইজের বুলেটিন। ... বৃদ্ধার এখন আর তাতেও বিশেষ আগ্রহ নেই। লোকে বলে হরিয়া মেথর রোজ ভদ্রমহিলার কমোড পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে লেটার বক্সও সাফ করে! সকলে এই নিয়ে হাসাহাসিও করে। কায়ার মোটেই ভালো লাগেনা। এতে এত হাসাহাসির কি আছে বাপু?

মিস্ জোসুয়া নিজেও হাসতেন—ব্যঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গ করতেন তাদের যারা ছ'মাস পাহাড়ে আর বাকি ছ'মাস দিল্লীতে কাটাতো। তাঁর ভাষায় তারা দপ্তরী, দপ্তরের জিপ্সী—যাদের নিজস্ব কোনও ডেরা নেই—না এদিক না ওদিক। যত্তোসব পেটিক্লার্কের দল! শীতেতে নীচে নামার সময় হলে যখন বাড়ির সামনে মুটেদের ভীড় লাগত, তখন বুড়ি নিজের লাঠিটি নিয়ে বারান্দায় গিয়ে মৌরসীপাট্টা করে

বসতেন ও তাদের যাওয়া দেখতেন। শূন্যে লাঠি তুলে তিনি নাচাতেন আর বিড়বিড় করে গালি দিতেন—"বোকার দল, কোথায় যাবে তাই জানেনা। ... যাবি তো যানা, আবারও তো ফিরতে হবে।" মুটে, খচ্চর, ক্লার্ক, রিক্সা—সকলেই তখন একযোগে তাঁর শত্রু হয়ে উঠেছে, কেননা তারা পাহাড় ছেড়ে শীতের ভয়ে পালাচ্ছে। আবার ছ'মাস পরে গরমের শুরুতে যখন তারা সবাই ফিরে আসত, তখনও তিনি বারান্দায় গিয়ে বসতেন—যেন অপেক্ষা করতেন—এই আসে কি সেই আসে। তাঁর মুখে তখন জয়ের হাসি—'কেমন বলেছিলাম না যে ফিরতে হবে?' —"ফুলস, দে আর হিয়র এ্যট লাস্ট! দে আর ব্যাক এগেন!" ... আর যারা ফিরে আসত, তাঁর সঙ্গে চোখাচোখি হবার ভয়ে তারা এমনভাবে মাথা নীচু করে বেরিয়ে যেত যেন তারা কোন হীন, জঘন্য অপরাধ করে ফিরছে।

কিন্তু বাবুর কথা আলাদা—যদিও তিনিও যেতেন। মিস্ জোসুয়া তাঁকে সমীহ করতেন কেননা তাঁর চোখে বাবু ছিলেন অসাধারণ! তিনিই এ তল্লাটের একমাত্র লোক যে নিজের পরিবার-পরিজনদের ফেলে সুদূর দিল্লীতে গিয়ে একা থাকেন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকেও অভিভাবকহীন একা ফেলে যান। কাজেই বাবু চলে গেলেই ওঁর ভাইবোন দুটির উপর স্নেহের মাত্রাটা যেন বেড়ে উঠত। ছেলেমেয়ে দুটোকে উড়নচণ্ডী হয়ে ঘুরতে দেখলেই কাছে ডাকতেন। তাদের ছড়ে যাওয়া হাঁটু, ধুলোবালি ভরা এলোমেলো চুল, হ্যাংলা চোখে ক্ষুধা-তৃষ্ণার কাতরতা দেখে তাঁর মায়া হতো। ঠিক যেন বন্য দুটি পশু—যাদের কেউ নেই। ভদ্রমহিলা প্রথমে মুখচোখ কুঁচকে, বসে বসেই তাঁর ছড়ি দিয়ে তাদের স্পর্শ করে বলতেন—'ইয়োর ফাদার গন্?" —যেন এই দুর্দশা তাদের 'ফাদারের' যাবার জন্যই হয়েছে। তারপর উঠে দাঁড়াতেন ও একটু ইতস্তত করে গম্ভীর গলায় তাদের আমন্ত্রণ করতেন। —"আমি কেক তৈরি করেছি। খাবে? ভিতরে এসো।" অমনি দুই ভাইবোন বাধ্য ছেলেমেয়ের মতো তাঁর পিছন পিছন ঘরে গিয়ে ঢুকত।

—"ঘুমোলে নাকি কায়া?"

—"না, কেন?"

—"শীত করছে!"

—"আমার কাছে আসবি?"

কায়া পাশ ফিরল। বাইরের বাতাস এখন শান্ত। শুকনো কাপড়ের খস্‌খসানিও আর শোনা যাচ্ছে না। এই সময়ে এক-একবার মঙ্গতুর ঘরের চালা সরব হয়ে ওঠে। পাকা খুবানী ফলের গাছ থেকে টপাটপ করে ঝরে পড়ে ঢালু ছাদ দিয়ে নীচে গড়িয়ে যায়। ওরা দুই ভাইবোনে তখন গুনতে শুরু করে—এক...দুই...তিন...চার!

পরদিন সকালে এরা দৌড়ে যায় নালার ধারে, যেখানে খুবানীগুলি পড়ে থাকে। নাঃ, গুনতিতে কোনও ভুল নেই। এরপর গাছ একেবারে ন্যাড়া হয়ে যায়। মঙ্গতুর চালায় পড়ে থাকে শুকনো ঝরেপড়া হলুদ পাতা। এই পাতাও নভেম্বরের দিকে সরব হয়ে ওঠে হাওয়ায়। তারপর তো সবকিছু ঢাকা পড়ে যায় বরফের তলায়।

ছুট্‌টু লাফ দিয়ে কায়ার আমন্ত্রণে তার বিছানায় গিয়েই ধপাস্ করে শুয়ে পড়ে। কায়ার শোয়া বড় খারাপ—তা হোক্, ওর বিছানায় বেশ ওম আছে। কায়া যেই একটু সরে শুলো, ও অমনি কায়ার জায়গায় সরে এসে হাত পা ছড়িয়ে দিল। কায়ার বিছানাটা যেন গরম আফ্রিকা মহাদেশ। ছুট্টু সেই বিছানার ঠাণ্ডা নর্থ পোল থেকে আফ্রিকার উষ্ণ আরামে সরে যেতে চায়, অমনি কায়া ধাক্কা মেরে ভাইকে বিছানার একদিকে সরিয়ে দেয়—

—"এ্যই বারবার সরে আমার ঘাড়ের উপর আসছিস কেন রে? চুপচাপ শুয়ে থাকতে পারিসনা?" —কায়া খেঁকিয়ে ওঠে। অমনি ছুট্টুর অভিমান—দরকার নেই এখানে শুয়ে। ফিরে যাই নিজের খাটে। কিন্তু ততক্ষণে তার নিজের দেহের গরমে বিছানা গরম হয়ে গেছে। বিজয়ী সৈনিক যেমন জায়গা কব্জা করে নেয়, ছুট্টুর পা দুটিও তেমনি বিছানায় নিজের জায়গা করে নিয়ে আরাম করে সেটি উপভোগ করে। এখন তেমন শীত করছে না—নিজের একার বিছানায় একটু আগে যেমন করছিল। এখন ঘরটি ঠিক মিস্ জোসুয়ার ঘরের মতো লাগছে—ভারী পর্দার দরুন তাঁর ঘরে আলো বা ঠাণ্ডা বাতাস আসতে পারে না, কেমন যেন একটা পুরনো বাসি গন্ধে ঘরটা ছেয়ে থাকে।

ছুট্টুর মনে হয় মিস্ জোসুয়ার ঘরটি যেন একটা বাঁধানো স্টেজ! সে বুঝতে পারে না, ওই ঘরটি কেন তাকে এত কাছে টানে। ও যখন কোনও স্বপ্ন দেখে, তখন অবধারিতভাবে তাতে মিস্ জোসুয়ার ঘরটি প্রাধান্য পায়—একের পর এক দৃশ্য সেখানে ফুটে ওঠে। পরদিন সে কৌতূহলবশত আবার সেখানে গিয়ে হাজির হয়, যেন গতরাত্রের স্বপ্নের দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি হবে। ও যেন থিয়েটার দেখার জন্য টিকিট কেটে উৎসুকভাবে তার অপেক্ষা করে থাকে। মিস্ জোসুয়ার ঘরে যেতে তার ভালো লাগে। মিস্ জোসুয়া প্রায়ই তাদের দুজনকে ড্রয়িংরুমে বসিয়ে রেখে ভুলে গিয়ে ভিতরে নিজের বেডরুমে পায়চারী করতে থাকেন। বৃদ্ধার পায়ের চাপে ঘরটি কেঁপে কেঁপে ওঠে। দুই ভাইবোন চুপচাপ বসে যেন বাইরের ক্ষতবিক্ষত দুনিয়ার আড়ালে গৃহের এই শান্ত কোনটিতে তাদের দেহ ও মন জুড়ায়। আরাম লাগে, ঘুম পেয়ে যায় —এত নিরবচ্ছিন্ন শান্তি। ...শীতের ম্লান আলো, নিস্তব্ধ দুপুর—শুধু পাশের ঘর থেকে মিস্ জোসুয়ার পায়চারির শব্দ ভেসে আসে।

হঠাৎ ঘরের পর্দা তুলে মিস্ জোসুয়া অবাক—"য়ু আর স্টীল হিয়ার?"

ছুট্টুর এই দৃশ্যটি অভূতপূর্ব বলে মনে হয়, যেন এক্ষুনি স্বপ্নে দেখা দৃশ্যগুলি

ঘটতে থাকবে একের পর এক। শুধু কায়া মিস্ জোসুয়াকে আরও অবাক করে দিয়ে বলে ওঠে—"মিস্ জোসুয়া, এবার আমরা যাই?"

—"না না, সেকি! আমি তোমাদের জন্য কেক আর বিস্কুট নিয়ে আসছি। আমার একদম মনে ছিল না তোমাদের কথা!" কপাল চাপড়ে বৃদ্ধা দৌড়ে যান তাঁর প্যানট্রিতে। ছুটু শুধু অবাক-বিস্ময়ে তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকে। উনি যেভাবে হাত-পা নেড়ে দৌড়দৌড়ি করেন, তাতে করে ওঁকে একটি শিশু বলে মনে হয়।

—"খাও, কি দেখছ বাবা? সব খেতে হবে।" মিস্ জোসুয়া পেস্ট্রী-বিস্কুটের প্লেটের উপরে নিজের লাঠিটি ঘুরিয়ে নিলেন। ছুটুর মনে হলো, তিনি যেন ম্যাজিসিয়ানের মতন লাঠি ঘোরাচ্ছেন। যতক্ষণ না তারা কেক-বিস্কুটগুলি প্লেট থেকে তুলে নিল, ততক্ষণ তাঁর লাঠিটি সেখানেই টেবিলের উপর ঝুলতে লাগলো। ছুটু ভয়ে ভয়ে প্লেটের দিকে হাত বাড়ায়। মিস্ জোসুয়ার লাঠি ঘোরানোর ফলে তার খাবার ইচ্ছা উবে যায়। একবার মনে হলো, একছুটে ঘরের অন্যদিকে ভদ্রমহিলার দৃষ্টির বাইরে গিয়ে আরামসে কুটকুট করে বিস্কুট খায়। কিন্তু মিস্ জোসুয়ার তার দিকে মোটেই মন নেই। তাঁর সমস্ত মনোযোগ এখন কায়ার উপর। কাজেই ছুটুর এখন কোনওদিকে দেখতে বাধা নেই। পর্দার আড়ালে একদিকে কিচেন, অপরদিকে বাথরুম! ছুটুর এসব দেখতে বড় সাধ যায়। এক এক সময় ভেবে আশ্চর্য লাগে, যে মিস্ জোসুয়ার মতো ধবধবে ফর্সা মেমসাহেবও কি কমোডের উপর বসে প্রাতঃকৃত্য সারেন? না না, ছি ছি! তা কেমন করে হবে? এত নোংরা জিনিস তাঁকে মানায় না। এক একবার ভেবেছে কায়াকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করে। কিন্তু সাহসে কুলোয়নি। ...ছুটুর দৃষ্টি এবার গ্রামোফোনের উপর! এতে নীল রঙের ঢাকনা, তার পাশেই বাঁধানো মোটা কভারের বই-খাতার মতো দেখতে ভিতরে কালো চাটুর মতো অদ্ভুত জিনিস। একবার মিস্ জোসুয়া তাদের বসিয়ে রেখে রান্নাঘরে গেলে ছুটু ওই বই খুলে দেখেছিল, ছোট ছোট কালো চাটু, মধ্যিখানে ফুটো! ঠিক যেন একটা চোখ, তার দিকে ড্যাব ড্যাব করে চেয়েছিল।

—"মিস্ জোসুয়া! এবার আমরা আসি।" কায়া একটু কিন্তু কিন্তু করে বলল। কেক-বিস্কুট উদরস্থ করেই তার উঠে যেতে লজ্জা করছিল। মিস্ জোসুয়া বললেন—"তোমার বেশ দায়িত্ব বোধ আছে দেখছি।" 'দায়িত্ব' কথাটা তিনি দিশী ভাষায় বললেন। যখন কোন কথার উপর তিনি জোর দিয়ে কটাক্ষ বা ব্যঙ্গ করেন, সেটি তিনি দিশী ভাষায় বলেন।

—"তোমার মা কেমন আছেন?"

—"মা ভালো আছেন, মিস্ জোসুয়া!"

—"ভালো!" একটু আনমনা হয়ে তিনি বাইরে 'প্লেন' ও 'সবেদা' গাছের

দিকে চাইলেন। "তোমার মায়ের শরীর দিনকে দিন কেমন বড় হয়ে যাচ্ছে, তুমি কি লক্ষ করেছ?" ছুট্টু মনোযোগ দিয়ে মিস্ জোসুয়ার কথা শুনছিল। ওর খটকা লাগলো—সত্যিই তো! মার শরীর ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে, গতমাসে তারা লক্ষ করেছিল। কিন্তু মিস্ জোসুয়ার মুখে কথাটা শুনে ওদের কেমন লজ্জা লজ্জা করতে লাগলো। বাড়ির কথা বাইরের লোকের মুখে শুনলে ওদের সঙ্কোচ বোধ হয়। মা ঘরের মানুষ—ঘরের চৌহদ্দির মধ্যেই তিনি ভালো। কিন্তু যখন তিনি বাইরে বেরুতেন, সে বাইরের বারান্দাই হোক বা মঙ্গতুর কোয়ার্টারই হোক, মনে হতো লোকে যেন তাঁকে দেখে হাসবে, উপহাস করবে, যা তারা সহ্য করতে পারবে না। বাইরে অনেক নোংরা, অশ্লীল কথা তারা শুনেছে। কিন্তু সে কথা মা'র সম্বন্ধে কেউ বলতে পারে ভাবলেই গা শিউরে ওঠে। কাজেই ঘরের কথা ঘরে থাকলেই যেন সে নিশ্চিন্ত থাকে। এমতাবস্থায়, ছুট্টুর হাবভাব দেখে কায়ার গা রি-রি করে ওঠে। ইচ্ছে করে ছেলেটাকে হিড় হিড় করে টেনে মিস্ জোসুয়ার কাছ থেকে তলাতে নিজেদের রান্নাঘরের একপ্রান্তে নিয়ে যায়। একমাত্র এই একটি জায়গাতেই সে নিরাপত্তা বোধ করে।

মিস্ জোসুয়া ছড়ি দিয়ে টেবিলের উপর খুটখুট শব্দ তুলে অধীরভাবে বললেন —"কি ভাবছ?"

—"কিছুনা, মিস্ জোসুয়া!" —কায়া লজ্জা পেয়ে যায়।

—"তুমি তো আগে এমন আলাভোলা ছিলেনা?" মিস্ জোসুয়া অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে জরিপ করছিলেন। ছোট বয়েস থেকেই তিনি তাকে দেখে আসছেন—কায়া যেন হঠাৎ বড়সড়োটি হয়ে গেছে, যদিও অন্যান্য বড়দের কাছে সে এখনও কচি খুকিটিই রয়ে গেছে। মিস্ জোসুয়া একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"ওই রাক্ষসীটা চলে গিয়ে ভালোই হয়েছে। ওর কথা এখন আর মনে করার দরকার নেই। ওটা একটা ডাইনী ছিল, ডাইনী।"

কায়া ব্যথিত হলো—ডাইনী! ও অলসদৃষ্টিতে বাইরে তাকালো। ওর চোখে যেন ঘোর লেগেছে। মিস্ জোসুয়ার ঘর, জানলার পিছনে জঙ্গলের মর্মরধ্বনি, পাহাড় থেকে নেমে আসা আসন্ন দুপুরের ম্লান আলো—সব যেন একটি কথায় থমকে থেমে যায়—ডাইনী! বিষণ্ণ হেসে মিস্ জোসুয়ার দিকে চেয়ে সে বলে—"ও ডাইনী বা রাক্ষুসী নয়—এ কথাটা আমার চেয়ে ভালো কেউ জানেনা, মিস্ জোসুয়া!" মিস্ জোসুয়া যেন হঠাৎ রেগে গেলেন। তাঁর ফর্সা মুখ আরও ফর্সা হয়ে উঠলো—"তুমি কী জানো আর কী জানোনা—সব কথা আমার জানা আছে। আমি শুধু জানতে চাই, যে ওই চিঠিটা কি ওর নিজের লেখা না আর কেউ ওর হয়ে লিখেছে?"

—"কোন চিঠি মিস্ জোসুয়া?" এবার ছুট্টু বিস্কুট খেতে খেতে বলে ওঠে।

—"তুমি চুপ করো!" মিস্ জোসুয়া ছুট্টুকে এক ধমক দিলেন। ছুট্টু চুপ করে যায়।

—"কি হলো কায়া? কথা বলছ না যে?" —কায়ার মুখে এক নির্লিপ্ত হাসি! মিস্ জোসুয়ার কথা যেন ওর কানেই যায়নি। ও তখন কল্পনায় লামার কাছে পুরানো দিনে ফিরে গিয়েছে, যেখান থেকে কারুর কোনও প্রশ্ন বা কৌতূহলের জবাব দেওয়া যায় না। মিস্ জোসুয়া যেন কায়ার অবস্থা উপলব্ধি করে বললেন—"আচ্ছা থাক, কিছু বলতে হবেনা।" ...কিই বা বলবে বেচারী! মিস্ জোসুয়ার মায়া হলো। এই তো একরত্তি একটা মেয়ে! বাবা চাকরির খাতিরে বেশিরভাগ সময়ই দিল্লীতে থাকেন, মা সর্বদাই বিছানায়, ভাইটি চরকির মতো ঘোরে এবং নিজে একটি উড়নচণ্ডী বিশেষ। এর কিই বা বোধ থাকতে পারে? এবার তাঁর নজর ছুট্টুর দিকে! কেকের শেষ টুকরোটা ওভালটিনে ভিজিয়ে ভিজিয়ে কোনওরকমে গিলছে।

—"এ স্কুলে যেতে শুরু করেছে?"

—"কই আর? আগামী বছর গরমের সময় ভর্তি হবে।" কায়ার উদাসীন হাসিতে করুণা ও অবজ্ঞা। মিস্ জোসুয়া যেন নিরাশ হলেন—"ওঃ, আগামী গরমে! অতদিন আমি থাকবো কি না সন্দেহ।" তাঁর মুখের কোঁচকানো চামড়া ঝুলে পড়লো।

এবার ছুট্টুর পালা। মুখের কেকটা কোঁৎ করে গিলে ফেলে সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে—"আপনি কি আগামী বছর বাইরে কোথাও বেড়াতে যাবেন, মিস্ জোসুয়া?"

মিস্ জোসুয়া মিটি মিটি হাসতে লাগলেন—"তোমরা কখনও সঞ্জৌলীর সিমেট্রী দেখেছ? তোমাদের কাকা তো সাঞ্জৌলীতেই থাকেন? আমি সেখানেই যাব।"

কায়ার আজও মিস্ জোসুয়ার কথাগুলি মনে পড়ে! কি আশ্চর্য! নিজের আসন্ন মৃত্যুর কথা তিনি কি জানতে পেরেছিলেন? মানুষ কি সত্যিই নিজের মৃত্যুর ছায়া দেখতে পায়, যেমনটি তিনি সেই নিস্তব্ধ দুপুরে দেখেছিলেন? তখন অবিশ্যি তাঁর কথায় তিলমাত্রও বিশ্বাস হয়নি। মিস্ জোসুয়া যেন নীচতলায় এই স্যাঁতসেঁতে আধো আলো, আধো আঁধারি ঘরের চির বাসিন্দা। সামনের পাহাড়ের মতো তাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই, তিনি চিরশাশ্বত! পুরাতন হয়েও চিরনবীন! কায়ার জন্মক্ষণ থেকে তো তিনি আছেন। তাঁর এই সাজানো-গোছানো বাড়ির পর্দা, বাগান, গ্রামোফোন এগুলি ছেড়ে কি তিনি অন্যপারে যেতে পারেন?

... ছুট্টু ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার কায়া নিঃশব্দে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এলো। পা টিপে টিপে মায়ের ঘর পেরিয়ে বড় হলঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালো। এখানে রাতের অখণ্ড স্তব্ধতা। ঘরে জমে থাকা ধুলোও যেন চেপে চেপে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। ও দেয়াল ঘেঁসে

ঘেঁসে অন্ধকারে রান্নাঘরে গিয়ে হাজির হলো। রান্না ঘরের দরজায় কুয়াশার হিম লেগে রয়েছে। আঙুলে সেটুকু মুছে নিয়ে ভিতরে উঁকি দিয়ে মঙ্গতুকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললে। মঙ্গতুকে এখন ঠিক একটা ফ্রেমে আঁটা ছবি বলে মনে হচ্ছে। একমনে সে উনুনের মধ্যে থেকে মাথা নীচু করে খুঁচিয়ে ছাই বের করে চলেছে। জটে ভরা অগোছালো লম্বা চুল ঝুলে পড়েছে মাটিতে। তার মাথা নাড়ার সঙ্গে সঙ্গে চুলও এদিক ওদিক হচ্ছে। ও বেশ পরিপাটি করে ট্যাসেল দিয়ে চুল বাঁধে।

কায়া ধীরে ধীরে শার্সিতে খুটখুট করে শব্দ করলো—একবার, দু'বার। মঙ্গতুর ওঠার নাম নেই। উঠবো কি উঠবো না এইভাব তার। এর আগেও এমন হয়েছে। কায়ার কয়েকবার খুটখুট করার পরেও মঙ্গতু না ওঠাতে ঘরে ফিরে গিয়েছে। কিন্তু এবার দ্বিতীয়বার ধাক্কা দেওয়াতে কাজ হলো। কয়লা ও চিমটির জগৎ থেকে বেরিয়ে মঙ্গতু রান্নাঘরের দরজার শিকল খুলে দিল। কায়া তাড়াতাড়ি ক্ষিপ্র গতিতে বিড়ালের মতো বাসন রাখার আলনার নীচে চটের ছালার উপর গিয়ে বসে পড়লে। ওর ভয়, পাছে মঙ্গতু ওকে ঢুকতে না দিয়েই আবার দরজা বন্ধ করে দেয়।

মঙ্গতু কোনও কথা না বলে চুপচাপ রান্নাঘরের পিছন দিকের আলমারি থেকে একটা ভেড়ার চামড়ার সাদা কোট নিয়ে এসে বেশ করে কায়ার গায়ে জড়িয়ে দিল। এই কোটটা বরফ পড়ার সময় মঙ্গতু গায়ে দেয়। পুরানো কোটটার গন্ধ কায়ার ভালো লাগে। রান্নাঘরের অন্যান্য তৈজসপত্রের সাথে সাথে জিরে হলুদ এলাচের গন্ধের সঙ্গে ও' ভেড়ার চামড়ার একাত্মতা বোধ করে।

মঙ্গতু আবার স্বস্থানে ফিরে গিয়ে জ্বলন্ত কয়লা উনুনের ছাইয়ের গাদা থেকে খুঁচিয়ে বের করতে শুরু করে। মঙ্গতুর একটা বিদঘুটে অভ্যেস আছে। সে জ্বলন্ত কয়লা একের পর এক বের করে নিজের হাতের তেলোয় কিছুক্ষণ উল্টেপাল্টে একটু ঠাণ্ডা করেই টপ করে সেটি মুখে পুরে ছাইলাগা কয়লা জিভ দিয়ে আস্তে আস্তে চেটে চেটে পরিষ্কার করে ফেলে। উনুনের নিভন্ত আগুনে ছাইয়ের সোঁদা সোঁদা গন্ধ কায়ার ভালো লাগে। ভালো লাগে মঙ্গতুর জিভ দিয়ে কয়লা চেটে খাওয়া দেখতে। এক একসময় তারও মঙ্গতুর মতো কয়লা চেটে খেতে অদম্য ইচ্ছে করে, কিন্তু অতিকষ্টে সে সেই ইচ্ছা দমন করে। কিন্তু লুব্ধ চোখে সে মঙ্গতুর কয়লা লেহন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করে।

রান্নাঘরে এখন উষ্ণ পরিবেশ! চিমটি, কয়লা ও মঙ্গতুর দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া আর সব নিস্তব্ধ।

—"ছুটু ঘুমিয়ে পড়েছে?" মঙ্গতু জিজ্ঞেস করলো।

—"হ্যাঁ..অ্যাঁ, ক..খ..ন্..ন্!" কায়া উত্তর দিল।

—"আর তুমি? তোমার ঘুম পায়নি?" মঙ্গতু কয়লা খোঁচাতে খোঁচাতে কথা

চালাতে থাকলো। কায়ার মুখে কথা নেই। এখন ও পরম নিশ্চিন্তে ভেড়ার ছালের কোট জড়িয়ে রান্নাঘরে মঙ্গতুর সান্নিধ্যে উনুনের গরমের আরামে সারাদিনের একাকীত্বের খেয়ালী-দুনিয়া থেকে মুক্তি পেয়ে শীত ও ঘুমকে কাঁচকলা দেখাতে পেরেছে।

—"মেমসাহেব কি জিজ্ঞেস করছিলেন?" মঙ্গতু মাথা তুলল।

—"উনি বলছিলেন ...", কায়া হঠাৎ চুপ করে যায়। শুধু গভীর মনোযোগ সহকারে নিভন্ত কয়লার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—"কি বলছিলেন?" মঙ্গতু এবার সোজাসুজি কায়ার দিকে তাকাল।

—"মায়ের কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।" মঙ্গতুর হাত থেমে গেল। ভুরু কুঁচকে বললেন—"মা ঠাকরুণ সম্পর্কে কি কথা বলছিলেন?"

—"মার শরীর বেড়ে যাওয়ার কথা, আরকি!" কায়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মঙ্গতুর দিকে তাকায়।

হঠাৎ মঙ্গতু যন্ত্রণায় কাতরে উঠলো। ঠাণ্ডার সময়ে হঠাৎ করে মঙ্গতুর শরীরে ব্যথা ওঠে। ব্যথার চোটে মঙ্গতু এপাশ ওপাশ করে। মঙ্গতুর হাঁটু থেকে পায়ের পাতা অব্দি ময়লা ছেঁড়া ন্যাতার ব্যান্ডেজ বাঁধা। এই ব্যান্ডেজ ব্যথা না শীতের উপশমের জন্য, কায়া তা বুঝে উঠতে পারেনা।

—"মঙ্গতু"

—"কিরে?"

—"মা'র শরীর আর কত বড় হবে?"

মঙ্গতু উনুন থেকে আর একটা কয়লা বের করে হাতে ধরে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করতে লাগলো, যেন এর মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত! তারপর আস্তে আস্তে উত্তর দিলে—"কি জানি, এ তো ঈশ্বরের অবদান।"

—"কোনটা ঈশ্বরের অবদান?"

—"কি, তুমি জানো না?" এবারও ও একটি বিরাট হাই তোলে। হাইয়ের ফুৎকারে কয়লার উপরে জমে থাকা ছাই বাতাসে ওড়ে। এই কয়লা চেটে কিছু পাওয়া যাবে না। কাজেই সেটিকে সে উনুনে ফেরত পাঠায়। কায়া হঠাৎ মুরুব্বির মতো হেসে ওঠে—"আমি একবার দেখেছিলাম ....!" মঙ্গতু কায়ার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে!

—"কি দেখেছিলি?"

—"মিস্ জোসুয়ার লেটার বক্স। তুমি কখনো দেখেছ?" মঙ্গতু মাথা নাড়ল।

—"তুমি জানো ওটা সব সময়ই খোলা থাকে?"

—"সে তো জানি। কিন্তু তুমি কি বলতে চাও?"

—"আমি না একদিন ফোকরটার মধ্যে উঁকি মেরে দেখেছিলাম। প্রথমে ছুটু,

তারপরে আমি।"

—"এটা মোটেই উচিত হয়নি ..." মঙ্গতু একটা নিঃশ্বাস ফেললে। ওর নিঃশ্বাসে সিটি বেজে উঠলো।

—"শোনই না, ভিতরে তো ভোঁ ভাঁ—কোনও চিঠিই নেই।"

—"বেচারী মিস্! সাহেব এখন আর ওঁকে কেনই বা চিঠি লিখবে? মঙ্গতু ব্যথিত স্বরে বলে। যেন চিঠি পাওয়া মস্ত বড় এক সৌভাগ্যের কথা, আর সে সৌভাগ্য থেকে মিস্ জোসুয়া এখন বঞ্চিত। কিন্তু কায়ার মুখের দিকে চেয়ে তার মনে হলো যে চিঠি আসার চেয়েও পিছনে আরও কোনও রহস্য রয়েছে, কেননা কায়ার ছোট্ট রোগা মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে আছে। ...

—"কি হয়েছে কায়া?" মঙ্গতু একটু ভয় পেয়ে যায়। কায়া যেন দূর থেকে স্বপ্ন দেখার মতো কথাগুলি ছুঁড়ে দেয়।

—"তারপরে ... তারপরে, আমি পাঁচিলের উপর চড়লাম, ছুট্টু নীচে দাঁড়িয়েছিল। আমি লেটার বক্সের পাল্লা দুটো খুলে দিলাম। ভিতরে দেখলাম—ওমা, সব ফোক্কা! কিস্যু নেই। শুধু কিছু খড়কুটো, পাখির শুকনো গুয়ের সাদামার্কা দাগ আর একগাদা ধুলো। ভাবলাম, দূর ছাই, আবার বন্ধ করে দিই। ওমা, যেই বন্ধ করতে গেলাম, জানো, মনে হলো ... মনে হলো, যেন কেউ আমায় লেটার বক্সের পিছন থেকে গভীরভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে।"

মঙ্গতু অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে চেয়ে কায়াকে দেখল। তারপর যন্ত্রণায় আবার কোঁকাতে কোঁকাতে পিঁড়ি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। বাসনের দেরাজ থেকে একটা কেটলি বের করে তাতে জল ভরে উনুনের নিভন্ত আঁচে চাপিয়ে দিল। কায়ার কথার খেই ধরে সে পিছন ফিরে বলল—"তুমি কি ঠিক করে দেখেছিলে যে কেউ তোমাকে লেটার বক্সের পিছন থেকে দেখছে কিনা?" ... মঙ্গতু ভালো করে কায়ার দিকে চাইল। শীতে ও দেয়ালের সঙ্গে কোট জড়িয়ে সিঁটিয়ে বসে আছে। ... মঙ্গতু পাহাড়ী দেশের বাসিন্দা। কোন কিছুতেই তার অবিশ্বাস নেই। যা হচ্ছে বা হতে পারে, তা সে বাস্তবেই হোক বা কল্পনায়ই হোক, তাকে সহজে বিশ্বাস করাই তার স্বভাব। কাজেই ও যেমন নিজের সন্দেহকে কখনও কখনও অবিশ্বাস করেছে, তেমনি অন্যের বিশ্বাসকেও কখনও সন্দেহ করেনি। ওর মতো লোকের বিশ্বাসের জগৎটাই এমন, যেখানে কিছু ঘটেনা; সবকিছুই বর্তমান, সৃষ্টির আদি কাল থেকে, একেবারে প্রথম থেকে। অতএব কায়ার কথাও কোন সন্দেহ না করে সে বিশ্বাস করে নিলে।

—"কায়া, সত্যিই কি তোমাকে কেউ দেখছিল?" মঙ্গতুর কৌতূহলপূর্ণ জিজ্ঞাসা।

—"হ্যাঁ মঙ্গতু, সত্যি!" কায়া চোখ বড় বড় করে বলল—"আমি দেখলাম, শুধু একটা চোখ আমাকে খুব কাছে থেকে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। আমি ভয় পেয়ে

খটাস করে পাল্লা দুটো টেনে বন্ধ করে দিলাম। ওমা, বন্ধ করার পরেও দেখি চোখটা আমায় সমানে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে যাচ্ছে।" ... কায়া শিউরে উঠে চোখ বন্ধ করে ফেলে, যেন দৃশ্যটা সে এখনও দেখতে পাচ্ছে। ওর যেন ঘোর লেগে গেছে। ঘুমুতে ঘুমুতে যার হাঁটা অভ্যাস, সে যেমন আধো ঘুম, আধো জাগরণের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকে কায়ারও যেন সেই স্বপ্নাতুর অবস্থা। ... তার চারপাশে কেবল অন্ধকার ও বাতাস, আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই। কায়ার স্বর যেন স্বপ্নের মধ্যে ভেসে আসে—"উঃ, কী হাওয়া আর কী বিশ্রী অন্ধকার সেই দিনগুলি। ঠিক ওই সময়ই বাবু দিল্লী চলে যেতেন ... মার বড় হয়ে যাওয়া শরীর আরও বেঢপ হয়ে উঠতো। বাপ্‌রে! আমি বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মিস্ জোসুয়ার লেটার বক্স খুললাম ... ছুটু নীচে দাঁড়িয়ে। সে বলল 'কায়া, কিছু পেলে কি লেটারবক্সে?' ... হ্যাঁ, হ্যাঁ অনেক কিছুই আছে। পাখির শুকনো গু, খড়কুটো, ... আর, আর সেই ভীষণ একটা চোখ। ... তোমার বোধহয় বিশ্বাস হচ্ছেনা মঙ্গতু! বোধহয় ভাবছ আমি আবোল-তাবোল বকছি! কিন্তু আমি এই তিনসত্যি করে বলছি, যে একটাও বাজে কথা নয়। বিশ্বাস না হয়, এক্ষুনি নীচে দরজা খুলে দেখো, লেটার বক্সে তো তালা নেই, স্বচক্ষে গিয়েই দেখোনা—ওই খড়কুটো-ধুলোর মধ্যে সেই চোখটা জ্বলজ্বল করে তাকিয়ে আছে কি না। উঃ বাপরে।"

—"সে কে কায়া? কার চোখ সেটা?" দূর থেকে মঙ্গুতুর উদ্‌গ্রীব স্বর শুনতে পায় কায়া।

... সে যেন হঠাৎ বাস্তব জগতে ফিরে আসে। এতক্ষণ তার মনে পড়ে, যে সে তার নিজের ঘর পেরিয়ে এতবড় বাড়ির এককোণে রান্নাঘরে বসে আছে। ...ডেকচিতে জল ফুটছে ... তার উষ্ণ ভাপ পুরো রান্নাঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। মঙ্গতু রান্নাঘরের জানলা খুলে দিয়েছে। ... অদূরেই জাখু পাহাড় দেখা যায় ... পাহাড়ের মাথায় তারা ঝিকমিক করছে। অক্টোবরের নীলচে আঁধার ... মৃদু ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে ... হাওয়ায় খুবানী গাছের পাতাগুলি শিরশিরিয়ে শীৎকার তুলেছে। মঙ্গতু ডেকচি উনুন থেকে নামিয়ে হটওয়াটার ব্যাগে গরম জল ঢালতে লাগল। জল পুরো ভরা হয়ে গেলে ব্যাগে ছিপি এঁটে, তোয়ালে জড়িয়ে দিল। যেন ছোট একটা বাচ্চাকে আপাদমস্তক জড়িয়ে রেখেছে, কায়ার মনে হলো।

—"তুমি একা ঘরে যেতে পারবে, না আমি সঙ্গে আসব?"

কায়া কিছু বলার আগেই তার হাতে হটওয়াটার ব্যাগটা ধরিয়ে দিয়ে মঙ্গতু রান্নাঘরের দরজা খুলে দিল। কায়া ঘরের দিকে পা বাড়াল—একা একাই।

রান্নাঘরের পরেই বিরাট হল ঘরটা বাড়ির এক কোণে পরম অবহেলায় পড়ে

রয়েছে। বাবু চলে গেলে এটি একেবারেই ব্যবহার হয়না। তখন সোফার উপর পুরানো কাপড় ঢাকা পড়ে। ঘরে আগুন জ্বালানো হয় না, কার্পেটটা গুটিয়ে এক কোণে রেখে দেওয়া হয়। বাবু বিহনে কায়া-ছুটুর মতো ঘরটাও যেন এক উড়নচণ্ডীর রূপ-ধারণ করে। একটা পুরানো নীল শতরঞ্চি পাতা হয় ঘরে। প্রবল বাতাসে সেটি ফুলে-ফেঁপে ওঠে, যেন ছোট্ট একটি নীল নদী। ছুটু মহানন্দে এই শতরঞ্চির নীল নদীতে সাঁতার দেয়। সে সাঁতারের চোটে দোতলার ঘর তো বটেই, নীচতলায় মিস্ জোসুয়ার ঘর পর্যন্ত দুলে ওঠে। বৃদ্ধা তাঁর ছড়ি নিয়ে তেড়ে আসেন। নীচ থেকে তাঁর চিৎকার শোনা যায়—"ঈশ্বরের দোহাই এই হুটোপাটি বন্ধ করো। কি হচ্ছে এসব, অ্যাঁ? কি হচ্ছে?" উত্তেজনায় বুড়ি হাঁপাতে থাকে। তাঁর সাদা চুল হ্যাটের আওতা থেকে বেরিয়ে পড়ে। ভদ্রমহিলাকে তখন ঠিক একজন ধর্মপ্রচারিকা বলে কায়ার মনে হয়। যেন শূন্য মরুভূমির বুকে হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিয়ে ধর্মপ্রচার করছেন। —"উপরে তোমরা কি করছ বল তো?" মিস্ জোসুয়ার চেঁচামেচিতে ছুটু আমোদ পায়। চেঁচিয়ে উত্তর দেয়—"আমরা শতরঞ্চির উপর সাঁতার সাঁতার খেলছি মিস্ জোসুয়া!" মিস্ জোসুয়া চোখ বড় বড় করে ছুটুর দিকে তাকান—অ্যাঁ! সাঁতার কাটছ? তোমরা কি বাড়িতে 'সুইমিংপুল' খুলে বসলে নাকি বাছা?" —"না, না, সুইমিংপুল কোথায় পাবো? হাওয়ায় শতরঞ্চি দুলে ফেঁপে ওঠে বলেই তো তাতে সাঁতার কাটতে মজা!" ছুটুর পরম সত্যভাষণে মিস্ জোসুয়া মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন,—"ওঃ গড!" তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ছুটু ঘাবড়ে গিয়ে বড় বড় চোখে তাকায়, শতরঞ্চির নদীতে সাঁতার ও মিস্ জোসুয়ার হা-হুতাশের মধ্যে পারম্পর্য খোঁজার বৃথা চেষ্টা করে ছেলেটা।

মঙ্গতু রান্নাঘরের কাজ সেরে দরজা বন্ধ করে বাইরে বেরিয়ে দেখে কায়া বুকের কাছটিতে গরম জলের ব্যাগটা চেপে ধরে হলের মধ্যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

—"আরে কায়া, তুমি এখনও এখানে দাঁড়িয়ে? এদিকে মা গরম জলের অপেক্ষায় শুয়ে শুয়ে পথ চেয়ে আছেন।"

মঙ্গতুর ডাকে কায়া আবার ইহজগতে ফিরে এলো। এ তার এক নিত্য অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। প্রত্যেকদিন হলঘরের সামনে দিয়ে যেতে হলেই ও স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে যায়। যেন কোন রহস্যময়ী ছলনা তার পথ অবরুদ্ধ করে কানে কানে নানা কথা বলে যায়, যে কথা সে আগেও অনেকবার শুনেছে। এবার ও সজাগ ও সচেতন হয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে ডাইনে বেঁকে যায়। মায়ের বন্ধ দরজার ভিতর দিয়ে ছোট্ট একটা আলোর রেখা বেরিয়ে আসছে। দরজায় নক্ করে (যা এ বাড়ির প্রথাগত অভ্যাস) কায়া দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে পড়ে।

মায়ের ঘরের চেহারা কায়ার মুখস্থ। সেই একভাবেই টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে, তার আলোয় নজরে পড়ে মা'র বালিশ, বালিশের উপর তাঁর অলস মাথাটি

এলিয়ে আছে, আর ল্যাম্পের আলোয় দেওয়ালে নিজের ভুতুড়ে ছায়া।

—"এসেছিস?" মা বালিশ থেকে ঘাড় তুলে কায়ার দিকে তাকান। —"আজ বড্ড দেরি হলো যে!" —গলার স্বরে রাগ, দ্বেষ বা অভিমান কিছুই নেই। তাঁর অনুযোগও যেন তাঁরই মতো সীমাহীন ক্লান্তিরই এক বহিঃপ্রকাশ মাত্র! সেই ক্লান্তিকর অনুযোগও বোধকরি তাঁর রোগশয্যায় তাঁর সঙ্গে শুয়ে শুয়ে ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয়ে গেছে। এতই অকিঞ্চিৎকর তাঁর সেই অনুযোগ! কায়া নীচু হয়ে মায়ের হাতে জলের ব্যাগ ধরিয়ে দেয়। মা ঘাড় উঁচু করে দুহাত দিয়ে সেই ব্যাগটি ধরে আবার বালিশে মাথা এলিয়ে দিয়ে বলেন—"ওটা পায়ের কাছে রাখ, ওখানে ঠাণ্ডাটা বেশি লাগে।" মায়ের পায়ের ধারে সে ব্যাগটি রাখে। হঠাৎ সে লক্ষ করে মায়ের পা দুটি কি ছোট্ট, বোধকরি মাপে তার চেয়েও ছোট। ছোট্ট পা দুটি এক জায়গায় জড়ো হয়ে আছে, ঠক্‌ঠক্ করে শীতে কাঁপছে। ব্যাগের উষ্ণতায় যেন পা দুটি প্রাণ পেয়ে সজীব হয়ে উঠল। হঠাৎ তার মনে হলো নিজের ঘরে না ফিরে যদি এখানেই মায়ের পায়ের কাছে লেপের ও ব্যাগের গরমের ওমে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে, তাহলে কেমন হয়? কিন্তু সেই অদম্য ইচ্ছাকে সংযত করে সে আবার কাঁপতে কাঁপতে বড় বারান্দা পেরিয়ে নিজের শীতের দুনিয়ায় ফেরত চলে যায়। মনে হয়, সে যেন শীতের দেশের বাসিন্দা, বাড়ির একপ্রান্তে তার বাস, অন্য প্রান্তে গরমের দেশে মা বাস করছেন, যেখান থেকে তাঁর গলার স্বরও ভালো করে শোনা যায় না।

—"ছুটু ঘুমিয়ে পড়েছে?" মা জানতে চান। কায়ার ধ্যানভঙ্গ হয়।

—"অনেকক্ষণ! আমি রান্নাঘরে ছিলাম।"

—"ও একা একা ভয় পায়না তো?" বলেই বোধকরি লজ্জা পেয়ে যান। তিনি নিজের দুর্বলতা জানেন। ছোটখাটো, তুচ্ছ জিনিসেও তাঁর ভয়। পথের কুকুর, যাযাবর লামা, চিনি-কাপড়ের ফেরিওয়ালা, সবকিছুতেই তাঁর ভয়। দরজায় কেউ হঠাৎ নক্ করলে তিনি চমকে ওঠেন।

—"না, এখন আর ছুটু উঠবে না," বলেই কায়া মনে মনে জিভ কাটে। ও জানে যে ওর ছোটখাটো মিথ্যা কথাও মা ধরতে পারেন না। যা বোঝানো যায়, তাই বোঝেন। মা'র কাছে মিথ্যা বলে পার পেয়ে গেলেও নিজের কাছে সে অপরাধী হয়ে থাকে। মনে হয় অনৃত ভাষণে তার জিভ যেন কষায় হয়ে গেছে।

—"কোন চিঠি এসেছে নাকি রে?"

—"কার চিঠি মা?"

—"না এমনিই!" মা থমকে যান। "মানে ... তোর পিসির বহুদিন কোনও চিঠিপত্তর আসেনা কিনা, তাই বলছিলাম।"

—"পিসি কি এখানে আসবেন?" কায়ার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল।

—"এখানে ... কই না!" মা আগ্রহ সহকারে তার দিকে তাকালেন। "কেন, তুই কি এ সম্বন্ধে কিছু শুনেছিস নাকি?" যেন কায়ার খবরটাই খবর। কায়া মাথা নাড়ল। দেওয়ালে তার ভুতুড়ে ছায়াও নড়ে উঠলো। মা যেন মিইয়ে গেলেন।

—"শোনো ..."

—"কিরে কায়া ...?" মা চোখ তুলে তাকালেন।

—"না, মানে পিসি এলে তো লামাও এখানে আসবে, তাই না?" মা মাথা নেড়ে লেপ থেকে হাত বাইরে বের করে কায়ার হাত ধরলেন। উঃ কি ঠাণ্ডা হাত! তাঁর গরম হাত কায়ার ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে কেঁপে উঠল। তিনি হাত আবার লেপের মধ্যে ঢুকিয়ে নিলেন। —"কায়া, তোর গা যে ঠাণ্ডা বরফ!"

কায়ার কানে মার কথা গেল না। ও তখন মনে মনে মীরাটে চলে গিয়েছে, সেখানে লামা থাকে। মীরাট কতদূর? কালকারও নীচে—এনানডেলের মতো বিস্তৃত সমতল জায়গা। একের পর এক শহর সাজানো, যেগুলি গিয়ে শেষ হয়েছে সমুদ্রের তটে। সে কেমন শহর? বড় দেখতে ইচ্ছে করে। এর আগে যখন আরও ছোট ছিল, তখন তার একটিই আকাঙ্ক্ষা ছিল, জাখু পাহাড়ের চুড়োর উপর উঠে হনুমান মন্দির থেকে সমস্ত শহরটা দেখবে। তার মনে হয় বুঝিবা জাখু পাহাড়ের মতো উঁচু পাহাড়ে চেপে, আবহাওয়া ভালো থাকলে, এই শহরটার সঙ্গে সঙ্গে মীরাট শহরটা দেখতে পাবে। মীরাটে যে লীমা থাকে! ও পাহাড়ের উপর থেকে তাকে ডাকবে। সে নিশ্চয়ই তার ডাক শুনতে পাবে। মঙ্গতু তো বলে পাহাড়ি এলাকার এক প্রান্ত থেকে ডাকলে অন্য প্রান্তে, দূর দূর পর্যন্ত, সে ডাক পৌছয়। ওদের গ্রামের লোকেরাও এইভাবে সকলকে ডাকে। আর এই সব অঞ্চল এত নির্জন যে কথা বা ডাকের জনারণ্যের কোলাহলে হারিয়ে যাবার ভয় নেই। কাজেই লামা কি তার ডাক শুনতে পাবেনা?

এই নির্জনতা মা'র ঘরেও আছে। তফাৎ এই যে মা কাউকে কখনও ডাকেন না। অথবা আমরা তাঁর ডাক শুনতে পাই না বা চাই না। ভাবি যে চিররুগ্না মা কাকে, আর কেনই বা, ডাকবেন?

—"কায়া, কটা বাজে সে হুঁস আছে? এবার নিজের ঘরে যাও।"

কায়া কিন্তু জানে যে মা যেতে বললেও মন থেকে তা চাননা। মায়ের মনের কথা প্রকাশ পাচ্ছে তাঁর বারে বারে চোখ খুলে তাকানোতে। শীতের রাতের এই দীর্ঘ মুহূর্তে, কায়াকে বার বার যেতে বললেও যখন সে ওঠে না, তখন মনে হয় তিনি যেন স্বস্তি পান। ... টেবিল ল্যাম্পের আলো মার নিস্তেজ মুখের উপর সরাসরি পড়ছে, তাতে করে তাঁকে আরও ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে। কয়েকগাছি চুল বালিশের নীচে আটকে আছে। মা চোখ মুদেও বারবার চোখ খুলে দেখছেন। কায়া আছে কিনা। কায়া যেন তাঁর নীরব আর্তি শুনতে পায়—'এখন নয়—না, এখনই যেওনা।'

হঠাৎ যেন মা সম্বিত ফিরে পান। তাঁর মনে হয় বোধহয় একভাবে বসে থেকে থেকে কায়া ক্লান্তি বোধ করছে। তাই একঘেয়েমি কাটাতে ঠোঁটের কোণে এক চিলতে হাসি এনে মা কথার জের টানেন—"কায়া জানিস, লামার না বিয়ে হয়ে গেছে। নিজের ঘর-সংসার সাজানোতেই সে এখন ব্যস্ত। বিয়ে করে ও খুব সুখী হয়েছে।" মা এমন জোর দিয়ে 'সুখী' কথাটা উচ্চারণ করলেন, তাতে মনে হলো যেন মা জোর দিয়ে 'অ-সুখ'কে সুখ করতে চাইছেন। তবে সুখের পরিভাষা মা'র কাছে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র! ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ মায়ের কাছে বহির্জগতে শুধু একটা পাষাণ-কঠিন, মারাত্মক রকমের নিরেট স্বার্থপর জায়গা। কাজে কাজেই বিয়ে করে ছোট্ট গৃহকোণে নির্বিঘ্নে ঘরকন্না করা মার মতে সুখ ছাড়া আর কিই বা হতে পারে? অতএব তাঁর বিশ্বাস লামা সুখী, খুবই সুখী একটি গৃহবধূ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাড়িতে লামার থাকাকালীন মা সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকতেন। তাঁর বিশ্বাস লামার মতো ডানপিটে মেয়ে লাফ দিয়ে আকাশ ছুঁতে পারে, ঘন মেঘের বর্ষণকেও সে জোড়া কাপড়ের তালি মেরে রোধ করতে পারে। পিসিকেও তাঁর সনির্বন্ধ অনুরোধ ও উপদেশ দিতেন—"আর কিসের দেরি ভাই! যেমন তেমন একটা ছেলে ধরে গলায় ঝুলিয়ে দাও, নইলে এ মেয়ে নিয়ে পরে কপালে দুঃখ আছে বলে দিলুম।" পিসিও পালটা জবাব দিতেন—"ছেলে কোথায়? ছেলে কি আর গাছে ফলে?" এদের কথোপকথন শুনে কায়া ভাবত—"বাপরে, কত্তো ছেলে! বাজারে খেলছে, স্কুলে যাচ্ছে, আর পিসির চোখে একটাও পড়েনা? কেবল বলেন—"ছেলে কই, ছেলে নেই!"

মায়ের মুখের উপর একটা রাগত দৃষ্টি বুলিয়েই কায়া মা'র হাত থেকে নিজের হাত টেনে নেয়। ভিতরে ভিতরে ও রাগে গরগর করছিল। আজ লামা এখানে থাকলে কি ক্ষতি হতো? কিন্তু মা থাকতে দিলে তো? সেই জন্যই তো তাকে চলে যেতে হলো। এখন শুধু তার খালি ঘরটা খাঁ খাঁ করে। ... শূন্য ঘরে লামা নেই, কিন্তু রেললাইনের ধারে তো আছে! ও যেন এখনও এখান থেকে লামাকে দেখতে পায়—ম্লান দুপুরের আলোয়, বিছুটির জঙ্গলের ধারে, যেখানে মনে হয় পাহাড়ও যেন নুয়ে পড়েছে। একটু এগিয়ে লামা লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে ও আমি তার পিছন পিছন চলেছি। এক একসময় লামা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে, থেকে থেকে শুধু একটা খস্ খস্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। কোন কোন সময় ওর পা দুটি দেখা যাচ্ছে। সালোয়ারটা ও সব সময়ই পায়ের পাতার উপর গুটিয়ে রাখে। উড়নিটাকে বুকের উপর না দুলিয়ে দেহের যত্রতত্র পেঁচিয়ে-পুঁচিয়ে একটা বিতিকিচ্ছিরিভাবে জড়িয়ে রাখে। খোলা চুলগুলিকে ঠিক শণের নুড়ি বলে মনে হয়, কাঁধ বেয়ে বটের ঝুরির মতো সেগুলি নেমে এসেছে। ... আবার ওকে ঝোপের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে রেললাইনের ধার দিয়ে হাঁটতে দেখা গেল। দু-সারির লোহার

লাইন রোদে ঝকঝক করছে। ওর পিছন পিছন কায়া ছায়ার মতো অনুসরণ করছে। লাইন শেষ হবার মুখে যেই সুড়ঙ্গ আসে, অমনি ওরা দুজনে সুড়ঙ্গের উপরে, কচ্ছপের পিঠের মতো কুঁজো হওয়া পাহাড়িপথে উঠে আসে। লম্বা লম্বা হলুদ হয়ে যাওয়া ঘাস যেন হাতের মতো পথ আটকে থাকে। উপরে কচ্ছপের পিঠের মতো পথে রোদের ঝকঝকে আলো—নীচে সুড়ঙ্গের স্যাঁতসেঁতে অন্ধকার।

"ওই পাহাড়ি কুঁজের উপর চড়া এক দুঃসাধ্য ব্যাপার ছিল আমার পক্ষে। প্রথমে লামা তার উপর চড়ে আমার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে এক ঝটকায় আমায় উপরে তুলে নিল। উৎরাইয়ের সময় মনে হলো, যেন দুদিকের বড় বড় ঘাসের মধ্যে থেকেও ওর চোখদুটি দেখা যাচ্ছে। মনে হলো যেন উপর থেকে ও আমায় দেখছে। কিন্তু উপরে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়, আর নীচে রেললাইন! আমরা কান পেতে ঘাসের উপর শুয়ে রইলাম .... একটু পরেই গাড়ি যাবে, তার শব্দ শুনবো। এখন শুধু হাওয়ায় সোঁ সোঁ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এমনই একদিনে, যখন আমরা অধীর হয়ে কান পেতে রেলের শব্দ শুনবো বলে অপেক্ষা করছি, তখন লামা আমার হাত ধরে চেঁচিয়ে কিছু একটা বলল। ঠিক সেই মুহূর্তে একটা ট্রেন সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে যাওয়াতে তার ঘড়ঘড়ানির শব্দে লামার কথার একটি বর্ণও আমি শুনতে পেলুম না। আমার খুব আপশোস হলো যে কথাগুলি শোনা গেল না। নিশ্চয়ই কোন জরুরী ও গোপনীয় কথা, যা এতদিন ও আমায় বলেনি বা বলতে পারেনি। কু-ঝিক্-ঝিক্ শব্দ সুড়ঙ্গের ওপিঠে মিলিয়ে গেলে আমি ওকে জিজ্ঞাসা করলাম—লামা তুমি কি বলছিলে, শুনতে পাইনি।" কিচ্ছু বলিনি তো! তুমি কি আমায় কিছু বলতে শুনেছ নাকি? আমি কিচ্ছু বলিনি ...।" লামা রহস্যময় হাসি হাসতে লাগল।

কায়ার হুঁস ফিরে আসে নীচের থেকে মঙ্গতুর ডাকে। এতক্ষণ ও লামার স্মৃতির অরণ্যে হারিয়ে গিয়েছিল। মায়ের ঘর, মায়ের উষ্ণ দেহের স্পর্শ, হট ওয়াটার ব্যাগ মিলিয়ে গিয়ে শুধু সুড়ঙ্গের অন্ধকার ছিল এতক্ষণ আর মায়ের দীর্ঘ শ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছিল। ও দুই হাতের চেটোয় মুখ ঢেকে মায়ের কাছে বসে লামার সাহচর্য উপভোগ করছিল। মঙ্গতুর বকুনি তাকে লামার জগৎ থেকে এক ধাক্কায় নীচে টেনে আনলো। —"কায়া, সমস্ত রাত ধরে কি এভাবেই এখানে মায়ের বিছানায় পড়ে থাকবে? নিজের বিছানায় গিয়ে শোও।" কায়া আধঘুমে উঠে দাঁড়ায়। ও যে কখন বসা অবস্থায় চেয়ার থেকে গড়িয়ে মায়ের খাটে তাঁর বালিশের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছিল, তা ওর খেয়ালই নেই। মঙ্গতুর ডাকে একঝটকায় ও ঘুমের কাদাখোঁচা পথ পেরিয়ে সমতল শক্ত মাটির চত্বরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। ওর হাত ধরে আবার সেই পুরানো রাস্তায় হলঘর পেরিয়ে, গ্যালারী অতিক্রম করে বাড়ির অন্যদিকে তার নিঃসঙ্গ, হলুদ-জ্যোৎস্নায় ম্লান ঠাণ্ডা বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে।

ছুট্টু আড়মোড়া ভেঙে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে একবার চোখ খুলে ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেল—কায়া কোথায়? সে নিজেই বা কোথায়? কিন্তু সে ক্ষণিকের তরে মাত্র। আবার সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কিন্তু কায়ার ঘুম যেন উবে যায়। সমস্ত দিনের শ্রান্তির সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত বিষণ্নতা, একাকিত্ব, ক্ষোভ-রাগ-বিদ্বেষ, সঙ্গলিপ্সা যেন একসঙ্গে তাকে গ্রাস করতে আসে। বিশ্রী রকমের বিতৃষ্ণায় তার মন ভরে ওঠে। মনে হয় কাঁদলে যেন একটু হাল্কা বোধ করবে। কিন্তু এ এমন এক বিশ্রী অনুভূতি যে কান্নায় তা গলে পড়েনা, আবার জমাট বেঁধেও তাকে আয়ত্তে আনা যায় না। রোদন—অ-রোদনের মাঝামাঝি অবস্থায় কায়া শূন্য চোখে চেয়ে থাকে। মনে হয়, মঙ্গতুর স্পর্শেই তার মানসিক নিরাপত্তা রয়েছে। তাই তার গায়ে কম্বলটি ঢাকা দিয়ে মঙ্গতু যেই যেতে উদ্যত হয়, কায়া অমনি তার কোটের একপ্রান্ত চেপে ধরে। —দাঁড়াও, যেওনা! সে মনে মনে বলে। মঙ্গতু ভ্যাবাচাকা খেয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে। ওর মুখে জ্যোৎস্নার ম্লান আভা। কি মেয়েরে বাবা! ও রাগে মনে মনে গজগজ করে। তারপর মৃদুস্বরে বলে—"কি হলো কায়া? ভয়ের কি আছে?" মঙ্গতু মৃদুস্বরে একই কথা বারবার বলতে লাগলো। এ যেন কায়াকে নয়, নিজেকেই অভয় দেওয়া। ওর এই মৃদু গুনগুনানির অভয়বাণী কায়ার মনে ঘুমপাড়ানি গানের কাজ করে। তার ছোট্ট হাতের মুঠি ঢিলে হয়ে যায়, ঘুমের ভারে অলস হাত খাটের বাইরে ঝুলে পড়ে।

দুই

ওরা দু'জনে চড়াই বেয়ে উঠছিল। পিসি একটু ওঠেন, হাঁপান ও তারপর বসে পড়েন হাওয়া ঘরে। বেঞ্চে বসে পিসি জুত করে পানের কৌটো খুলে একটা পান ও দোক্তা মুখে দেন। তারপর কোমরের কষি ভালো করে এঁটে বাইরে বেরিয়ে এসে নতুন উদ্যমে আবার যাত্রা শুরু করেন।

যাত্রার এত তোড়জোড়—পিসি ও কায়া চলেছে কাকার বাড়ি ফক্সল্যান্ডে। পিসির আঙুল ধরে কায়া হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে এগুচ্ছে। চলতে চলতে একটু এগিয়ে বা পিছিয়ে পড়লেই পিসির চিল চিৎকার—"খবরদার বলছি কায়া, তড়বড় করবিনি! আমার সঙ্গে সঙ্গে থাক। তোর কিসের এত তাড়ারে ছুঁড়ি?" পিসি মাছের মতো হাঁ করে হাঁপাতে থাকেন। বুকটা হাপরের মতো ওঠানামা করে। কায়া অবাক হয়ে ভাবে—ওই তো এক রত্তি শরীর, এতে এত দম কোত্থেকে আসেরে বাবা? এর উপর যদি জোরে হাওয়া দেয় তাহলে তো চিত্তির! বড় বড় গাছ যেমন হাওয়ায় ধরাশায়ী হবার আগে বিষম দোলে, কায়ার পিসিমাটিরও ওই গাছের দশা—এই পড়েন কি সেই পড়েন। কায়া প্রাণপণে পিসিকে চেপে ধরে থাকে, পাছে হাওয়ার বেগে তিনি পপাতধরণীতল হন! হাওয়া আর কায়ার মধ্যে যেন পিসিকে নিয়ে টাগ্-অব্-ওয়ার চলে। হাওয়ার ঝটকা পিসিকে নীচে ফেলার চেষ্টা করে। আর কায়া পিসিকে উপরে ঠেলে দেবার চেষ্টা চালাতে থাকে। বেচারী পিসির দেহটা উপর-নীচ করে ঘড়ির পেন্ডুলামের মতো দুলতে থাকে। হাওয়ায় তাঁর শাড়ি হাঁটুর উপরে উঠে যায়। কালো-কোলো পিচের মতো সরু ঠ্যাঙ দুটি তখন বেরিয়ে আসে। কায়ার অতি কদর্য লাগে, লজ্জায় মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। ও চেঁচায়—"দোহাই পিসি, শাড়িটা নীচে নামাও।" পিসিও সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটেন—"মরে যাই, ছুঁড়ির লজ্জা দেখে বাঁচিনে! আরে এই বিজন-বিভুঁয়ে এসব কে দেখতে যাবে রে?" তিনি কায়ার হাত ধরে উপরে টানেন। ভর দুপুরে রোদ, চড়াই, খাড়া পাহাড়ের উপর পাইন গাছ— এছাড়া রাস্তা জনমানবশূন্য! তবুও কায়ার লজ্জা করে। এই ভদ্রমহিলাকে যদি কেউ তার মা ভেবে বসে? ছি-ছি, কী লজ্জা! কাপড়-চোপড়, চেহারাপাতির কোনও ছিরি-ছাঁদ নেই, এমন মহিলা তার মা হতে যাবে কোন দুঃখে? কায়া তাই চড়াই শেষ হলেই ঝটিতি পিসির হাত ছাড়িয়ে নেয়। ও এবার

একটু দূরে আলাদা হাঁটতে থাকে, একা একা—যাতে করে কেউ দেখে ফেললেও বুঝতে না পারে যে ওরা দুজনে একসঙ্গে একই জায়গায় যাচ্ছে। কিন্তু কিছু দূর গিয়েই তার মনটা বদলে যায়। বেচারী পিসি! কেমন হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে হাঁটছেন! যেন বিশ্বজগতে তিনি একা —তাঁর কেউ নেই। নিজের উপরেই তখন তার রাগ হয়। দৌড়ে পিছনে ফিরে এসে অনুযোগের সুরে পিসিকে বলে—"আমি আর হাঁটতে পারছিনা বাপু। দেখছ না, আমার আর পা চলছে না!" ও যেন অনুযোগের মোড়কে নিজের অপরাধী মনটাকে লুকিয়ে ফেলতে পারলে বাঁচে, অথচ এই কিছুক্ষণ আগেই পিসির সঙ্গে লোকচক্ষুর সম্মুখে সম্পর্ক রাখায় প্রবল অনীহায় মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছিল।

—"ও পিসি, আর হাঁটতে পারছি না, শুনছ! চলো কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিই।" ও জানে পিসি বসলেই তাঁর লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ দুটোও বসবে ও অসভ্যের মতো শাড়ির আব্রু ভেদ করে তা বেরিয়ে আসবে না। পিসি ও কায়া পরবর্তী হাওয়া-বিশ্রাম ঘরে বসে পড়ে।

দুজনে একই বেঞ্চের উপর পাশাপাশি বসেছিল। পিসি রাস্তার দিকে তাকিয়েছিলেন। কায়া তার উল্টো দিকে চেয়েছিল—যেখানে জঙ্গল, উঁচু পাহাড় ও প্রায় পুরো শহরটা নজরে পড়ে। লোয়ার বাজারের ছাত, রিজের গির্জাঘর ও সবচেয়ে উপরে জাখু পাহাড়ের চূড়া দেখা যাচ্ছে। রোদে আলো-আঁধারের খেলা চলছে। অর্ধেক শহর রোদে ঝকঝক করছে; বাকি অর্ধেকটা ছায়ার দোলনায় দুলছে। পুরো শহরটাকে এসময় ঠিক একটা ছকপাতা দাবার মতো মনে হচ্ছে। রৌদ্রোজ্জ্বল দিকটা সাদা ঘুঁটি, ছায়া ঘেরা অংশটি কালো ঘুঁটি।

—"মরা শহরের মুখে আগুন, পুরো শহরটা যেন মরে পড়ে আছে। এখানে আবার লোক থাকে, হুঁ!" পিসি গজগজ করতে লাগলেন।

—"মরা শহর কিসে দেখলে?" কায়া বলল।

—"মরা নয়তো কি? চারদিকে শুধু পাহাড় । বৈ আর কিছু নেই। রাক্ষসের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যেন এক্ষুনি সব গিলে খাবে। তোর মাকেও বলিহারি যাই। কি করে যে এখানে বারোটা মাস কাটিয়ে দেয় বাপু তা ভগবানই জানেন।" বারোমাস! কায়া আশ্চর্য হয়ে ভাবে। ঝাঁ ঝাঁ গরমের রোদে যখন পাতাগুলি শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়; পাতা ঝরার দিনে গাছ নেড়া হয়ে যায়, দীর্ঘ বর্ষার সময় যখন চতুর্দিকে শিলাবৃষ্টির ধুম পড়ে, আবার শীতের বরফ পড়ার সময়ে যখন রাত্রির অন্ধকারও তুষারশুভ্ররূপ ধারণ করে, কায়া আনমনে জানলার ধারে বসে নিঃশব্দে বরফ পড়া দেখে। সেগুলি কি শুধু 'বারোমাস্যা'র রোজনামচা মাত্র? না না, সে তো অপরূপা! এক একটি ঋতুর এক একটি বৈশিষ্ট্য। এই পাহাড়ের দেশে এ রূপের কোন সীমা নেই, নেই কোন আদি বা অন্ত। বারোটা

মাসের ফ্রেমে তাকে বাঁধা যায় না। মরা শহর আখ্যা তো কেবল নীচের থেকে আসা কাঠখোট্টা শহুরে লোকেদের নির্ধারণ করা। যে যার নিজের নিজের সুবিধেমতো পাহাড়ের বিভিন্ন ঋতুর রূপ-সৌন্দর্যকে সময়ের দাঁড়িপাল্লায় মাপে। পিসিও তাদেরই দলের একজন। নীচে মীরাট শহরে প্রয়াত স্বামীর বাসগৃহে একমাত্র সন্তান লামাকে নিয়ে তাঁর বাস। বছরে মাত্র দুবার অতিকষ্টে সাহস সঞ্চয় করে তিনি পাহাড়ে আসেন। পালা করে একমাস এই ভাই আর একমাস অন্য ভাইয়ের সঙ্গে কাটান। সেও কেঁদে-ককিয়ে। তিনি তো ভেবে কূলকিনারা করে উঠতে পারেন না যে এই পাণ্ডববর্জিত দেশে এই দুই ভাই আত্মীয়-স্বজন, শহরের হৈ চৈ ফেলে কি করে থাকে! আর এই দেশে একমাত্র স্থায়ী সজীব বলতে আছে বাঁদর, আর বাকি যা সবই অচল, অটল —স্রেফ পাহাড় আর জঙ্গল! মজার ব্যাপার হচ্ছে যে, এই জনমানবশূন্য অঞ্চলে দুই ভাই একসাথে থাকেনা। দুজনেরই স্বতন্ত্র বাসা। আর সে বাসাদুটিও এত দূরে দূরে যে এক জনের বাসা থেকে আর একজনের বাসায় যেতে হলে চড়াই উৎরাই করতে হয়। সেই চড়াই-উৎরাই-এ মনে হয় যেন দেহের খাঁচাখানা খুলে হাড়গুলি নড়বড় করে বেরিয়ে আসবে। শরীরের বাঁধন আলগা হয়ে যাবে। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনেও অনেক দুঃখ, অনেক সমস্যা এসেছে। সমস্যা কোন কোন সময় পর্বতসদৃশ কঠিন বলে মনে হয়েছে। কিন্তু এই পাহাড়ি ভুতুড়ে দেশের নীরস কঠিন জীবনের তুলনায় তাঁর নিজের পাহাড়প্রমাণ সমস্যাসঙ্কুল জীবনও অতি সহজ ও সরল বলে তাঁর মনে হয়। —কি বাজে জায়গা রে বাবা! চড়াই ভাঙতে ভাঙতেই তো জীবন কাবার হয়ে যাবার জো। তবু ভাগ্যিস যে কায়া সঙ্গে ছিল, তাই দুটো কথা কয়ে বাঁচা গেল। হাওয়া ঘরও আছে। দু'দণ্ড জিরিয়ে নেওয়া যায়। না হলে কি হতো? ভাবলেও গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। এই নির্জন বিজনে একা একা যেতে হলে তো এতক্ষণে তাঁর পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়ে দেহ টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ভাসতো। কাকা কিন্তু বারবার বলতেন—"রিক্সা কেন করলে না, ও দিদি! এত হাঁটার কি দরকার ছিল?" "রিক্সা আবার কিসের?" পিসি হেসে কথাটা উড়িয়ে দিতেন। কায়া কিন্তু এর ভিতরের কথাটা জানে। কিপ্টে পিসি রিক্সার ভাড়া নিয়ে এত বেশি দরাদরি করতেন যে প্রতিটি রিক্সাওয়ালা তাঁকে ভালো করে চিনে গিয়েছিল। কাজেই দূর থেকে তারা যখন দেখত যে বুড়ি কায়ার হাত ধরে হেঁটে আসছে, তখন তারা ঘণ্টি বাজিয়ে সন্তর্পণে পাশ কেটে বেরিয়ে যেত। রিক্সা থামানো তো দূরে থাক, তাদের কেউ পিছন ফিরে একবার তাকিয়েও দেখত না! প্রথম প্রথম কিন্তু তারা সওয়ারী পাবার লোভে আসত। কিন্তু ওই যে বুড়ির কিপ্টেমি ও দরদস্তুর! দরদাম দু'আনা থেকে আরম্ভ হতো, সেটি ধীরে ধীরে পিঁপড়ের মতো দুলকি চালে গড়াতে গড়াতে অতিকষ্টে আট আনায় গিয়ে উঠত, তার উপরে নয়। বুড়ি বীরবিক্রমে নেপোলিয়নের মতো এক রিক্সাওয়ালার কাছ

থেকে আরেক রিক্সাওয়ালার কাছে কায়ার হাত ধরে ঘুরতেন। রিক্সাওয়ালাদের যেন মেলা বসে যেত, কিন্তু দরদাম আট আনার উপর দু'টাকায় কখনই উঠত না। কায়ার লজ্জায় মাথা কাটা যেত। ওর চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে আসত। —"ছেড়ে দাও পিসি, দরকার নেই। চলো আমরা হেঁটেই যাই"। কিন্তু কায়ার কথা পিসির কানে গেলে তো! ভদ্রমহিলা একবার এদিক একবার ওদিক করে রিক্সাওয়ালাদের ধরে কখনও এক আনা বাড়ান, কখনও আধলা কমান। এই হাঁটাহাঁটিতে পিসির কালো কালো দাঁড়কাকের মতো দু'খানা ঠ্যাঙ বেরিয়ে আসে, অডিটোরিয়ামে স্টেজের স্ক্রিনের মতো শাড়ির আঁচলটাও গলার কাছে গুটিয়ে থাকে—সব মিলিয়ে এক বিশ্রী ব্যাপার! কোন কোন রিক্সাচালক আবার একটু ঠাট্টা করে বলে "মা, রিক্সার কি দরকার? আপনি সোজা ঘোড়ার উপর চেপে সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যান—তাড়াতাড়িও হবে, সস্তাও পড়বে। আপনাকে ঠিক বীরাঙ্গনা দুর্গাবতী বলে মনে হবে।" ... সব একে একে রণে ভঙ্গ দেয়। —"দেখলি কায়া!" পিসি হতাশ সুরে বলেন। "মুখপোড়া মিনসেগুলোর সবুর আর সইল না—সব কটা চম্পট দিল। আরে বাবা, আরও এক আনা ভাড়া কি আর বাড়াতুম না? নিয্যস বাড়াতুম!" পিসির কথা শুনতে কায়ার বয়েই গেছে। সে ততক্ষণে হাওয়া। একা একা অনেক দূরে চলে গিয়েছে। পিসি হঠাৎ উপলব্ধি করেন যে তিনি একদম জনশূন্য প্রান্তরে দাঁড়িয়ে একা একা বকে চলেছেন। চতুর্দিকে কেবল মাথা উঁচু করে পাহাড় দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলা হঠাৎ ভয় পেয়ে চিলচিৎকার দেন—"কায়া, ওরে ও কায়া পোড়ারমুখী, দাঁড়িয়ে যা।" পিসির ডাক খোলা আকাশের নীচে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো। ভয়ে বুড়ির মুখ ফ্যাকাশে! কায়া ততক্ষণে দৌড়ে পিছু ফিরে এসেছে—"এইতো পিসি আমি! অর্ধেক পথ পেরিয়ে এসেছি। ওই তো কালী মন্দির দেখা যাচ্ছে।"

অবশেষে কালী মন্দিরের প্রাঙ্গণে তারা পৌঁছয়। পিসি বুড়ি আর পারেনা। পুঁটুলিটি বালিশ করে মাথায় দিয়ে মন্দিরের চত্বরে শুয়ে পড়েন। কায়া মন্দিরের সাথে লাগোয়া জলের কল খুলে দেয়। আঃ, কি ঠাণ্ডা! শরীর যেন জুড়িয়ে গেল, এক মুহূর্তে সব ক্লান্তি উড়ে গেল।

—"কায়া, খুব হাঁপিয়ে গেছিস, তাই নয়?" পিসি শুয়ে শুয়ে সস্নেহে কায়াকে শুধান। কায়া ফাঁপড়ে পড়ল। মিথ্যে বলা যায় না। আবার সত্যি বললে যদি ভবিষ্যতে পিসি আর কখনই কাকার বাড়িতে সঙ্গে করে তাকে না আনেন! না, সে হতে পারে না। অতএব সত্য মিথ্যার একটা রফা করে নিয়ে কায়া মাথা নাড়ল —"পিসি আমি ঠিক ক্লান্ত হইনি, আবার একটু হয়েছিও। মানে শরীরে সব

জায়গায় ক্লান্তি নেই।"

—"সে আবার কি কথা রে?"

—"শুধু পায়ে বড় হাঁপিয়ে পড়েছি। এছাড়া আর সব ঠিক আছে।"

—"সেকি রে বোকা মেয়ে? শুধু পায়ে কি করে হাঁপিয়ে পড়লি?" —পিসি কিশোরীর মতো খিলখিলিয়ে হেসে ওঠেন। কায়া বড় বড় চোখ করে তাকায়। প্যাঁচামুখো পিসিকে আজ পর্যন্ত সে কখনও হাসতে দেখেনি। ওই মুখে মেঘ ছাড়া রৌদ্র নেই। সবসময়ই উৎকণ্ঠা ও ত্রাস সেখানে লেগে থাকে। পিসির খিলখিলে হাসি অবিকল লামার মতো। ও একদৃষ্টে পিসির দিকে চেয়ে থাকে, মন তার তখন লামার কাছে।

—"কি দেখছিস রে হাঁ করে?" পিসি কনুইয়ে ভর দিয়ে মাথা তোলেন।

—"না, কিছুনা পিসি। বলছিলাম যে লামা যখন এখানে থাকত, আমরা দুজনে প্রায়ই এই মন্দিরে আসতাম।"

—"ও, তাই।" পিসি আবার চিৎপাত হন। চোখ মুদে আসে। এরপর খুব মৃদুস্বরে জিজ্ঞেস করেন—"তোরা এখানে কি করতি?"

—"খেলতাম! কেন তোমাকে লামা কখনও কিছু বলেনি?"

শীতের বিকেলে ওরা তিন ভাইবোনে এখানে আসত। শীতের সময় মন্দির প্রায় জনশূন্য থাকত। যে কয়েকজন বা আসত, তারাও আরতির পর চলে যেত। শুধু পুরুতঠাকুর মা কালীর সামনে অনেকক্ষণ চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে বসে থাকতেন। কালী মণ্ডপের চারপাশে ছোট ছোট খুপরী ছিল। অন্ধকারে চোর পুলিশ খেলতে গিয়ে সব সেখানেই লুকাত। যার খোঁজার পালা সে পাগলের মতো মূর্তির চারপাশে ঘুরে ঘুরে খুপরী ঘরের বাইরে চক্কর খেত।

এখনও যেন ও স্পষ্ট চোখের সামনে সেই বিকেলটা দেখতে পায়।

আরতি শেষ হয়েছে। লামা লুকোলে পর কায়া ও ছুটুর খোঁজার পালা। দুজনে বহুক্ষণ খুপরী ঘরগুলোতে খুঁজে খুঁজে হয়রান। ছুটু ক্লান্ত হয়ে পুরুতঠাকুরের পাশটিতে বসে পড়ল। কায়া নিজে যখন শেষবারের মতো খোঁজার পালা শেষ করে ফিরে আসছে, অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ মনে হলো পাঁচিলের গায়ে ধসে পড়া কুলুঙ্গির উপর কে বসে আছে। ও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো—এ তো লামা! "লামা এখানে বসে— আমরা তো খুপরীগুলোতে খুঁজে খুঁজে ..."

—"এখানে আয় ..." লামা ওর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বলে। ও কাছে এগিয়ে এসে ওর পাশটিতে গা ঘেঁসে দাঁড়াল।

—"একটা কাজ করতে পারবি?"

—"কি কাজ লামা?"

ও লামার জন্যে পারে না হেন কাজ নেই।

লামা নিজের মুঠোয় ধরা একটা সাদা খাম বের করে ওর হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললে—

—"আমি চলে গেলে, এই খামটা তোর মাকে দিবি।"

—"এতে কি চিঠি আছে?"

—"তুই শুধু এটা মাকে দিবি। আমি দিয়েছি বলবিনা।"

—"তা'লে কি বলবো?"

—"বলিস, একজন লোক এসে এটা তোকে দিয়ে গেছে।" ... ও বোকার মতো লামার দিকে চেয়ে রইলো। লামা ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললে—"কাল আমরা রেল লাইনের ধারে বেড়াতে যাবো, কেমন?" তারপর কিছুক্ষণ ভেবে আবার বলল—"কাল গিনীকেও সঙ্গে নেবো। তুই যাবি তো?"

তিন

মেঘলা দিন। হাওয়া একেবারে বন্ধ। পাহাড়ও থমথম করছে। সমস্ত শহরটা যেন এক বিষণ্ণ আলোয় ছেয়ে আছে। আমরা নীচে নেমে আসছি। আমি হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মলিন, অবসন্ন অপরাহু! উপরে ঘাসের জঙ্গলে ঢাকা সুড়ঙ্গের কুঁজ, নীচে গিনী রেললাইনের উপর দিয়ে দৌড়চ্ছে। আমার চোখের সামনে ঘুরেফিরে এই দৃশ্যটাই কেন যে দুঃস্বপ্নের মতো ঘুরে ঘুরে আসে, তা আজও আমার বোধগম্যের বাইরে। এক এক সময় আমার নিজেরই নিজের অস্তিত্বের উপর সন্দেহ হয়—আমি কি সেদিনের সেই কায়া?

নীচে স্টেশনের লম্বা ছাদ আর ইলেকট্রিক লাইটের থাম দেখা যাচ্ছে, গাছের সারির সঙ্গে কিছুদূর গিয়ে সেটি মিলিয়ে গেছে।

আমি তিনজনের সারির মাঝে হাঁটছি। সামনে গিনী আর বেশ পিছনে লামা। মনের আনন্দে সে শিস্ দিচ্ছে। শিসের শব্দ কোন সময় কাছে, কোন সময় দূরে সরে যাচ্ছে। এক এক সময় দূর থেকে দূরান্তে গিয়ে সেটি মিলিয়ে যেতেই আমি হুড়বড় করে পিছু ফিরে চাই যে লামা বোধকরি পিছিয়ে পড়েছে। পিছন ফিরলেই দেখি ও সামনে এসে গিয়েছে। উড়নিটা গলায় বাঁধা, ছোট্ট কপাল, কপালের উপর ক'গাছি চুল ধুলো লেগে সাদা হয়ে গেছে। ভুরু ও চোখের পল্লবে ধুলো লেগে আছে। এই ধুলোর জালে একজোড়া পরিষ্কার ও স্বচ্ছ চোখ—এ চোখে মিনতি যাজ্ঞা বা করুণার প্রকাশ নেই, ভাবলেশহীন কঠিন ও দৃঢ়।

একটা বড় পাথর চাতালের মতো রাস্তার ধারে পড়ে আছে। খুব একটা বড় নয়। তবে সহজেই সেটার উপর চেপে বসা যায়। আমরাও প্রায়ই দুপুরে এসে বিকেল পর্যন্ত এখানে বসে থাকি। সিমলা-কালকার গাড়ি এখান থেকে ধোঁয়া উড়িয়ে বেরিয়ে যায়, সে ধোঁয়া কখনও কখনও আমাদের মুখে এসে লাগে। কখনও দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে তা নীচে সমতলের দিকে উড়ে যায়। গিনীও আমাদের দেখাদেখি উপরে চড়ার বৃথা চেষ্টা করে, দু'একবার কেঁউ কেঁউ করে ল্যাজ নেড়ে পাথরটার চারপাশে ঘুরে পায়ের নখ দিয়ে সেটা খোঁড়ার বৃথা চেষ্টা করে, তারপর মুখ গুঁজে সেখানেই শুয়ে পড়ে। গিনী দেখতে বড় সুন্দর। সাদায়-কালোয় মেশানো, গলার কাছে এসে অর্ধচন্দ্রাকারে বেঁকে গিয়েছে, ঠিক যেন একটা নেকলেশ পরে আছে গিনী। রাস্তা দিয়ে যখন হাঁটে মুখ নীচু করে মাটি শুঁকতে শুঁকতে চলে, জায়গা বিশেষে পায়ের নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ায়। ও যেন মাটির নীচে কোনও গুপ্তধনের খোঁজ পেয়েছে, এমনি হাবভাব। থেকে থেকে তার লাল টুকটুকে জিভটি বেরিয়ে আসে। ঠিক যেন লালরঙের একটা পানপাতা। জিভ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে।

লোকে অবশ্য বলে যে এ'জল কুকুরের ঘাম। ঝোপঝাড়ের মধ্যে দৈবাৎ গিনী হারিয়ে গেলেও এই জলবিন্দুর হদিশ ধরে ওকে ঠিক খুঁজে বের করা যায়।

গিনীর ইতিহাস আছে। শীতের সময় অফিসের বাবুরা যখন নীচে নেমে যেতেন উষ্ণ আশ্রয়ের খোঁজে, তখন অনেকেই তাঁদের পোষা কুকুরটিকে নির্দয়ভাবে ছেড়ে চলে যেতেন। অবলা জীবটি বাইরের খোলা বারান্দায় পড়ে থাকত। হাড়কাঁপানো শীতের রাতে কেষ্টর জীব এই সারমেয়ের দল ককিয়ে কাঁদত। সে কান্না লোকের বন্ধ দরজা ভেদ করে পৌঁছলেও, তাদের নিয়ে কেউ মাথা ঘামাতো না। গিনীকেও এই অবস্থায় আমিই প্রথমে দেখি। অর্ধচন্দ্রাকারে সাদা-কালোর একটা বলয় ঠিক একটা হারের মতো ওর গলা বেষ্টন করে রয়েছে। কুকুরটা প্রায় আধমরা অবস্থায় মিস্ জোসুয়ার বারান্দায় গুটিসুটি মেরে শুয়েছিল। ওকে ঠিক একটা নরম-সাদা উলের গোলার মতন মনে হচ্ছিল। ওটাকে টেনে-টুনে আমি কলঘরে নিয়ে গিয়ে গরম গরম জলে স্নান করিয়ে দিলাম। কিন্তু গলার অর্ধচন্দ্রাকার মালা তো যায় না! বরঞ্চ সেটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। শুধু গলাই নয়, তার রেশ গিয়ে মিশেছে কুকুরটার কপালে—ঠিক যেন সাদা-তিলকধারী বোষ্টম! সেই থেকে কুকুরটাও যত্ন পেয়ে বাড়িতে রয়ে গেল। হয়তো বা ওর কোন মনিব ছিল। কিন্তু যেদিন থেকে সে আমাদের স্নেহের উষ্ণ পরশ পেলো, গরম জলে স্নান করার পর যেন সে তার পুরানো জগতের মায়া মমতা ধুয়ে মুছে ফেলে সম্পূর্ণভাবে আমাদেরই হয়ে গেল।

আমরা গিনীকে নিয়ে খুব বিরক্ত করতাম। ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটি প্রায় সময়ই বুজে থাকত। ওর চোখ কেমন দেখার জন্য, ছুটু ওর চারটে পা চেপে ধরে থাকত। গিনী লাফালাফি করার বৃথা চেষ্টা করত। লামা ওর চোখ দুটো জোর করে খুলত। ঠিক মার্বেল পাথরের মতো চকচক করত গিনীর চোখ। ওর চোখের স্বচ্ছ তারায় আয়নার মতো আমরা নিজেদের দেখতাম। মনে হতো আমরা ওর চোখের তারায় ঢেউ-এর দোলায় দুলছি। আমাদের ভারি মজা লাগত। লামা কিন্তু বিজ্ঞের মতো গম্ভীর হয়ে এক একটা উদ্ভট কথা বলত। গিনীর চঞ্চল চোখের তারা সম্বন্ধে তার ব্যাখ্যা ছিল যে ওর চোখের মধ্যে যে একটা ভিজে চকচকে ভাসমান ভাব আছে, সেটি গিনীর আত্মা। আমরা ভাবতে বসতাম, গিনীর শরীরের কোন অংশটি তার আত্মা। চোখের তারায় ভাসমান পরত অথবা আয়নার মতো তার চকচকে ভাব—যাতে আমরা নিজেদের চেহারা দেখতাম, নাকি তার লাফালাফি— ছটফট করা দেহটা! আমরা জোর করে তার আত্মাকে খাঁচাছাড়া করার চেষ্টা করছি ভেবে মরমে মরে যাই।

গিনীর অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। ওকে যেন লীমা পুরোপুরি বশ করে ফেলেছে। ও ক্রমশ লামার ন্যাওটা হয়ে উঠল। রাত হলেই ও ল্যাজ নাড়তে নাড়তে লামার ঘরের সামনে গিয়ে হাজির হতো। লামা ওকে ভিতরে ঢুকতে দিত

না। ও সারা রাত বারান্দায় বসে থেকে কেঁউ কেঁউ করে পায়ের নখ দিয়ে দরজা আঁচড়াত, শীতে কাঁপতে কাঁপতে সারা রাত ওখানেই কাটিয়ে দিত, যেন লামা একটু কৃপা করে দরজার গোড়ায় ওকে স্থান দিলে ওর সারমেয় জীবন কৃতার্থ হবে। লামা ওকে কী গুণ করেছিল যে বাড়িতে এত ঘর থাকতে লামারই বন্ধ দরজার সামনে ও ধরনা দিয়ে বসে থাকত! ভেবে আজও অবাক হই।

কিন্তু সেদিন দুপুরে গিনীর কী অদ্ভুত ব্যবহার। ও কি জানতো যে আমরা ওই চাতালটার উপর বসবো? দেখি আমাদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে ও সোজা নীচে নেমে যাচ্ছে ... নীচে ... আরও নীচে—সুড়ঙ্গেরও ওপারে ঝোপের ধারে ... যেখানে রেললাইন রোদে রুপোর মতো ঝকঝক করছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে যেন সাদা একটা উলের বল নীচের দিকে গড়িয়ে যাচ্ছে। এরপর আর কিছু দেখা গেল না। শুধু নির্জন পাহাড়, ঝোপঝাড় আর মেঘের আনাগোনা—জায়গাটা যথাবৎ শান্ত-অনড়-স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে। লামার শিস বন্ধ হয়ে গেল। শুধু হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ!

—"তুই চিঠিটা দিয়েছিলি?" হঠাৎ লামা কথা বলে উঠল। আমি চমকে তাকিয়ে দেখি ও একেবারে আমার সামনে দাঁড়িয়ে। পিছনেই মা কালীর মন্দির।

—"লামা, চিঠির একটি বর্ণও কেউ বিশ্বাস করেনি।" লামা সুড়ঙ্গের দিকে মুখ করে বসেছিল। আমার কথায় ও মুখ ফিরিয়ে আমাকে দেখলে। ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠেছে—যদিও চোখ ও মুখের ভাবে কোনও বিরক্তি নেই।

—"একদিন নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে", ও মৃদুস্বরে বলল।

একদিন ... কিন্তু সে কবে? সময়ই বা আর কোথায় তেমন একদিনের? ও তো যে কোনও দিন মীরাট ফিরে যাবে। মনে পড়ে লামা যখন আমাদের বাড়িতে এসেছিল, ও নিজের ঘরের দেওয়ালে নব্বুই-টা লম্বা দাগ কেটে রেখেছিল। এটাই ছিল ওর ক্যালেন্ডার। একটা করে দিন যেত আর ও একটা করে দাগ কেটে দিত। এখন আর একটি দাগও বাকি নেই। তখন ছিল গরম কাল। মিস্ জোসুয়ার 'প্লেন' গাছে সবে পাতা গজাতে শুরু করেছে। পিসি ঘন ঘন চিঠি লিখছেন। এখন দাগগুলি সব কাটা হয়ে গিয়েছে। 'প্লেন' গাছও লালে-লাল হয়ে উঠেছে। সময় এগিয়ে চলেছে। লামার জন্য পাত্রও ঠিক করা হয়ে গেছে। লামার মা, আমার পিসি শুধু দিন গুণছেন—কবে লামা আসবে, ওকে পাত্রস্থ করে তিনি কন্যাদায় থেকে মুক্ত হবেন!

আমি ভাবতে বসি—পাত্র এত দূরের শহরেই বা কেন পাওয়া গেল? এখানে কি ছেলের অভাব নাকি? মাকে কথাটা বলতেই তিনি হাসলেন—"এখানে ছেলের মতন ছেলে কই রে?"

আমি তো ছেলের মেলা দেখি। এখানে, ওখানে, স্কুলে, বাজারে, ময়দানে—

সব যেন মাছির মতো ভ্যান ভ্যান করে জটলা করছে।

—"লামা, ওই চিঠি কি তুমি নিজে লিখেছিলে?" আমি ওর কাছ ঘেঁসে বসলাম।

—"কেন রে? মা কি জিজ্ঞেস করছিলেন নাকি?"

—"আমি মা'কে বললাম যে একটা লোক এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। মা আমার কথা বিশ্বাস করেননি। তিনি চিঠিটা মিস্ জোসুয়াকে পড়ালেন। মিস্ জোসুয়া চিঠি পড়ে মন্তব্য করলেন "এই চিঠির আগাগোড়া সব মিথ্যে, বোগাস্!"

—"মিথ্যে?" লামা উত্তেজিত হয়ে উঠল। "ওই ফর্সা রঙের সাদাচুলো বুড়িটা এর কি মর্ম বুঝবে রে?" এরপর চুপ করে ও আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগল। কিছুক্ষণ আমরা দুজনে নিঃশব্দে বসে রইলাম। বাতাসে জঙ্গলের সড়সড় শব্দ ছাড়া আর সব চরাচর নিস্তব্ধ।

—"তোর কাছে চিঠিটা আছে?"

—"হ্যাঁ, লামা! আমি লুকিয়ে ওটা নিয়ে এসেছি।" আমি দোমড়ানো-মোচড়ানো খামটা বের করে তার হাতে দিলাম। কিন্তু ও সেটিকে ছুঁয়েও দেখল না। শুধু মাথা নেড়ে বলল—"পড়!"

—"তার মানে তুমি এই চিঠি লেখোনি?" আমি ওর দিকে উৎসুক চোখে দেখি। লামার নজর তখন রেললাইনের উপর।

—"লামা, চিঠিটা পড়ব?" লামা মাথা নেড়ে সম্মতি জানালে। আমি পড়তে শুরু করলাম। চিঠির প্রথমেই লেখা রয়েছে—

আপনাদের সঙ্গে কেউ প্রবঞ্চনা করেছে। যে পাত্রের সঙ্গে আপনারা মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছেন—সেই পাত্রটি দোজবরে, বৃদ্ধ ও অপারগ। চোখে ভাল দেখে না, কানে কম শোনে। তার প্রথমা স্ত্রীর মাত্র ছ'মাস আগে মৃত্যু হয়েছে। সে অনেক কষ্ট সয়ে মরেছে। এ কথা আর কেউ না জানুক, তার মা বিলক্ষণ জানেন—যিনি তার হাত-পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিয়েছিলেন। যে লোক স্ত্রীর মৃত্যুর পর ছ'মাস যেতে না যেতেই আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চায় সে শুধু নিজের ভোগ বিলাস চরিতার্থ করতেই আবার বিয়ে করতে চায়, স্ত্রীকে সুখী রাখতে নয়। তার প্রথমা স্ত্রীর অতৃপ্ত আত্মা বাড়ির চতুর্দিকে ঘুরে বেড়ায়—এর অনেক প্রত্যক্ষদর্শী আছেন। দ্বিতীয়া স্ত্রীর কতটুকু নিরাপত্তা এ বাড়িতে থাকবে, সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। এমতাবস্থায় আপনারা কি আপনাদের মেয়ের বিয়ে এখানে দেবেন? এখনও সময় আছে, এ বিষয়ে বিবেচনা করুন। যদি মেয়ের ভালো চান তবে তাকে কখনই মীরাটে পাঠাবেন না, কেননা মীরাটে পাঠানো মানেই এ বিয়ের স্বপক্ষে সমর্থন ও তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া। মনে রাখবেন এর চেয়ে বড় অপরাধ, এর মতো পাপ আর দুটি নেই। আবারও সতর্ক করে দেওয়া কর্তব্য বলে মনে করি যে, যদি আপনাদের মনে তিলমাত্রও পাপের ভয় থেকে থাকে তবে মেয়েকে মীরাটে

পাঠাবেন না। মীরাটে পাঠানো মানেই তাকে অবধারিত অপঘাতে মৃত্যুপথে ঠেলে দেওয়া। এর তলায় একটি ছবি আঁকা রয়েছে—একটা কঙ্কালের মাথা, মুখে তার বিকট হাসি। তার সোজাসুজি একটি তীরের রেখাচিত্র আর এক কোণে লেখা মীরাট।

—"ব্যস? আর কিছু নেই?" লামার উদ্‌গ্রীব দৃষ্টি আমার দিকে। মনে হলো যেন ও আরও কিছু আশা করেছিল। এত সংক্ষিপ্ত চিঠি দেখে ও যেন নিরাশ হলো।

—"লামা, এবার তোমায় কেউ ওখানে পাঠাবে না।"

—"কেন?"

—"কেন কি? এরপরও এমন লোকের কাছে, সবকিছু জেনে শুনে, কেন পাঠাবে?" বলে ওর মুখের দিকে এমন করে চাইলাম যেন এর সমাধানও ওর কাছেই আছে। কিন্তু লামা পাথরের উপর পাথরের মতোই নিস্পন্দ বসে রইল। আমার কথা তার কানে গেল কিনা বোঝা গেল না। ... অনেকক্ষণ পরে ও চোখ তুলে আমার দিকে চাইল। একটা শুকনো হাসি ওর মুখে ফুটে উঠলো।

—"মিথ্যে ... সব মিথ্যে, কায়া! এর একবর্ণও সত্যি নয়!" বলে আমার হাত থেকে সে খামটা টেনে নিয়ে চিঠিটা বের করল। তারপর আস্তে আস্তে পুরো চিঠিটা কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলল। ... চিঠির কুচিগুলি রেললাইনের উপর বাতাসে উড়তে লাগলো। আমি আনমনে সুড়ঙ্গের দিকে তাকালাম। মনে পড়লো একদিন এখানেই এক জনবিরল নিঃশব্দ দুপুরে লামা আমায় চিৎকার করে কোন বিশেষ একটি কথা বলেছিল—রেলের ঘড় ঘড় শব্দে সে কথা আমার কানে যায়নি। আমি বোধকরি কোনদিনই লামার কথা ভালো করে বোঝার চেষ্টা বা শোনার চেষ্টা করিনি। আমার তো মনে হয় যে রহস্যময়ী লামাই বোধকরি প্রকৃত পাহাড়ের মেয়ে আর আমরা সবাই শহুরে। ভেবে ভেবে কূলকিনারা পাইনা যে প্রকৃতিকন্যা, পাহাড়ের মেয়ে লামাকেই এই পাহাড়, এই জঙ্গল, এই রেললাইন-কালী মন্দির সব ছেড়ে চলে যেতে হলো, আর আমরা এখানেই পড়ে রইলাম।

—"আমি যাবই না!" সেদিনই রাত্রে বারান্দায় বসে লামা ঘোষণা করেছিল। আমরা ফিরে এসে বারান্দায় বসেছিলাম। মিস্ জোসুয়ার ঘরে অনেক রাত পর্যন্ত আলো জ্বলে। ক্ষীণ আলোর রেখা তাঁর বাগানে গাছের উপর পড়ে এক মোহিনী-মায়া রচনা করেছিল। গিনী যথারীতি লামার ঘরের দরজার কাছে বসে। হঠাৎ লামা বললে—"কায়া, তুই ভুলেও কখনও আমার ঘরের দরজা বন্ধ করবি না আমি চিরদিন এখানেই থাকবো।"

—"সেকি, তুমি মীরাটে ফিরে যাবে না?"

—"সে তো যেতেই হবে!" ও রহস্যজনকভাবে আমার দিকে তাকালে—

—"কিন্তু আমি এখানেও থাকবো - ক্ - কেউ জানতে পারবে না।"

—"আমরা কি তোমায় দেখতে পাবো?"

—"নিশ্চয়ই! যখন ছুট্টু আর তুই তোদের ঘরে থাকবি, আমি তখন তোদের কাছে আসব—রোজ রাতে আসব।"

চারিদিক নিঃঝুম নিশীথ রাত। বারান্দার কড়িকাঠ হঠাৎ ক্যাঁচকোঁচ শব্দ করে উঠল। গিনী খামোখা ভয় পেয়ে কেঁদে উঠল। লামার অভয়বাণী পেতেই সে চুপ করে গেল। অদ্ভুত লামার সম্মোহনীশক্তি।

হঠাৎ লামা হুকুম করল—"তোর হাত দে, ভালো করে হাতটা মেলে ধর।" আমি হাত বাড়িয়ে দিতেই ও হাতদুটি নিজের দুই হাতের মুঠোয় টেনে নিয়ে বলল —"তুমি এ বিষয়ে কারুর সঙ্গে কোন কথা বলবেনা, আমায় কথা দাও।" আমি ভয় পেয়ে বললাম—"কি বিষয়ে; কোন্ কথা লামা?"

—"তুমি আত্মায় বিশ্বাস করো, কায়া?" —আমার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে লামা বলল।

—"আত্মা?" আমি প্রায় কিছু না ভেবেই সম্মতিসূচক মাথা নাড়লাম। বস্তুত আমার বয়সটাই এমন ছিল যে খুব তাড়াতাড়ি আমি সবকিছুতেই বিশ্বাস করে ফেলতাম। আমার পক্ষে সেটাই সবচেয়ে সহজ ছিল, কেননা এতে নিজের মাথা খাটিয়ে কোনও যুক্তি-তর্ক আমায় তৈরি করতে হতো না।

—"গিনীর চোখের মধ্যে কিছু দেখতে পাস?" —ও প্রায় ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞেস করল। ওর কথা আমার কেমন রহস্যময় বলে ঠেকলো। ও কী বলতে চায়?

—"জানিস কায়া, রোজ রাতে গিনী যখন আমার দরজায় এসে করুণ মিনতি করে ঘরে ঢোকার জন্যে, হাঁচোড়-পাঁচোড় করে—সে আর্তনাদ তুই কখনও শুনেছিস কি? নাঃ, কি করেই বা শুনবি!" ও শুকনো হেসে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—"তুই বড় স্বার্থপর মেয়ে! কেবল নিজের দুনিয়া নিয়েই মশগুল। তুই কেমন করে এসব ব্যাপার জানবি? শোন, গিনীও মুক্তি চায়, ঠিক যেমন করে আমি চাই। কি করে মুক্তি পেতে হয় জানিস?" ও আমার হাত ডলতে লাগলো। ... আমার সমস্ত শরীর হঠাৎ হিম হয়ে এলো। কি বলতে চায় লামা? মুক্তি? পাওয়া নয় ... দেওয়া ... এসবের মানে কি?

একটা গুমগুম শব্দ শোনা গেল পাহাড়ের পিছন থেকে। যেন কেউ বড় একটা পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে ফেলছে।

—"গাড়ি আসছে।" লামা বলল।

আমরা পাথরের চাতাল থেকে নেমে সুড়ঙ্গের দিকে এগুচ্ছি। চারদিকে লম্বা বড় বড় হলদে ঘাস। ঘাসের উপর পাইনের ছুঁচলো পাতা পড়ে আছে—আমাদের পা তাতে

পিছলে পিছলে যাচ্ছে। খুব সন্তর্পণে আমরা নীচে নামছি। শান্ত পাহাড়ি দুপুর। সমস্ত শহরটা যেন ঝিমিয়ে আছে। বাতাস বন্ধ, বন্ধ জঙ্গলের সড়সড় শব্দও।" গিনী কোথায়?" মৃদুস্বরে লামা বলল। ওর স্বর মৃদু হলেও তার মধ্যে অধৈর্য প্রকাশ পেলো।

কুকুরটা সুড়ঙ্গের কাছে বসেছিল। মুখ খোলা, জিভ বের করে হ্যা হ্যা করে হাঁপাচ্ছে। পায়ের শব্দ শুনেই ও নিঃশ্বাস বন্ধ করে কান খাড়া করলে। চেনা শব্দ পেতেই নিশ্চিন্ত হয়ে আবার চোখ বন্ধ করলে।

—"গিনী, গিনী" বিকৃতস্বরে লামা ডেকে উঠলে। অবশ্য লামা এভাবেই কুকুরটাকে ডাকতো। ... লামার ডাকে গিনী গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালে। তারপর এদিক-ওদিক তাকিয়ে শব্দের উৎস বোঝার চেষ্টা করে, লেজ নেড়ে সুড়ঙ্গের দিকে হাঁটতে লাগলে। আমি গিনীকে লক্ষ করছিলাম। ও যেন ঠিক ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে নিজেরই ছায়াকে অনুসরণ করে হাঁটছে। সুড়ঙ্গের কাছে এসে হঠাৎ গিনী থমকে দাঁড়িয়ে পড়লে। চারদিকে তাকিয়ে কাউকে খুঁজলো। ... এতক্ষণে লামার কথা আমার খেয়াল হলো। পিছন ফিরে দেখি তার পাত্তা নেই। শুধু সুড়ঙ্গের আশপাশের বাতাস একটু কেঁপে কেঁপে উঠছিল। উপর দিয়ে কালো ধোঁয়া দেখা গেল—দূর থেকে গাড়ি আসছে।

গিনী আমার থেকে অল্প দূরে ছিল। আস্তে আস্তে সে দূরত্ব বেড়ে চলল। কুকুরটা যেন সব কিছু বিস্মৃত হয়ে সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে আসা ডাককে লক্ষ করে যন্ত্র চালিতের মতো দৌড়চ্ছিল। ... আমার হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে গেল ... দূর থেকে শুধু গিনীর দেহের সাদা-কালো দাগ দেখতে পেলাম। সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে সমানে লামার অধীর অস্থির শিস আর ডাক ভেসে আসছে। এই ডাকে আদর ও শাসানির সঙ্গে সঙ্গে এক অদ্ভুত অমানবীয়, গা-ছমছম করা আমন্ত্রণ ছিল, যা উপেক্ষা করা কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়—গিনী তো কোন্ ছার! এ যেন মরুভূমিতে মরীচিকার হাতছানি, যা ডেকে ডেকে মরণের কোলে টেনে এনে তবেই ক্ষান্ত হয়! এই রহস্যময় ভৌতিক পরিবেশের গা ছমছম করা ভাব অনেক বছর পর্যন্ত আমার মনে গেঁথে ছিল।

ওই ভৌতিক দুপুরে আমিও বোধকরি সম্বিৎ হারিয়ে ফেলেছিলাম। আমি ভাবলেশহীন চক্ষে রেললাইনের উপর রুপোলী তারের দিকে তাকিয়ে আছি! শব্দের দমকে সেটা কেঁপে কেঁপে উঠছে। গিনী নীচে সুড়ঙ্গের দিকে নেমে যাচ্ছে। ও আবার থমকে দাঁড়ালে। সুড়ঙ্গের দিকে মুখ উঁচু করে শোঁকার চেষ্টা করলে ... তখনও এক অদৃশ্য আহ্বান যেন তাকে চুম্বকের মতো টানছে—"গিনী ... গিনী ... গিনী ...।" ও সুড়ঙ্গের অন্ধকারে ঠাহর করতে পারছে না ডাকটা কোন দিক থেকে আসছে। ওর কান খাড়া, সমানে ল্যাজ নেড়ে যাচ্ছে।

আমি দূর থেকে মূক দর্শকের মতো এই দৃশ্য দেখে যাচ্ছি। আমার পা দুটো যেন

চুম্বকের টানে সেখানেই আটকে গিয়েছে। এতটুকুও নড়তে পারছি না। শুনে যাচ্ছি সেই অশরীরী ডাক ... দূর ... বহুদূর হতে সে ডাক ভেসে আসছে। ... গিনী এগিয়ে যাচ্ছে ... গম্‌গম্‌ শব্দ ... রেললাইন ... লাইনের উপরের তার কেঁপে কেঁপে উঠছে। ... হঠাৎ ... উঃ, একটা গগনভেদী চিৎকার! একি! কে ... কে অমন করে চেঁচালে? ওঃ, এ তো আমারই চিৎকার! কিন্তু আমি অমন করে চেঁচিয়ে উঠলাম কি করে? আমার চিৎকার আমারই কানে বিকটভাবে বেজে উঠলো। হঠাৎ সামনে তাকিয়ে দেখি সব শান্ত ... পাহাড়-আকাশ সমাহিত—যেন অন্তহীন স্তব্ধতায় মূক হয়ে রয়েছে। শুধু দূর থেকে দেখা যাচ্ছে ছুটন্ত ট্রেনের পিছনের অংশ ... ঘড় ঘড় করে সুড়ঙ্গ পেরিয়ে যাচ্ছে। এরপর আর কিচ্ছু নেই ... শুধু এক অন্তহীন গতি ... অচলের গতি ... না-বলা-বাণীর গতি ... নীরব স্তব্ধতার গতি! যেখানে সময়-অসময়, জীবন-মৃত্যু, দিন-রাত থেমে গিয়েছে। শুধু কঠোর বাস্তবতার নিদর্শন স্বরূপ রেললাইনের উপর পড়ে রয়েছে রক্তে দলা হয়ে যাওয়া এক গোছা সাদা উলের লোমে ভরা একটা ছোট্ট দেহ! দূর থেকেও তার গলার অর্ধচন্দ্রাকার; কালো-সাদা চাপড়ের মালা দেখা যাচ্ছে। এই দৃশ্য অনেকদিন পর্যন্ত জুজুবুড়ির মতো যেন আমায় তাড়া করে ফিরত। খোলা সুড়ঙ্গের মুখ, পিছনে কালো ধোঁয়া, গম্‌গম্‌ শব্দ, ঝোপের আড়াল থেকে সুড়ঙ্গের মধ্য হতে 'গিনী-গিনী' করে অধীর ডাক ... তারপর এক বিকট চিৎকার ... এক কাতর জান্তব আর্তনাদ ... সেই আর্তনাদ পরে বাতাসে ফিরে ফিরে ফিসফিসিয়ে ভেসে বেড়াতো! কি অলৌকিক লামার জিঘাংসা!!

আমি অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। রোদের তাপ আস্তে আস্তে কমতে লাগলো। হঠাৎ লক্ষ করে দেখলাম সুড়ঙ্গের পিছনের ঝোপটা নড়ছে। তারপর লামার মুখ দেখা গেল, এরপর তার পুরো শরীরটা। কি অদ্ভুত রহস্যময়ী বলে মনে হলো তাকে। যেন এক স্বপ্নের ঘোরে সে রেললাইন ধরে হেঁটে চলেছে। বেশভূষায় কোন পরিবর্তন নেই—ঠিক সেইভাবেই সালোয়ারটা গোটানো, উড়নিটা পেটের কাছে বেল্টের মতো করে বাঁধা। সালোয়ারের পায়ের গোছের দিকটা কাদায় মাখো মাখো হয়ে আছে। হাতে রক্তে ভেজা গিনীর গলার চামড়ার কলার—ওতে পেঁজা তুলোর মতো তার সাদা লোম লেগে রয়েছে। রক্তে লাল বকলসে সাদা লোম আরও সাদা দেখাচ্ছে। সে কারুর দিকে না তাকিয়ে এগিয়ে যেতে লাগলো। অন্য সময় হলে আমিও বোধকরি তাকে অনুসরণ করতাম। কিন্তু সেদিন প্রবৃত্তি হলো না। দূর থেকে যেমন করে লোকে কোন হিংস্র বন্য জন্তুকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে— ঠিক তেমন করেই ওকে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম। দেখতে দেখতে হঠাৎ অনুভব করলাম যেন দুপুরের উষ্ণতা হারিয়ে গেছে—ফুরিয়ে গেছে এক উজ্জ্বল দিন!

চার

এরপর আস্তে আস্তে দিন ছোট হতে শুরু করল। শীত আসার পূর্ব সূচনা দিয়ে পাহাড় ধীরে ধীরে ধূসর বর্ণ ধারণ করল। দিনের আলোর আয়ু অপরাহ্ণ পর্যন্ত, তারপরেই মেঘের আনাগোনা শুরু হয়ে যায়। এই সময় রাত নামার আগেই আঁধার করে আসে। নীচে পাকদণ্ডীর কাছে দাঁড়িয়ে মনে হয় একটু উপরে উঠলেই বোধহয় রোদের অবশিষ্ট আঁচটুকু চেঁছেপুঁছে নেওয়া যাবে। কিন্তু উপরে উঠে এলে সে ভ্রম দূর হয়। পড়ন্ত বেলার রোদ শেষ জানান দিয়ে ডুবে যাচ্ছে তখন। রাতের সাধ্য কি তাকে ঠেকিয়ে রাখে? সেপ্টেম্বরে শীতের উপক্রমে সমস্ত শহর ঝরাপাতায় ছেয়ে থাকে।

লামা বাইরে বাইরেই ঘোরে। ও চলে যাবার পর সমস্ত বাড়িটা যেন খাঁ খাঁ করতে লাগল। মা এখন ঘরের বাইরে আসা একদম ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর শরীর এত বড় হয়ে গেছে যে মনে হয় মা না হয়ে মায়েরই অবয়বে যেন অন্য কোন মানুষ বাস করছে মার ঘরে।

এক একসময়ে অপরাহ্ণের ম্লান কুয়াশার আলোয় বাড়িটাকেও কেমন যেন অপরিচিত লাগে—মনে হয় যেন এ আমাদের বাড়ি নয়। কায়া নামের পাড়া বেড়ানী মেয়েটি যখন ফিরে আসে, তখন সেও এক-এক সময় থমকে দাঁড়ায়। কাঠের দোতলা বাড়ি। নীচ তলায় মিস্ জোসুয়ার খালি বারান্দা, ঘরের বন্ধ জানলা, উপরে লাল টিনের ঢালু চালা। চালার এক কোণে উঁচু কালো চিমনি—এই-ই তার বাসস্থান। বাবুর ঘর তো সব সময়ই বন্ধ। লামার ঘরের কড়া দমকা বাতাসে নড়ত, কখনও খুলত, কখনও বন্ধ হতো। তার ক্যাঁচকোঁচ শব্দ বাড়িময় ছেয়ে থাকত। বিকেলের বিষণ্ণতায় যখন বাড়ির কড়ি-বরগায় শব্দ ওঠে, তখন মনটা উদাস হয়ে যায়। মনে হয় এ বাড়িতে বোধহয় কেউ থাকে না। শীতের সময় অন্যান্য বাড়ির মতো এ বাড়িও যেন খালি পড়ে থাকে। এর বাসিন্দারাও পাহাড় ছেড়ে শহরে পালিয়েছে। সে যদি এ সময়ে বাড়ি না ফিরে পিছন ফিরে উল্টোদিকে হাঁটতে শুরু করে, তাতে কারও কিছু যাবে আসবে না—কেউ তাকে ফিরে ডাকবে না। রাতের অন্ধকারে বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকলেও তার অভাব বোধ করার মতো একটি প্রাণীও এ বাড়িতে নেই। ওর কাছে এখন বাড়ি ও সামনের পাহাড় এক। দুটোর মধ্যে কোনই পার্থক্য নেই। সবকিছুর এরা একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু

মূক-বধির। এভাবেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে—দাঁড়িয়ে থাকবেও চিরকাল। কায়া বোধহয় এই প্রথম ভীষণভাবে নিঃসঙ্গতার বেদনা বোধ করল। এই একাকিত্বে কিন্তু সে ভয় পেলোনা। বরঞ্চ এই নিঃসঙ্গতা তাকে কৌতুকান্বিত করে তুলল। ... একি কোন অসুখ? এর উৎস দেহে না মনে? কিন্তু অন্য অসুখের মতো এর কোন লক্ষণ বাইরে প্রকাশ পায় না। কেউ জানতে পারেনা তার কোথায় কষ্ট—ছুটু, মা, মিস্ জোসুয়া—কেউ নয়। কায়া হঠাৎ উপলব্ধি করলে মায়ের শরীর বড় হয়ে যাবার মতো তারও শারীরিক পরিবর্তন হচ্ছে। মায়ের পরিবর্তন চোখে পড়ে, তারটা পড়ে না।

সেদিন সন্ধ্যার পর যথারীতি পাড়া বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে হতভম্ব কায়া বাইরেই দাঁড়িয়ে পড়ল। এ কিরে বাবা? রাতারাতি বাড়িতে কি হলো? এমনটি তো কখনও হয় না? সমস্ত ঘরের আলো জ্বলছে। ভিতর বাড়িতে লোকেরা ব্যস্ত পায়ে চলাফেরা করছে—তারই ছায়া বারান্দায় এসে পড়েছে। কায়া যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল—এত রাতে আবার কে এলোরে বাবা? সবচেয়ে তাজ্জবের কথা, যে মিস্ জোসুয়ার ঘরদোরের জানলার কপাট সব সময় বন্ধ থাকত, সেই মিস্ জোসুয়ারও ঘরের দরজা হাট করে খোলা।

অবাক কায়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে লোকটাকে প্রথম দেখতে পেলে। এ তো সবসময় ধাইমার সঙ্গে আসে! তার মানে তিনিও এসেছেন। লোকটা সবসময়ই বসে বসে কেবল মাথা নাড়ে। অদ্ভুত চেহারা লোকটার। তামার মতো লালচে রঙ, ন্যাড়া মাথা আর খুবই বেঁটে। বেঁটে না বলে বামন বলাই ঠিক। বারান্দায় বসে পাঁচিলের গায়ে হেলান দিয়ে লোকটা চুপচাপ মাথা নেড়ে চলেছে। মঙ্গতু চটের ছালা পেতে লোকটাকে বসতে দিয়েছে। লোকটাকে দেখে হঠাৎ বৌদ্ধ ভিক্ষু বলে ভুল হয়।

কায়া লোকটার সামনে হাঁটু গেড়ে বসলে। —"ভোলু, কখন এলে? কতক্ষণ বসে এখানে?"

এক চিলতে হাসি আনার মতো, লোকটা ঠোঁটদুটি একটু ফাঁক করলে, চোখের পাতা দুটি নেচে উঠল, ঘাড় একদিকে কাত করলে। লোকটা এইভাবেই কথার উত্তর দিলে। ও বোবা! এভাবেই ও কথা বলে। গুনগুন করে গলার মধ্যে একটা শব্দ করে। মনে হয় যেন গান গাইছে কিম্বা কথা বলার চেষ্টা করছে। কায়া কখনও কোন স্পষ্ট কথা তার মুখে শোনেনি। এক একসময় একটা শব্দ ওর মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে পড়ত। তাতে করে মনে হতো যেন শব্দের এক একটা চাঙড় খসে পড়ছে — যার কোন অর্থ বা সঙ্কেত নেই। ভোলু ধাইমা'র ছেলে। ধাইমা তার মানে বাড়ির ভিতরে রয়েছেন। কায়া ভাবে, কে কাকে সঙ্গে করে এনেছে? ভোলু কি ধাইমাকে নিয়ে এসেছে? উঁ-হু, ভোলু এত চালাক-চতুর বা চটপটে নয়! ধাইমা-ই বরং তাকে সযত্নে নিজের আঁচলে বেঁধে সঙ্গে নিয়ে ঘোরেন, যাতে তাঁর বোবা

ছেলেকে কেউ উপহাস বা ত্যক্ত না করে।

ভোলুকে এসময় এখানে দেখে কায়ার ভালো লাগল। ওর নিঃসঙ্গ মনটা যেন একজন সঙ্গী চাইছিল। ভোলু কথা নাই বা বলতে পারুক। ওর চুপ করে বসে থাকাটাই কায়ার পক্ষে যথেষ্ট। গিনীর সঙ্গে বসে থেকে যেমন কায়ার সময় কাটত, ভোলুর সঙ্গেও তেমনি। ... ওঃ গিনীরে! কি যে হয়ে গেল ছোট্ট গিনীর —কেন এমন হলো? গিনীর কথা ভেবে তার চোখে জল এলো, তার থেঁতলানো শরীরটা মনে পড়তেই গা শিরশির করে উঠল। কায়া হঠাৎ আবেগের সঙ্গে ডেকে উঠল— "ভোলু, ও ভোলু!" ওর ডাকেই যেন সব কথার সার আছে। কিন্তু ভোলু কানে শোনে না। ওর চেয়ে গিনী কানে ভালো শুনত, কথাও বুঝত। ভোলু ওর ডাকে কি বুঝল কে জানে—শুধু ওর দিকে বার কয়েক তাকিয়ে গোঁ গোঁ করে কিছু বলার চেষ্টা করলে। সঙ্গে সঙ্গে তার মাথাও নড়তে লাগল। ভোলু এত মৃদুস্বরে গোঁ গোঁ করে যে, দূর থেকে ঠিক মনে হয় একটা শিশু "ওঁঙা ওঁঙা" করছে।

কায়া বাইরেই চুপচাপ বসে রইল। ভিতরে যাবার চাড়টাও যেন ওর ফুরিয়ে গেছে। বাড়ির ভিতরে অদ্ভুত চাপা স্বরে সকলে কথা কইছে। ফলে নির্জন রাতের রহস্যময়তাও যেন বেড়ে উঠেছে। সবাই পা টিপে টিপে এক ঘর থেকে আর এক ঘরে যাচ্ছে। কি হলো ব্যাপারটা? কায়া ভেবে কূলকিনারা পায় না। অন্যমনস্ক কায়া কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে চমকে উঠল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলে ছুটু! ওর ছোট্ট ছায়া বারান্দায় পড়েছে, তপ্ত নিঃশ্বাস কায়ার ঘাড়ে পড়ছে।

—"কি ব্যাপার রে ছুটু?"

—"শোনো ...", ও যেন ইতস্তত করে—"ঘরের মধ্যে আসবে?"

কায়া কিছুক্ষণ ছুটুর দিকে চেয়ে রইলে। বেচারা! ওর সঙ্গে তো ভালো করে কথা বলাই হয় না। দুজনে যেন দুই দ্বীপের বাসিন্দা, যে যার নিজের দুনিয়ায় মশগুল। শুধু রাতের বেলায় দুজনে একখাটে শোয়, তাও চুপচাপ। যেদিন থেকে লামা এ বাড়ির পর্ব মিটিয়ে চলে গেছে, সেই রাত থেকে ওরাও যেন বোবা হয়ে গেছে। শুধু রাতের অন্ধকারে শূন্যে তাকিয়ে বাতাসের দমকে লামার দরজার অবিরাম খোলা বন্ধ হবার শব্দ শোনে।

—"ধাইমা কখন এসেছে?"

—"আজই দুপুরে, তুমি তখম বাইরে।"

কায়া আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না। মায়ের কি হয়েছে জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা অবশ্য ওর করছিল। কিন্তু এক অজানা আশঙ্কায় সে কথা বলতে পারলে না। কায়া চুপচাপ নিজের ঘরে গেল। বাবুর ঘর বন্ধ, বরাবরই থাকে। কিন্তু মায়ের ঘরে কি হচ্ছে, তার আভাস ও বাইরে দাঁড়িয়েই পেলে। ভিতরে আঙ্গাটিতে আগুন জ্বলছে। তারই সামনে মিস্ জোসুয়া চেয়ারে বসে। মেঝেতে ধাই-মা, আর ঠিক তার

পিছনেই মায়ের বিছানা। মায়ের মুখ এখান থেকে দেখা যাচ্ছে না। মিস্ জোসুয়ার তাদের বাড়িতে আসা যেন এক অকল্পনীয় ঘটনা। ভদ্রমহিলা কি করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলেন? কায়ার হঠাৎ আর এক শীতের রাতের কথা মনে পড়ে গেল। যদিও সে অনেক আগেকার কথা। পুরানো ছবির মতো তারও আকার, রঙ সব এখন ঝাপসা হয়ে গেছে—কেবল মানুষগুলির কথাই মনে গেঁথে আছে।

সেদিন ফটো তোলা হয়েছিল। সে ফটোয় বারান্দায় বসা ভোলু, মায়ের ঘর, ধাইমা, আগুনের তাতের কাছে ঝুঁকে পড়া মিস্ জোসুয়ার উজ্জ্বল মুখ স—ব, সব মনে পড়ছে। সে রাতটা ছিল সুদীর্ঘ শীতের রাতের প্রথম রাত। মঙ্গতু সব কটা ঘরে প্রথম দিন আগুন জ্বেলে রেখেছিল। নিজের ঘরে এসে কায়া বাতি জ্বালালে। ঘরটা কেমন যেন খাঁ খাঁ করছে। শীতের ছুটি আরম্ভ হতেই পড়াশুনা জলাঞ্জলি দিয়ে বইখাতাগুলি পোঁটলা বেঁধে টেবিলের নীচে ঠেসে রেখে দিয়েছে। এই টেবিলের তলায় গিনীও রাজ্যের জিনিস বাইরে থেকে এনে জমা করত। টেবিলের সামনে দেওয়ালে একটা ছবি সাঁটা। শহরের ছবি। এটা ছুটুর কেরামতি। কোত্থেকে একটা গাইড বুক থেকে ছিঁড়ে এনে ছবিটা সে আঠা দিয়ে দেওয়ালে সেঁটে দিয়েছে।এই ছবিতে বরফে ঢাকা জাখু মন্দির, রিজের উপর দিয়ে গির্জার চূড়া, নীচে লোয়র বাজারের ছাত দেখা যায়। কিন্তু এই ছবির সবচেয়ে বড় বিউটি হলো একটা লাল রঙের বিন্দু, যেটা অযাচিতভাবে ছবির আওতায় এসে গিয়েছে। ছুটু এই লাল বিন্দুটিকে নিজের স্কুল বাড়ি বলে মনে করে। সামনে ব্যালকনির জানলা সব সময়ই খোলা থাকে আর বাতাসের দমকায় ছবিটি ফর্‌ফর্ করে নড়ে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ওটা এখনও দেওয়ালের সঙ্গে সেঁটে আছে—উড়ে বা ছিঁড়ে যায়নি। ছুটুর স্কুলও টিকে আছে। ... কিন্তু সেদিন হাওয়া ছিল না। বাড়ির চালায়ও কোনরকম বিজাতীয় শব্দ নেই। মিস্ জোসুয়ার বাগানে গাছগুলি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কোনও পাতা কোথাও নড়ছে না।

কায়া বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়লে।

—"মিস্ জোসুয়া কি করে উপরে উঠলেন রে?" কায়া ছুটুকে জিজ্ঞেস করলে।

—"মঙ্গতু ওঁর হাত ধরে উপরে এনেছে", ছুটু উত্তর দিলে। —"কায়া, তুমি সারাটা দিন কোথায় কাটালে বল তো? হেন জায়গা নেই যেখানে আমি তোমাকে খুঁজি নি।"

—"রেললাইনের ধারে ছিলাম।" কায়া ছুটুর দিকে তাকালে। ছুটু কায়ার খাটের কাছ ঘেঁসে দাঁড়িয়েছিল।

—"বোস্ না।" খাটের কাছে ছুটুর দাঁড়িয়ে থাকাটাও কায়ার অসহ্য বোধ হচ্ছিল। ছুটু বসলেই যেন সে স্বস্তি পায়।

বাইরে অক্টোবরের হিমেল হেমন্তের কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। গাছগুলো সাদা দেখাচ্ছে। গাছের পর গাছ সাদা হিমে ভরা। ঠিক ছায়ার মতো দেখাচ্ছে। ব্যালকনির বাইরে, দূরে পাহাড়ের উপর একটা পাতলা কুয়াশার চাদর ছড়িয়ে আছে। কায়ার মন আবার রেললাইনের ধারে চলে গেল। নিশ্চয়ই রেললাইনও কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। কুয়াশার কি অদ্ভুত ক্ষমতা! রেললাইনে পড়ে থাকা গিনীর জমাট বাঁধা রক্তও ঢেকে দেয়।

—"ছুটু, কখনও কারুকে মরতে দেখেছিস?"

আগুনের ওমে ছুটুর চোখ বুজে এসেছিল। মরতে দেখা? হ্যাঁ, সে তো ও কতবার দেখেছে। ঝোপে-ঝাড়ে জঙ্গলে মরা পাখি, কুকুরের কঙ্কাল মাটির উপর শুকনো খটখটে, মরা পিঁপড়ে, বর্ষায় নর্দমার জলে মরা ছুঁচো, কেঁচো—সবই। কিন্তু তা তো মরে যাওয়া বা মরার পরবর্তী অবস্থা। একে কি মৃত্যু বলে? না, শুধু প্রাণহীন একটা অবস্থা মাত্র। নির্জীব পদার্থে পরিবর্তিত হয়ে শুয়ে থাকা—জীবন মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা। হ্যাঁ, মিস্ জোসুয়াও অবশ্য কবরে যাবার কথা বলেছিলেন। উনি বলেছিলেন যে আর কয়েকবছর পরেই তিনি সঞ্জৌলীর সেমিট্রিতে শুয়ে থাকবেন। নীচে মাটি, উপরে পাথরের স্ল্যাব আর সেই পাথরের উপর তাঁর নাম খোদাই করা। ঠিক যেভাবে লেটার বক্সে তাঁর নাম লেখা আছে। কিন্তু এটাই কি মৃত্যু বা মরে যাওয়া? নাঃ, ছুটু ঠিক জানেনা। এ তো কেমন যেন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া হলো। যেমন এখানকার লোকেরা দিল্লী-সিমলা করে। না-না, মরা তো কখনও সে দেখেনি! ... "তুমি ঘুমাচ্ছ?" ... ছুটু দেখলে কায়া ঘুমে কাদা হয়ে গেছে। শরীরের সবকটা স্ক্রু যেন ঢিলা হয়ে কায়াকে একটা ভাঙা-চোরা কলের পুতুলের মতন দেখাচ্ছে। ধুলোয় ভর্তি জটভরা মাথার চুল দুদিকে ঝুলে পড়েছে।

হঠাৎ কায়া চোখ খুললে। তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কেমন যেন একটা ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া ভাব! .... ও কোথায়? ওঃ, এ তো তার নিজেরই ঘর! মা'ও নিজের ঘরে শুয়ে, মঙ্গতু রান্না ঘরে। রাত্রে বিশ্রামের এই মুহূর্তে যে যার নিজের নিরাপত্তার কোনটুকু বেছে নিয়েছে নিশ্চিন্তে ঘুমাবে বলে। অথচ ... অথচ ... কায়া কোন নিরাপত্তা খুঁজে পাচ্ছে না। ওর চারপাশে সবসময়ই কোন না কোন উপদ্রব হয়—যার ফলে ও কখনই শান্তি বা নিরাপত্তা বোধ করে না। লামার মতো সে কখনই দরজার শিকল তুলে থাকতে পারে না। শিকল তুলে একা ঘরে থাকার মতো তার বয়সই বা কোথায় হয়েছে? বয়স হবার আগেই বড় হবার প্রচেষ্টায় ঘরে শিকল তুলে দিতে গেলে হাতে চোট লাগতে পারে। বড় হবার শিকল এখনও তার নাগালের বাইরে!

—"কায়া, তুমি দেখেছ?"

কায়া বিছানার উপর উঠে বসে ছুটুর দিকে তাকায়—

—"কি দেখার কথা বলছিস রে?"

—"এই ... মরে যাওয়া ..."

—"নারে ছুটু, আমিও দেখিনি", কায়া শান্ত সমাহিত স্বরে বললে। "কিন্তু আমি মৃত্যুর পদধ্বনি শুনেছি ...."

—"কবে, কায়া?"

—"না, তেমন বিশেষ কোন ব্যাপার নয় ..." কায়ার স্বর বাতাসে হারিয়ে যায়। ও যেন সেদিনের সেই বিষণ্ণ দুপুরটাকে রেললাইনের ধারে দেখতে পায়।

—"আমি রেললাইনের ধারে দাঁড়িয়ে ... ঝোঁপটা জোরে নড়ে উঠল ... তার সঙ্গে ওর দেহটাও জোরে জোরে দুলছিল ... আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম। তারপরে হঠাৎ ... হঠাৎ মনে হলো কেউ ডাকছে ... প্রবল আগ্রহে ডেকে চলেছে।"

—"তুমি কি কারুকে ঝোপের আড়ালে দেখেছিলে, কায়া?"

—"নাঃ, কেউ ছিল না ... ডাকটা সুড়ঙ্গের ভিতর থেকে আসছিল। গিনী রেল লাইনের ধারে বসে ছিল।"

ব্যস ... এরপর আর 'পর' নেই—সব শেষ। কিন্তু শেষ হতো না যদি লামা গিনীকে ওইভাবে না ডাকত। আর গিনীটা, বোকার মতো দিন-দুনিয়া ভুলে রেললাইনের উপর বসে ছিল। লামার ডাকে সম্মোহিত হয়ে যেন সে এগিয়ে যেতে থাকল। সে ডাকের এমনই টান যে ও পিছিয়ে আসতে পারলে না, সামনেও দৌড়ে পালাতে পারলে না। না ... না ... গিনী তো মরেনি, গিনী মরতে পারে না .... গিনীকে হাতছানি দিয়ে মৃত্যুর পারে ডেকে নিয়ে গেছে। .... কিন্তু .... কিন্তু কে অমন করে গিনীকে ডাকলে? এ কি লামা না অন্য কোন অশরীরী জীব? কে সে? তাকে তো দেখা যায়নি?

কায়া আস্তে খাটের উপর থেকে নেমে এলো, ধীরে কপাট খুলল। খুবানী গাছের উপর দিয়ে চাঁদ উঁকি মারছে—কুয়াশায় চাঁদও ময়লা দেখাচ্ছে। কোয়ার্টারের পাঁচিলের গায়ে মেলে দেওয়া মঙ্গতুর জামাকাপড়ও চাঁদের ম্লান আলোয় নিষ্প্রভ হলদেটে দেখাচ্ছে। সমস্ত শহরটার উপর একটা হাল্কা আলো ছেয়ে ছিল।

কায়া বাইরে বেরিয়ে এলো। একটা অদ্ভুত দমবন্ধ করা অস্বস্তি বোধ করছে সে। বারান্দায় ভোলু ভূতের মতো পায়চারি করছে। একটা গোঙানীর মতো শব্দ ওর গলা বেয়ে উঠে আসছে। শব্দটা পাক খেয়ে খেয়ে বারান্দার বাইরে বেরিয়ে আঁধারের গহ্বরে ডুবে যাচ্ছে।

—"এই লোকটা কি সারারাত জেগে থাকে নাকি রে, দিদি? "ছুটু কখন কায়ার পিছন পিছন বাইরে বেরিয়ে এসেছে! ছুটুর ভোলুর সম্বন্ধে এক অহেতুক ভয়! সে কখনই একা একা তার কাছে আসে না। কায়া কোন উত্তর দিলে না।

যদিও এই সময় ছুটুর সঙ্গে তার ভালো লাগছে না, কিন্তু সে ছুটুকে ঘরে ফিরে যেতেও বললে না। বরঞ্চ বিরক্ত হলেও মনে মনে ভরসা পাচ্ছিল যে এই রাতদুপুরে বারান্দায় সে একা দাঁড়িয়ে নেই।

—"ওর কিছুতেই কিছু যায় আসে না!" কায়া এবার ছুটুর কথার জবাবে বললে। কায়ার মনের মধ্যে এক বাৎসল্যের ভাব জেগে উঠল, সে শুধুমাত্র ভোলুর প্রতি না এমনিই সে জানে না।

—"কায়া, তোমার ভয় করে না?"

—"কাকে? কিসের ভয়?"

—"তুমি কি করে যে ওর কাছে নির্ভয়ে যাও! বসো ... ও তোমাকে কিছু বলেনা?"

—"ও কাউকেই কিছু বলে না।"

—"কিন্তু ও সবসময়েই কি সব যেন বলে আপনমনে, বোঝা যায় না। তুমি কখনও শুনেছ?"

এই সময় ভোলু পিছন ফিরল। পুরো বারান্দায় চক্কর কেটে এবার সে পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল। ওর গলায় সেই গুনগুনানি শব্দ—ঠিক যেন হাওয়ার নাগরদোলায় সেটি ওঠানামা করছে। আশ্চর্য! ওর স্বরে কোন প্রতিধ্বনির গুঞ্জন নেই যেন স্বরের কোন আরোহ-অবরোহ ও ফেলে রাখতে চায় না সবই আত্মসাৎ করে ফেলে। হঠাৎ কায়া উপলব্ধি করলে—অশরীরী ডাকের হাতছানিও বোধকরি এমনি করেই গিনীকে রেললাইনের ধারে টেনে এনেছিল। যে ডাকের সম্মোহনী শক্তি আছে, অথচ সে ডাক আর কেউ শুনতে পায় না। ম্লান চাঁদের আলোয়, অন্ধকার বারান্দায় এই রহস্যময় পরিবেশে ভোলুও কি কাউকে তার বোবা স্বরে আহ্বান করছে? হঠাৎ ভোলু দিক বদলালে। যেখানে কায়া দাঁড়িয়ে, ভোলু সেদিক পানে আসতে লাগল। কায়া প্রস্তরবৎ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে রইলে। ভোলু তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। কায়া তার নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ ভোলু হাত বাড়িয়ে কায়ার কপাল স্পর্শ করলে। তার আঙুল যেন কথা বলে উঠল। তার হাতের আঙুল কায়ার গাল থেকে ভ্রূ, কপাল ও মাথার রুক্ষ চুলে বিলি কাটতে লাগল। কায়া জীবনে এই প্রথম বাবার পর অন্য পুরুষের স্পর্শ পেলে। তার দুচোখ ভরে জল এলো। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল। মনে হলো যেন ভোলুর আঙুলের স্পর্শে তার এত দিনের জমে থাকা অদৃশ্য ক্ষত জল হয়ে গড়িয়ে বেরুচ্ছে। এই জলও যেন তারই আঙুল নিঃসৃত। তার সমস্ত হতাশা, বেদনা, পীড়ার উপর যেন ঠাণ্ডা প্রলেপ পড়ল ...

হঠাৎ ভোলু একটা অস্ফুট শব্দ করে পিছিয়ে এলো। চোখের জলের বোধকরি একটি নিজস্ব ভাষা আছে। সে ভাষা ভোলুও পড়তে জানে। ও পিছন দিকে হাঁটতে

লাগল। ভোলু যেন হঠাৎ উপলব্ধি করলে যে সে ভুল পথে চলে এসেছিল—তার গলার গুনগুনানিও এতক্ষণ থেমে ছিল। সোজা পথ ধরতেই তার গলায় আবার সুর ফিরে এলো।

কায়া পিছন ফিরে দেখলে যে ছুটু কখন সরে পড়েছে। ও মুচকি হাসলে। ছুটুটা একটা এক নম্বরের ভীতু! ভোলুকে দেখলেই এমন ভয় পায় .... তাকে ভয় করার কি আছে? জগতে নানারকমের লোক আছে। তাদের মধ্যে অনেকেই মনুষ্যরূপী জন্তু। তাদের ভয় করার একটা অর্থ হয়। কিন্তু ভোলু? এ বেচারী তো এক নিরীহ প্রাণী। কথাও কইতে জানেনা। মানুষরূপী জানোয়ারের কথা লামাও প্রায়শই বলত। কিন্তু ভোলু এমন নয়। ছোটবেলা থেকে কায়া ওকে একই ভাবে দেখে আসছে। সে যেভাবে ছোটবেলায় গাছের গায়ে হাত বুলাতো, সেভাবে ভোলুকেও স্পর্শ করত। ভোলুর কোন তাপ-উত্তাপ ছিল না। ও নিজের নিঃসঙ্গ বোবা দুনিয়ায় পরম সুখে আছে।

কায়ার চোখের জল এতক্ষণে শুকিয়ে গেছে। এখন হঠাৎ ওর লজ্জা করল। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে সে বাইরের দিকে চাইলে। অন্ধকার এখন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সবকিছু স্বচ্ছ দেখাচ্ছে। নিজেকে এখন অনেক হালকা বোধ হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগেকার অস্বস্তিকর দমবন্ধ করা ভাব এখন আর নেই। দুঃখ, ক্লান্তি, হতাশা—সব যেন এক লহমায় মুছে গেছে। এখন বারান্দায় সে একা দাঁড়িয়ে। বাইরে পাহাড়ের গায়ে ফুটফুটে জ্যোৎস্না! পাতলা কুয়াশা! মিস জোসুয়ার বাগানের গাছের ডালপালাগুলো দুধসাদা চাঁদের আলোয় মনে হচ্ছে যেন হাত মেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। মায়ের রোগা ফর্সা হাতের কথা মনে পড়ল। কিছুদিন আগে মায়ের আহ্বানে তাঁর ঘরে গেলে লেপের বাইরে বেরিয়ে থাকা মায়ের হাতের দিকে তার চোখ পড়েছিল। সে হাত এত রোগা আর ফ্যাকাশে যে মনে হচ্ছিল হাতের চুড়ি এক্ষুনি নীচে খসে পড়বে। মায়ের হাতের চুড়ি কিন্তু কখনই নীচে গলে বেরিয়ে পড়েনি।

—"এখানে আয়", মা ডাকলেন। কায়া এগিয়ে যেতেই মা হাত ধরে তাকে শিয়রে বসালেন—"তুই সারাদিন কোথায় টো টো করে ঘুরে বেড়াস রে?"

—"কোথাও তো যাইনা", কায়া অবহেলার সুরে উত্তর দিলে। মা কিছু জিজ্ঞেস করলেই তার ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয়।

—"কায়া, সত্যি তুই রোজ রেললাইনের ধারে যাস?"

—"তোমায় কে বললে?"

মা কোন কথা না বলে একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে রইলেন। একি তাঁর সেই ছোট্ট কায়া? মাথায় ধুলো আর জটে ভরা রুক্ষ চুল। ফ্যাকাশে চেহারা। বড় বড় চোখ দুটি কোটরে বসা। ফ্যাকাশে সাদা ঠোঁটের উপর মরা চামড়ার পরত। কায়াকে নিয়ে তাঁর উদ্বেগের সীমা নেই।

—"কায়া!" মা কথা বললেন। "তোর একা একা খারাপ লাগে, তাই নারে? বাবু এখানে নেই, লামা চলে গিয়েছে, আমি বিছানায় পড়ে ..."

মার ক্লান্ত স্বর বুজে এলো।

—"তুমি তো শিগগিরই ভালো হয়ে উঠবে, তাই না?" —কায়া তাড়াতাড়ি বলল যাতে করে মা আর কোন প্রশ্ন না করেন।

—"আমার অসুখ করেনি কায়া!"

কায়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মার দিকে তাকালে। মায়ের দেহ দিন দিন বড় হয়ে যাচ্ছে। এটা অসুখ নয়তো আর কি? তবুও ওর ভালো লাগল যে মা এতদিনে তাঁর নিজের সম্বন্ধে কায়ার সঙ্গে কথা বললেন।

—"ও, হ্যাঁ, বলতে ভুলে গিয়েছিলুম। তোমার পিসি বোধহয় আগামী তিনচার দিনের মধ্যেই এসে পড়বেন। কয়েকদিন আগে চিঠি দিয়েছিলেন।" —মা মিষ্টি করে হাসলেন। কায়ার মনটা জুড়িয়ে গেল। মা তাঁর কথার জের টানেন—"এবার পিসি এলে তিনি যখন তোমার কাকার বাড়ি যাবেন, তুমিও ওর সঙ্গে গিয়ে দিনকয়েক থেকে এসো। এখানে একা একা, কী করেই বা সময় কাটে!" ... কায়ার মনটা নেচে উঠল ... উত্তেজনায় জোরে জোরে নিঃশ্বাস পড়তে লাগল। কাকার বাড়ি! কি মজা!

কাকার বাড়ি কায়ার বিশেষ যাওয়া হতো না। বছরে এক-আধবার হয়তো কাকার বাড়ি যেত। কিন্তু গিয়ে যে কি ভালোই না লাগত! ফিরে আসার পরেও কাকার বাড়ির গল্প যেন আর শেষ হতো না। ... ওখানে বীরুর একটা আলাদা ঘর আছে। কাকার কি বিরাট লাইব্রেরি! কাকার বাড়ি যেন ওদের ভাইবোনের কাছে এক স্বপ্নপুরী—শহর থেকে অ-নে-ক উপরে, মেঘের মধ্যে তার অবস্থান যেখানে যখন-তখন যাওয়া যায়না। শুধু জল্পনা-কল্পনাই সার! সেই কাকার বাড়ি যাবে কায়া, থাকবে বেশ কিছুদিন! এ আনন্দ রাখার জায়গা নেই।

—"পিসিও যাবেন তো?" কায়া উত্তেজনা চেপে জিজ্ঞেস করলে।

—"পিসি শুধু একদিনের জন্যে যাবেন। তোমার যতদিন ইচ্ছে করে, থেকো। বাবু দিল্লী থেকে আসার পথে তোমায় সঙ্গে করে নিয়ে আসবেন।"

—"আর তুমি?"

—"আমি ... কি?" মা স্মিত হেসে তার দিকে চাইলেন।

— "তুমি ... তুমি একলা থাকবে?"

মা একটু অস্বস্তি বোধ করলেন। তারপর ইতস্তত করে হেসে বললেন—

—"ততদিনে আমি ভালো হয়ে উঠব। আর মঙ্গতু তো রইলই। এছাড়া পিসিও এখানে বেশ কিছুদিন থাকবেন এবার। ভয় নেইরে, আমি একা থাকব না।" —মা কিছুক্ষণ কায়ার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। নিজের মেয়েকে যেন তিনি এক একসময় চিনতে পারেন না। মনে হয় মেয়েটা যেন তাঁর পেটের সন্তান নয়,

অন্য বাড়ির মেয়ে, কিছুদিন এখানে থাকতে এসেছে। ওর প্রতি যেন তাঁর কিছুই করণীয় নেই, ও এ বাড়ির অতিথি। দুনিয়ায় এমন অনেক লোক আছে যারা আপন হয়েও পরই থেকে যায়। কায়াও সেই দলের। ... একটা বিষণ্ণ ব্যথায় মা'র মন ভরে উঠল। পরম মমতায় তিনি কায়ার চুলে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন—"শোনো, তোমার যদি ইচ্ছে না করে, তাহলে ওখানে থেকো না।"

কায়া অধৈর্য হয়ে মাথা নেড়ে বললে—"না, না, আমি যাব, কিন্তু ...।" একটু দ্বিধাগ্রস্ত স্বরে বললে, "বাবু এসে আমায় নিয়ে যাবেন তো?"

—"আমি কি তোকে এমনি বানিয়ে বলছিরে?" মা ওর দিকে তাকালেন।

হঠাৎ অভিমানে কায়ার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। মা-বাবু হয়তো তাকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তার কাছ থেকে নিষ্কৃতি পেতে চান। সেইজন্যেই কাকার বাড়ি পাঠানোয় মায়ের এত আগ্রহ। ... মনটা বিদ্রোহ করে উঠল। মনে হলো মাকে না করে দেয়—আমি কোথাও যাবনা, এখানে শুধু তোমার কাছটিতে থাকব। সঙ্গে সঙ্গে আবার তার চোখের উপর শীতের বিতিকিচ্ছিরি দিনগুলো ভেসে উঠল। ... বাতাসে ক্যাঁচকোঁচ করে লামার ঘরের দরজার খোলা ও বন্ধ হওয়া, নিস্তব্ধ জনহীন প্রান্তর, রেললাইন, তার উপর গিনীর তালগোল পাকানো দেহটা ... উঃ কি ভয়ঙ্কর! এ সময় এখানে কেউ থাকেনা, আসেনা—নিরবচ্ছিন্ন একঘেয়ে দিন কাটানো! শীতের শেষ বেলায় যেমন গাছের থেকে শুকনো ডালপালা ও পাতা খসে খসে পড়ে, তেমনি যেন এক একটা দিন খসে পড়ে—কেউ সেদিকে তাকিয়েও দেখেনা, কায়াও না—ঘটনাবিহীন সঙ্গীবিহীন, নীরস একঘেয়ে জীবন! এক একসময় নিস্তব্ধ দুপুরে বা নির্জন রাত্রে স্বপ্নের মতো এক একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে। কখনও তা ভয় দেখায়, কখনও মনে হয় অতীত থেকে বর্তমানে আসার দুরূহ প্রচেষ্টায় তা গুমরে গুমরে ফিরছে। মনে হয় সে বুঝি কবেকার, কোন গত জন্মের ঘটনা। লামার আসা, বাবুর দিল্লী ফিরে যাওয়া, পিসির সঙ্গে তার ফক্সল্যান্ডে যাওয়া। প্যান্ডোরার বাক্স থেকে এক এক করে সেগুলিকে সে স্মৃতির দরজায় এনে জড়ো করে। কিন্তু পুরানো দিনের সব স্মৃতি তো আর সুখের হয় না! এক এক সময় স্মৃতি রোমন্থনে সে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছয় যেখানে সময়ের হিসাব থাকে না। বোধকরি সেখানে তার নিজের সত্তাও হারিয়ে যায়। মনে হয় দিনগুলি যেন শুধু একটা অজানা রহস্যময় জায়গায় থমকে থেমে আছে। সেখানে চাপ চাপ অন্ধকার, আলো নেই। শীতের শেষে পাহাড়ে যেমন আলোছায়ার খেলা চলে, তেমনি সেখানেও আলোছায়ার খেলা। এখানে আলোও যেন ছায়ারই একটি অঙ্গ। তখন মনটা ছটফট করে বর্তমানে ফিরে আসার জন্য, যে বর্তমানে সে নিজে আছে, ছুটু রয়েছে, মঙ্গতু তার রান্নাঘর আগলে আছে আর এইসবের মধ্যে সে বাবুর ফেরার প্রতীক্ষা করে আছে।

মা'র সঙ্গে সেই রাতের খোলামেলা আলোচনার পর বেচারী আর ওঘরে ঢুকতেও পারলে না। মায়ের ঘর চতুর্দিক থেকে এখন একটা দুর্গ বলে মনে হয়। তাঁর ঘরে এখন রাতদিন আলো জ্বলে, মঙ্গতু নিজের কোয়ার্টারে ফিরে যায় না। সব কাজকর্ম শেষ করে রান্নাঘরেই সে এখন রাত্রে শোয়। মা'র ঘরে দিনরাত ধাইমা থাকেন। তাঁকে এখন ঠিক হাসপাতালের বুড়ো অভিজ্ঞ নার্স বলে মনে হয়। চারদিকেই কেমন যেন একটা হাসপাতাল হাসপাতাল গন্ধ। সবসময়েই সেখানে গরম জলের গামলা, সাদা ব্যান্ডেজ ও অন্যান্য আনুষঙ্গিকের আনাগোনা। ওরা দুই ভাইবোনে বলতে গেলে নিজের ঘরেই বন্দী। কে এলো, কে গেল ওরা জানতেও পারেনা, দেখতেও পায় না। শুধু পায়ের শব্দ শুনে শুনে ওদের মুখস্থ হয়ে গেছে যে এটা মঙ্গতুর পায়ের শব্দ, সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে যাচ্ছে। কাঠের সিঁড়ি নড়ে উঠতেই খট্ খট্ শব্দ হয়—ওই মিস্ জোসুয়া উপরে উঠছেন! গোনাগুনতি কয়েকটা শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ হয়না এত বড় বাড়িতে।

হঠাৎ একদিন অন্যরকমের অচেনা শব্দ শোনা গেল। দুজনে দৌড়ে বারান্দায় এলো। কায়া তো তাজ্জব। পিসিমা রিক্সা থেকে নামছেন! যে কিপ্টে পিসিমা রিক্সা করতে বললেই তার চোদ্দপুরুষ তুলে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগাতেন, সেই পিসিমাই রিক্সা থেকে হুড়মুড় করে নেমে এলেন। সেই এক বেশ, এক রূপ। কালো লম্বা লম্বা ঠ্যাঙ ফেলে আলুথালু বেশে, উড়ু উড়ু চেহারার পিসিমাকে দেখে মনে হয় যেন তিনি সোজা মীরাট থেকে রিক্সায় চেপেই পাহাড় ডিঙিয়ে এখানে এসেছেন। হাতে তাঁর সেই চিরপরিচিত ছোট্ট পুঁটুলিটি, তাঁর সর্বত্র গমনাগমনের চিরসঙ্গী। কাকার বাড়িও পুঁটুলিটা বেশ কয়েকবার বেড়িয়ে এসেছে। সিঁড়ি বেয়ে থপ থপ করে চড়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বিস্ফারিত চোখে কায়াকে জিজ্ঞেস করলেন—"তোর মা কেমন আছে?"

কিন্তু ভদ্রমহিলার কথার জবাব শোনারও তর সইল না। সোজা মা'র ঘরে গিয়ে সেঁধুলেন।

—"এ মা, লামা আসেনি।" ছুট্টু নিরাশ হলো। কায়াও মনে মনে ঠিক এটাই ভাবছিল। মনে মনে আশা করছিল, পিসির পিছন পিছন, কুলিদের ভিড় ঠেলে লামা হঠাৎ উঁকি মারবে তার পেটেন্ট চেহারায়—পেটে উড়নি বাঁধা, চওড়া কপালে চুলের কুচি উড়ছে, দৃঢ় কাঁধ। কিন্তু নাঃ, শুধু পিসিই এসেছেন। ওরা দুই ভাইবোন পিসির উপরে প্রস্থানের পরেও অনেকক্ষণ হাঁ করে রোদে উজ্জ্বল বাজারের দিকে চেয়ে রইল।

লামার চলে যাওয়াটা এখনও ওরা কেউই মন থেকে মেনে নিতে পারেন নি। শীতের রাতে যখন ওরা আগুন পোয়ায়, মনে হয় এই বুঝি লামা এসে উদয় হবে। লামা যখন ছিল, তখন সে চুপচাপ পা টিপে টিপে পিছন থেকে এসে ঝপ করে

আগুনের কাছে বসে পড়ত। ওর সন্তর্পণ অথচ ক্ষিপ্র চলন দেখে ওকে একটি বনবেড়াল বলে মনে হতো। অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি ছিল তার। কারুকে কোন ভ্রূক্ষেপ করত না, কিন্তু সকলকে কাছে টানত। ওরা লামার ঘরের দিকে যেন তারই আশায় চেয়ে থাকে। লামার ঘর অন্ধকার! একটু খস্ খস্ করে শব্দ হলেই কায়া চমকে ওঠে। ছুটুও কাছ ঘেঁসে বসে। ব্যস! এখন আর কোনও শব্দ নেই। পাঁচিলের উপর শুধু মেলে দেওয়া কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ। অনেক দিন পর আবার জোরে বাতাস বইছে।

—"এই, কিছু শুনতে পাচ্ছ?" ছুটু বেচারা ভয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে।

—"ধ্যাৎ, কিস্যু না! দেখছিস না, বাতাসে কাপড় উড়ছে? তারই খস্ খস্ শব্দ", কায়া বললে।

—"না, না! কায়া, মা'র ঘর থেকে শব্দ আসছে।"

শব্দ? কোথায় শব্দ? কেমন শব্দ? ... এ বেচারীরা কিছুই জানতে পায়না। বাড়ির এক কোণে মায়ের ঘর, অপর দিকে কোণের ঘরে এরা থাকে। এক এক সময়ে বারান্দায় ধাইমাকে এক ঝলক দেখা যায়। তিনি শশব্যস্তে রান্নাঘর ও মায়ের ঘরে যাতায়াত করেন, মঙ্গতুকে নানা নির্দেশ দেন। সন্ধ্যাবেলায়ও মায়ের ঘর থেকে কেউ বেরলে না। ভিতরে কিছু একটা ঘটছে। কিন্তু এমন কি ঘটতে পারে যাতে করে এই দু'জনে একেবারেই অপাঙক্তেয় হয়ে পড়ে আছে!

—"এই কায়া, মা কি অজ্ঞান হয়ে গেছেন নাকি রে?"

—"খামোখা অজ্ঞান হতে যাবেন কেন?" —কায়া বিরক্তি সহকারে ছুটুর দিকে তাকালে। বেচারা শীতে ও ভয়ে দরজার গায়ে জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে। কায়া উঠে গিয়ে ভাইয়ের হাত ধরে বিছানার কাছে টেনে এনে বললে—"এবার চটপট ঘুমিয়ে পড়, না হলে আমি কিন্তু আবার ভোলুর কাছে চলে যাব।"

ভোলু এখন নীচে মঙ্গতুর কোয়ার্টারেই থাকে। ধাইমা রাত্রে এ বাড়িতে থাকলেও মঙ্গতুর ওখানেই শোয়। ছুটু বাধ্য ছেলের মতো চুপচাপ শুয়ে পড়ে, পাছে দিদি তাকে ছেড়ে নীচে চলে যায়! আগে মাঝেমধ্যে কয়েকবার হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে কায়াকে ঘরে না দেখতে পেয়ে ও ভয় পেয়ে এক ছুটে মায়ের ঘরে চলে যেত। কিন্তু এখন তো আর সেটি হবার জো নেই!

সিঁড়ির নীচে মঙ্গতুর হাঁক শোনা গেল—"কায়া, এই কায়া।"

কায়া ধড়মড় করে উঠে বসলে। বাইরে বেরিয়ে এসে দেখলে মঙ্গতু মিস্ জোসুয়ার হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

—"কায়া, তুমি মেমসাহেবকে নীচে পৌঁছিয়ে দিতে পারবে? আমার রান্নাঘরে বিস্তর কাজ আছে।"

মিস্ জোসুয়া ছড়ি দিয়ে সিঁড়ির রাস্তা হাতড়াচ্ছিলেন। কায়া সন্তর্পণে তাঁর

হাত ধরলে। ভদ্রমহিলা একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে তার দিকে তাকালেন। —"তুমি আগে নামো। আঃ, এত জোরে হাত ধরে না। আমার হাত লোহার তৈরি নয় বাছা।"

দুজনে সাবধানে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগল। প্রথমে কায়া, পরে মিস্ জোসুয়া। সিঁড়িতে যে কতদিন ঝাঁট পড়েনি — রাজ্যের ধুলো। একটু হাওয়া দিলেই ধুলো ওড়ে আর কায়ার চোখ করকর করে। মিস্ জোসুয়া একবার সিঁড়ির দেওয়ালে হেলান দিয়ে জিরিয়ে নিলেন। দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তিনি অনর্গল কথা বলে যান—

—"তোমার ফাদার আসবেন না?"

—"না মিস্ জোসুয়া, ডিসেম্বরের আগে তাঁর আসার কোন সম্ভাবনা নেই।"

—"আশ্চর্য! এই অবস্থায়, এই বিপদের সময় তো তাঁর আসা উচিৎ ছিল।" মিস্ জোসুয়ার স্বরে রাগ ও বিরক্তি। এই রাগের ঝোঁকে তিনি নিজে নিজেই গটগট করে তিন চারটে সিঁড়ি নেমে গেলেন।

—"তাঁর কাছে খবর গেছে?" —সিঁড়ির শেষ ধাপে নেমে তিনি প্রশ্ন কটি ছুঁড়ে দিলেন।

—"কিসের খবর মিস্ জোসুয়া?" —কায়া যুগপৎ চমকে ও ঘাবড়ে যায়।

মিস্ জোসুয়া এবার অস্থির চোখে তার দিকে তাকালেন—কিরে, মেয়েটা ন্যাকা নাকি? এ যেন আকাশ থেকে পড়লে! সিঁড়ি দিয়ে নেমে মিস্ জোসুয়া কায়ার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিলেন।

—"থাক্, এবার আমি নিজে নিজে যেতে পারবো—"তাঁর স্বরে এখনও রাগ ও বিরক্তি। কায়া বুঝলে ওঁর রাগ যায়নি। সে চুপচাপ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এগুতে থাকে। চাঁদের আলো থাকলেও গাছের নীচে অন্ধকার। সে জানে মিস্ জোসুয়ার কম্মো নয় একা যাওয়া। বাতাস এত জোরে বইছে যে চোখ আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। ওরা কেয়ারী করা বাগান ঘেঁসে হাঁটতে থাকে। নীচে এনানডেলের ময়দান, উপরে জাখু পাহাড়। মিস্ জোসুয়ার বাগান থেকে দুটোই খুব ভালো করে দেখা যায়। বাইরে টাঙানো লেটার বক্সের পাল্লা দুটো হাওয়ায় খরখর শব্দ তুলেছে।

নিজের বাড়ির দরজার কাছে এসে তিনি কায়াকে আহ্বান করলেন—"ভিতরে এসো না!" এতক্ষণে তাঁর স্বর থেকে রাগ ও বিরক্তি দূর হয়েছে। নিজের রাগ ও বিরক্তিতে লজ্জিত মিস্ জোসুয়া যেন লজ্জা ঢাকতে তাকে আমন্ত্রণ জানান— "আমি আমার জন্য চা বানাচ্ছি। তোমার জন্য ওভালটিন বানাই?"

কায়ার একবার ইচ্ছে করল দাঁড়িয়ে যায়। যদিও সে ওভালটিন ভালোবাসে না, তবে তার গন্ধটা মন্দ লাগে না। তারপরেই মনে পড়ল—না, ছুটু একা আছে ভয় পাবে।

—"মিস্ জোসুয়া, আমি অন্য আর একদিন এসে আপনার ওভালটিন খেয়ে যাব।"

—"তুমি নাকি ফক্সল্যান্ডে যাচ্ছ?"

কায়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

—"কাকাকে বোলো যে আমি এখনও বেঁচে আছি।" একটু বিষণ্ণ হেসে তিনি অন্দরের দিকে পা বাড়ালেন। চাঁদনী রাতের নির্জন পরিবেশে মিস্ জোসুয়ার হাসিতে কায়ার হঠাৎ ভয় করে উঠল। কায়া অন্ধকারে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলে যতক্ষণ না মিস্ জোসুয়া বাড়ির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

মাঝরাতে কায়ার হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। অন্ধকার হলেও চাঁদের উজ্জ্বল আলোয় ঘরের সব কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ব্যালকনির দিক থেকে আসা জ্যোৎস্নায় ছুটুর ঘুমন্ত মুখ, টেবিলের উপর সাঁটা ছবি, বই-এর পোঁটলা—সব দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে।

তার মনে হলো, নিশ্চয়ই একটা কিছু হচ্ছে বা হতে চলেছে। না হলে খামোখা তারই বা ঘুম ভাঙবে কেন?

কায়া খাট থেকে নেমে দরজা খুলে বাইরে দেখতে লাগল। গাছের ছায়া বাড়ির দেওয়ালের উপর লম্বমান। গাছের ছায়া থেকে থেকে নড়ছিল। চাঁদের আলোয় বারান্দা ভেসে যাচ্ছে। হলের কাছে নিস্তব্ধ। শুধু মায়ের ঘর থেকে চাপা স্বরে কথা শোনা যাচ্ছে। আশ্চর্য, এত রাত হয়ে গেল, তবুও রান্নাঘরের আলো জ্বলে যে! কায়া প্রথমে বারান্দায় অতি সন্তর্পণে পা রাখলে। কিছুক্ষণ সেখানে সে দাঁড়িয়ে রইলে। যদি কেউ তাকে এখানে দেখে ফেলে, তাহলে আবার সেই একঘেয়ে ঘুমন্ত ঘরের নির্জীব বিছানায় ফিরে যেতে হবে। কেউ দেখে ফেললে তো লুকোবার জায়গাও নেই—সর্বত্র চাঁদের আলো। ব্যাটা চাঁদও যেন শত্রু হয়ে উঠেছে।

ও' আবার ঘরে ফিরে এলো। ঘরে ঢুকে কলঘরের দরজা খুলে তার ভিতর দিয়ে পিছনের সরু ফালি প্যাসেজে চলে এলো। এই গোল সরু প্যাসেজটা পুরো বাড়িটাকে একটা বলয়ের মধ্যে ঘিরে রেখেছে। ছুটির সময়ে মায়ের চোখ এড়িয়ে মঙ্গতুর কোয়ার্টারে যেতে হলে এই প্যাসেজ দিয়েই সে লাফিয়ে পালাত। এই প্যাসেজের সঙ্গে বাগানের দিকে লাগোয়া সিঁড়ি রয়েছে—যেখানে কেউ যায়না, মিস্ জোসুয়াও নয়। এই জায়গায় বাড়ির যত আবর্জনা ফেলা হয়। বাড়ি আর মঙ্গতুর কোয়ার্টারের মধ্যে খুবানীর একটা বিশাল গাছ আছে। তার কচিপাতায় ভরা ডাল প্যাসেজ অব্দি এগিয়ে এসেছে। মোটা মোটা ডালপালাগুলি কোয়ার্টারের ছাতেই কায়েম হয়ে আছে। এক এক সময় রাতে ঘুম না এলে বাতাসের দোলায় ডালপালাগুলি নড়তে দেখে, তার মর্মরধ্বনি কান পেতে শোনে।

কায়া বেশ কিছুক্ষণ কলঘরের পিছনে প্যাসেজের সামনে দাঁড়িয়ে রইলে। যেতে সাহস হচ্ছে না। শীত যদিও খুব একটা বেশি নেই, কিন্তু এত দমকা হাওয়া যে মাথার স্নায়ু যেন ঝিমঝিম করে ওঠে। সে এই খোলা প্যাসেজে গত বছর উলঙ্গ

হয়ে মা কালীর কাছে প্রার্থনা করত। সে শুনেছিল এইভাবেই মা কালীর সাধনা করা হয়। কথাটা ভাবলে এখনও তার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ও হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে যেতে লাগল। বাব্বা! বুকটা এখনও ধড়ফড় করছে। মনে হচ্ছে এর শব্দে সকলে বেরিয়ে আসবে আর ও ধরা পড়ে এন্তার বকুনি খাবে। ঘাবড়ে গিয়ে কখনও তার পা ফিনাইলের বোতলে, কখনও বা বালতির সঙ্গে ধাক্কা খায়। ঝনঝন করে শব্দ হয়। কায়া সিঁটিয়ে যায়। আবার একটু পরেই কাঠবেড়ালীর মতো ক্ষিপ্র গতিতে অথচ সন্তর্পণে এগোতে থাকে। হলের পিছনে প্যাসেজে আসতেই ঘরের জানলার কাছে তার চোখ আটকে গেল। ছুটুর শতরঞ্চির নীল দরিয়া হাওয়ায় ফুলে ফুলে উঠছে। চাঁদের আলোয় আর আলমারী, চেয়ার-টেবিলের মাঝে বাস্তবিকই সেটাকে একটা ছোট্ট ফুলে ওঠা নদী বলেই মনে হচ্ছে। ও জানলায় হাত রেখে সরতে যাবে, হঠাৎ একটা চিল চিৎকারে হতবুদ্ধি হয়ে গেল। জানালার কাছে যেন ওর হাতটা আঠা দিয়ে কেউ সেঁটে দিল। কে এই চিৎকার করলে? চিৎকার নয়, একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ যেন ছুরির ফলার মতো অন্ধকারকে চিরে বেরিয়ে গেল। কিন্তু সে নিমেষের জন্যে মাত্র। আবার সব শান্ত, শুধু হাওয়ার খরখর! কিন্তু অমন করে কে চেঁচালে? মায়ের গলার স্বর বলে মনে হলো না? কিন্তু তিনি চেঁচাবেন কেন? না, না। হয়তো এটা কোন মানুষেরই গলা নয়। এবার ও আর বিলম্ব না করে সরে গিয়ে মায়ের জানলার কাছে উবু হয়ে বসলে। জানলায় জোরে ধাক্কা দিয়েও কোন ফল হলো না। ভিতর থেকে জানলা বন্ধ। কাচের উপর নিজের হাতের চেটো ও আঙুল দিয়ে জোরে চাপ দিলে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। জানলার কাচ এক চিলতেও নড়ল না। লাভের মধ্যে আঙুলের ডগা শীতে জমে সাদা ও চাপ পড়ে লাল হয়ে গেল। —নাঃ কোন লাভ নেই, এতে কাজ হবেনা। কিন্তু কে চেঁচালো? কায়া আবারও ভাবলে। এবারে ও মায়ের ঘরে উঁকি দিলে। এখানে পর্দায় একটু ফাঁক রয়েছে, ভিতর থেকে এক চিলতে আলো ঠিকরে আসছে। আলোর চিলতেও ঠিক নয়, আলোর একটা আবছা আভাস মাত্র দেখা যাচ্ছে। ওর নিঃশ্বাসের স্পর্শে ঠাণ্ডা শার্সিটা ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে—আর ওই আলোটুকুও ঢেকে যাচ্ছে। কায়া আঙুলের ডগায় থুতু দিয়ে ঝাপসা হয়ে যাওয়া শার্সির কাচটা পরিষ্কার করে আবার ক্ষীণ আলোর ভিতরে দেখার চেষ্টা করলে।

আঙ্গাটির সামনে তিনটে খালি চেয়ার। আগুনের তাতে পিছনের ওয়ালপেপার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। পর্দার পিছনে খাটে মা শুয়ে, তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না— তাঁর নগ্ন পা দুটি কেবল দেখা যাচ্ছে। মাকে ও কবে থেকে এভাবে শোওয়া অবস্থায় দেখছে! ব্যালকনিতে খেলতে খেলতে অনেকবার ঐ ঘরের সামনে সে এসেছে। ... এ যেন তাঁর নিজের জগৎ। ঘরের জিনিসপত্রের মাঝে—ফর্সা, ফ্যাকাশে মা যেন অনন্ত কাল ধরে এভাবেই শুয়ে আছেন, চিরকাল এভাবেই

থাকবেন। মা'র ঘরটা যেন চুম্বকে ঘেরা। আর মা তার মধ্যমণি। এই চৌম্বকশক্তির টানে মধ্যমণিকে ঘিরে কায়া এর চারপাশে সময়ে-অসময়ে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু মায়ের এই অবস্থা দেখতে তো সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ... কাটা গাছের মতো তাঁর নিথর দেহ, নীচে দুটি উলঙ্গ জানু—হঠাৎ তার চোখে যেন মায়ের পুরানো কমনীয় ছবিটা বদলে গিয়ে কদর্য হয়ে উঠল। কায়া কোনদিনও ভাবেনি মাকে এই অবস্থায় দেখবে। ... কায়াকে কেউ দেখতে পেলোনা, কেউ আটকালে না, ফিরে যেতেও বললে না বা হাত ধরে পিছনে টানলে না। আজ কেউ বাধা দিতে আসছে না। কায়া আশ্চর্য হবার সাথে সাথে যেন একটু বিষণ্ণ বোধ করলে। খোলা আকাশের নীচে একা ও' দাঁড়িয়ে, খোলা সরু প্যাসেজে ফাটল ভেদ করে অকৃপণ হাওয়া আসছে, সে হাওয়ায় ওর সর্বশরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। তবুও সে সরে যেতে পারছেনা। কোন এক অদৃশ্য শক্তি দুর্বার আকর্ষণে তাকে যেন বেঁধে রেখেছে মায়ের ঘরের এই জানলার কাছটিতে। কায়া এবার মরিয়া হয়ে খুব জোর দিয়ে জানলার একটা পাট চেপে ধরলে। জানলার ধারে একটা ছায়া দেখা দিল। কে এলো? ও হাত দিয়ে শার্সির কাচটা আবার মুছলে। —এ তো ধাইমা! তিনি গরম জলের গামলাটা তুলে বিছানার কাছে এনে রাখলেন। পিসি একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। ধাইমাকে বোধকরি কোন নির্দেশ দিলেন। মায়ের শরীর থেকে থেকে ব্যথায় কুঁকড়ে উঠছে। বিছানায় তিনি ছটফট করছেন। তাঁর ছটফটানি ঠিক যেন পাথরের তলায় পিষ্ট হয়ে ছটফট করা একটি পোকার মতো। কিন্তু কীটের সে যন্ত্রণা মৃত্যু যন্ত্রণা। মায়ের যন্ত্রণা তা নয়। ব্যথায় মা কুঁকড়ে গিয়ে যেন অন্ধকার খাদে পথ হারিয়ে ছটফট করে বেড়াচ্ছিলেন। ধাইমা তাঁকে বাঁচালেন। ধাইমার অভিজ্ঞ হাতের আঙুল মায়ের কুঁকড়ে যাওয়া জানুর মধ্যবর্তী অরণ্যে কী যেন একটা খুঁজলো; তারপরই ম্যাজিসিয়ানের মতো কিছু একটা টেনে বের করে ... না-না-না ... উঃ, কী অসহ্য! কায়া মনে মনে চেঁচিয়ে উঠলে। অব্যক্ত বেদনায় সে শার্সির কাচ নখ দিয়ে আঁচড়াতে লাগলে। জানলার কাঠের ফ্রেমের উপর নিজের শুকনো, ফাটা ঠোঁট ঘসতে লাগলে। কালো পালিশের তিক্ত-কষায় স্বাদ ওর জিভে এসে ঠেকল। ... সে এবার নীচে নামতে লাগল। ব্যালকনি জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে। সেই আলোর সঙ্গে ঘরের আলোর ফালি এসে মিশেছে। সব মিলিয়ে একটি রোমাঞ্চকর পরিবেশ। হঠাৎ কায়ার মনে হলো, মা'তো ভিতরে নেই, মা'তো এই গাছতলায়, বাতাসে ভরা উন্মুক্ত খোলা আকাশের নীচে! এ ছবি কি আজকের? মনে হয় যেন অনেক কাল আগে বুঝি বা মা এমনই ছিলেন! হয়তো সে তখন খুবই ছোট ছিল ... সে স্মৃতি তখন সময়ের বাহুপাশে বাঁধা পড়েনি ... তার কোন ইতিহাস নেই ... বোধ করি সেটাই পূর্বজন্ম ... সেখানে মা গাছের নীচে শুয়েছিলেন, খুবানী গাছের পাতা ঝরে ঝরে পড়েছিল মায়ের মাথায় ... রোদের

উষ্ণ তাপ ... আর ... আর—সে যেন অ ... নে ... ক দূর থেকে ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে, দৌড়তে দৌড়তে এসেছিল তার মায়ের কোলের কাছটিতে ... কোনও এক অজানা আশঙ্কায় ... ভয়ে মায়ের বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়েছিল।

পাঁচ

কায়া যে কতক্ষণ ওই সরু বারান্দায় কুঁকড়ে-মুকড়ে বসেছিল সে খেয়ালই তার ছিল না। দিন-দুনিয়া ভুলে সে বসেছিল। ঘরের মধ্যে অবরুদ্ধ জীবনের সীমার বাইরে, মুক্ত আকাশের নীচে, খুবানী গাছের শিরশিরে হাওয়ায় খাঁ খাঁ করা অলিন্দে, ঘরের বিছানা ও নিদ্রা থেকে মুক্ত কায়া তার এই স্বাধীনতাটুকু তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছিল। এ মুক্তির স্বাদই আলাদা। এখানে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায়।

মায়ের ঘরে এখন সব চুপচাপ। সে মনে মনে ঠিক করলে আর মিনিট পাঁচ-দশ এখানে কাটিয়ে, ঘরের বাতি বন্ধ হলেই, অন্ধকারে পা টিপেটিপে চুপিচুপি গিয়ে নিজের বিছানায় শুয়ে পড়বে। কেউ জানতেও পারবেনা যে সে রাতে না ঘুমিয়ে জানলা ধরে খোলা ঝুল বারান্দায় বসে বসে সব কিছু দেখেছে।

আবার ... আবার সেই তীক্ষ্ণ চিৎকার। পাহাড়ি নির্জনতা যেন ভেঙে খান খান হয়ে গেল। ও ধড়মড় করে উঠে দাঁড়িয়ে আবার জানলার ধারে এগিয়ে গেল। মা উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন। ঠিক সেইভাবেই দুটি খোলা উলঙ্গ পা কাঁচির মতো দুদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। ধাইমা মাথা নীচু করে দুই পায়ের ফাঁকে কি করছেন। ... কায়া এবার ভীষণভাবে ক্লান্তি বোধ করল ... এ কষ্ট আর দেখা যায় না। আবার সে বসে পড়লে, ক্লান্তিতে গড়িয়ে পড়লে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত শুকোতে দেওয়া কড়কড়ে ঘুঁটের উপরে।

হঠাৎ সে চমকে উঠলে মঙ্গতুর বকুনিতে—"কায়া, এত রাতে এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছ তুমি?" মঙ্গতু তার মুখ তুলে ধরে—"ছি ... ছি, তোমার কি এতটুকু লজ্জা নেই যে এখানে এভাবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছো?" লজ্জা? কিসের লজ্জা? কাকে লজ্জা? আর কেনই বা লজ্জা? কায়া ভেবে পায়না। এই লজ্জা কথাটা যে ও কতবার শুনেছে! কিন্তু কই, তার মুখোমুখি তো কখনও দাঁড়াবার সুযোগ হয়নি তার? এখানে দাঁড়িয়ে যে সে তার মাকে উলঙ্গ শরীরে ছটফট করতে দেখেছে, খোলা পা দুটিকে যে অসহ্য যন্ত্রণায় কষ্ট পাবার পর নিস্পন্দ হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছে—সে কি লজ্জার বিষয়? কায়া তো জানেনা!

মঙ্গতু হ্যাঁচকা টানে কায়াকে টেনে তুলল। ঠিক ছোটবয়সে যেমন করে সে তাকে জোরজার করে কোলে করত। এতক্ষণে কায়ার যেন সম্বিৎ ফিরে আসে। সে

মৃগী রুগীর মতন হাত-পা ছুঁড়তে থাকে। না ... না ... না ... তারস্বরে সে চিৎকার করে। তার ছটফটানিতে ছাতের সরু কাঠের রেলিং নড়তে থাকে। "আমি ঘরে যা ... বো ... না ... আ ... আ ... কিছুতেই যাবোনা ... ছেড়ে দাও আমাকে"—কায়া সমানে চেঁচাতে থাকে। সে যেন মনের সমস্ত আক্রোশ আজ এই নির্জন গভীর রাতে ঢেলে দিয়ে রাতের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে ফেলতে চায়। কায়ার চিৎকার অন্ধকার পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে ... যা ... বো ... না ... আ ... আ!! মঙ্গতু শক্ত হাতে কায়ার পা চেপে ধরে কাঁধে তোলে—"পাগল, বোকা মেয়ে একটা! ঘরে কোথায় যাচ্ছি আমরা?" গ্যালারীর সিঁড়ি দিয়ে মঙ্গতু নামতে থাকে। এতক্ষণে কায়া শান্ত হয়। না তার নিঃসঙ্গ ঘরে নয়—তারা মঙ্গতুর কোয়ার্টারে যাচ্ছে। মঙ্গতুর কাঁধে কায়া নিজেকে ছেড়ে দেয়। নাঃ, এবার আর ভয় নেই ... তাকে একা শুয়ে থাকতে হবেনা। এই যে সিঁড়ি বেয়ে নেমে মঙ্গতুর ঘরে যাওয়া ... সেই সিঁড়িগুলিই যেন তাকে অভয়বাণী দিচ্ছে।

নীচে প্রতিটি বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া একটা করে সার্ভেন্ট্স্ কোয়ার্টার আছে, যাকে আউট হাউস বলা হয়। কাঠের বাড়ি, ধোঁয়ায় কালো হয়ে যাওয়া। চটের পর্দা ঝুলছে, কোন দরজার বালাই নেই। এর আগেও শীতের নির্জন দুপুরে কায়া অনেকবার মঙ্গতুর কোয়ার্টারে পালিয়ে এসেছে। মঙ্গতুর ঘরের হাওয়ায় ওড়া চটের পর্দায়ও সে যেন অভয়বাণী শুনতে পায়। তার ঘরের শূন্য নির্জনতার থেকে মঙ্গতুর কোয়ার্টারের চটের পর্দার পিছনে উষ্ণ আশ্রয়ের আভাস আছে। কিন্তু একবার কোয়ার্টারে ঢোকার পর আধো অন্ধকারে জল চোয়ানো ভিজে দেওয়ালের গন্ধে আর ছারপোকার কামড়ে তার সব উৎসাহ উবে যেত। ঠিক যেভাবে একবার জাহাজে চাপলে যাত্রীদের যেমন সমুদ্রের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। কিছুক্ষণের মধ্যেই এখানেও তাকে আগের মতো নির্জনতার ভয় ছেঁকে ধরে। বাইরে ঝিঁঝির ডাক, ভিতরে ভ্যাপসা অন্ধকার যেন ওকে গিলে খেতে লাগল। ও মঙ্গতুর দেওয়া কম্বল মুড়ি দিয়ে গুটিসুটি মেরে শুয়ে পড়ে। মনে মনে মন্ত্র উচ্চারণের মতো বলে—"ব্যস, অনেক হয়েছে ... না ... না ... আর কাছে এসো না। ... এখানে আমি শুয়ে আছি ... হ্যাঁ, আমি—কায়া, এবার যাও, বাইরে বেরিয়ে যাও।" এই মন্ত্রে যেন কাজ হয়। ভুতুড়ে নির্জনতা যেন চটের পর্দা গলে অন্ধকারে পালিয়ে যায়। ঝিঁঝি পোকার দল আবার নতুন করে নির্জনতা তাড়াতে কনসার্ট শুরু করে।

কায়ার এই আস্তানার খবর লামা বা ছুটু—কেউই জানত না। সে যে ইচ্ছে করে কথাটা তাদের বলত না, তা কিন্তু নয়। সে নিজেই বুঝতে পারত না কোন্ টানে সে মঙ্গতুর কোয়ার্টারে আসে—যেখানে এলে ওর নিঃসঙ্গতা ঘুচে যায়। রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর যে যার নিজের ঘরে শুতে চলে যায়। কায়াও ছুটুর সঙ্গে ঘরে ঢুকে ঝটপট পোশাক বদলেই শুয়ে পড়ত। ঘুমের ভান করে উপুড় হয়ে পড়ে থেকে

যখন দেখত যে ছুটু ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন ও উঠে বসত। বাইরে মঙ্গতুর কোয়ার্টার তাকে এক অদ্ভুত আকর্ষণে টানে। তার ঘুম আসে না। বাইরে কুয়াশা ঘেরা পাহাড়ে যেন তার ঘুম ফিরে ফিরে কেঁদে বেড়ায়। ও তাড়াতাড়ি রাতের পোশাকের উপর গতবছর জন্মদিনে পাওয়া উলের জার্সিটা পরে নেয়। তারপর খুব ধীরে ধীরে খিড়কির দোর খুলে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে পুরো গ্যালারীটা পেরিয়ে নীচে খোলা হাওয়ায় দাঁড়ানোর পরেও তার বুকের ধুকপুকুনি যায় না। খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে গিয়ে উপরে তাকালে পর কোয়ার্টারের চিমনি ও ছাদের উপর ছোট্ট আকাশটা দেখতে পেয়ে একটু ভরসা পায়। কিন্তু না, এখনও বাকি আছে। মিস্ জোসুয়ার বাগানের "নো ম্যানস্-ল্যান্ড"। ঠিক যেন অন্ধকারে একটা ছোট্ট দ্বীপের মতো। নানা গাছের সঙ্গে সফেদা গাছও সেখানে রয়েছে। তার বড় বড় চওড়া পাতায় জ্যোৎস্না টলমল করে। কিন্তু গাছের তলায় ঘুটঘুটে অন্ধকার। সে শুনেছে যে মিস্ জোসুয়া যখন নতুন এদেশে এসেছিলেন, তখন তাঁর যৌবন, সে সময় এই গাছ লাগিয়েছিলেন। মিস্ জোসুয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর এই গাছও বুড়ো হয়ে গেছে। এই সফেদা গাছকেও তার ভয়। এর তলা দিয়ে যাবার সময় তার বুক এত জোরে টিপটিপ করে যেন তার শব্দ শুনে মিস্ জোসুয়া দরজা খুলে তাকে পাকড়াও করে ফেলবেন। কায়া দুই হাত দিয়ে বুকটা চেপে ধরে এক দৌড়ে বাগানটা পেরিয়ে দু'বাঁশের ঝুলন্ত পুলের কাছে পৌঁছে যায়। —"আঃ, বাড়ি থেকে দূরে বেরিয়ে এসে কি শান্তি! আমি এখন এখানে, কেউ আর আমার নাগাল পাবে না।" ছুটু সর্বদা কায়ার স্বগতোক্তিতে হাসাহাসি করে—"দিদিটা যে কী! তুমি নিজের সঙ্গেই নিজে কি করে কথা বল, বল তো?" কায়াও হাসে। ছুটু এখন কি করছে? ঘুমোতে ঘুমোতে ও পঞ্চাশবার হাত বাড়িয়ে দেয় আমার বিছানার দিকে। রাতভোর ও এই কম্মটি করে। ওর হাত আমাদের দুজনের খাটের মধ্যে ঝুলে থাকে। ... এখনও নিশ্চয়ই ও হাত বাড়িয়ে দিয়ে ঘুমের মধ্যে আমার বিছানায় আমায় খুঁজছে—আমি নেই! কি মজা আমি এখানে, এই বাঁশের পুলের কাছে। কায়ার হাসি পায়। কিন্তু ... কিন্তু ... একি সত্যিই মজার বিষয় না ব্যথার উপকরণ? কায়া দুহাতে শক্ত করে বাঁশ চেপে ধরলে। এই নির্জন খাঁ-খাঁ-করা গভীর রাত, এই অন্ধকারে আমি একা এখানে দাঁড়িয়ে—এখানে ভয় আছে, যন্ত্রণা আছে। কায়ার হাতের চাপে বাঁশ নড়ে উঠল, পুল দুলে উঠল। ... চাঁদ গাছের ফাঁক দিয়ে উঁকি মারছে। ঝোপের মধ্যে খানা-খন্দের উপর চাঁদের সোনালী কিরণ পড়ে চক্‌চক্ করছে, ঠিক যেন কোন কুমারী মেয়ের সিঁথি। পাহাড় থেকে পাহাড়ে বাতাসের শীৎকার। বাতাস যেন কেঁদে কেঁদে, কেঁপে কেঁপে পাহাড় পরিক্রমা করছে। এক এক সময় নিঃঝুম রাতে এই শীৎকারে ফোঁপানির শব্দ শোনা যায়। এই ফোঁপানির শব্দ কোথা থেকে আসে? এ কী ঝাউবনের মর্মরধ্বনির ক্রন্দন নাকি তার নিজেরই অন্তরের আর্তি। ... কায়ার

শীত করতে লাগল। পিছন দিয়ে ও বাড়ির দিকে তাকাল। ওই তো চিমনি, খুবানী গাছটা। সকলেরই যেন একটা আলাদা স্বতন্ত্র সত্তা আছে। এদের সংযোগ-সেতু হলো তাদের বাড়ি। এখন প্রধান সেতু এই বাড়িটাই আঁধারে ডুবে আছে। শুধু রান্নাঘরের আলো জ্বলছে। মঙ্গতু বাসন মেজে, রান্নাঘর ধুয়ে কাজ সেরে, তারপর আলো হাতে নিয়ে পুরো বাড়িময় ঘুরে দেখে। ... ও'র চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসে। জার্সিটাকে কম্বলের মতো মুড়ি দিয়ে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে সে শুয়ে পড়ে। ওর মজা লাগে! নিজের বাড়িতে নয়, মঙ্গতুর কোয়ার্টারে সে শুয়ে আছে। ওর ইচ্ছে করছে লোকে দেখুক, বুঝুক যে সে কত একা! নইলে কেউ তার বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে তার কোয়ার্টারে থাকে! চটের পর্দাটা তুলে দিয়ে কোয়ার্টারের দরজার চৌকাঠে এসে সে বসে। এখন শান্তি। মনে হচ্ছে যেন সে আর একা নয়। ওই যে সামনের পাহাড়ের উপর দেখা যাচ্ছে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত আলো। ওই আলোই ওর সঙ্গী। ওই আলো যেখানে যেখানে জ্বলছে, সেখানেই বাড়িঘর রয়েছে, লোকেরা আছে। তারাও নিশ্চয়ই এখন জেগে রয়েছে। তারই মতন, কেননা আলো জ্বলছে। কায়া অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করে। মনে হয় ও যেমন দূরে বসে পাহাড়ের গায়ে আলোর মালা দেখতে পাচ্ছে, তেমনই কি ওদিকেও ওরা পাহাড় পেরিয়ে অন্ধকারের মধ্যে বসে থাকা কায়াকে দেখতে পাচ্ছে? অন্য কেউ তাকে নিরীক্ষণ করছে ভেবেই তার গায়ে রোমাঞ্চ হলো। কিছুক্ষণ পরেই আবার বিষাদে তার মনটা ছেয়ে গেল। কেন এমন হয়? ... এবার কায়া ঢুলতে লাগল। ঘুমের ঝোঁকে ওর মাথা কখনও সামনে, কখনও পিছনে নড়তে থাকে। ও জোর করে ঘুমকে ঠেলে রাখে—না, এখন ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না, এই তো মঙ্গতু এসে পড়ল বলে। মঙ্গতুর ফিরে আসা পর্যন্ত কায়া জোর করে জেগে থাকার চেষ্টা করে।

কিন্তু ঘুমও তো আসে না? মঙ্গতু ওকে যেভাবে বসিয়ে রেখে গেছে, ও সেভাবেই বসে রয়েছে। শূন্য, নিদ্রাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে। সে-ই কিনা, একটু আগে যখন মঙ্গতু জোর জবরদস্তি ওকে কাঁধে করে সিঁড়ি দিয়ে নামছিল, চিৎকার করে হাত-পা ছোঁড়াছুড়ি করছিল? কোথায় গেল এখন সেই লম্ফ-ঝম্প? মঙ্গতু ওকে রেখে ফিরে যেতেই ও যেন সব চাঞ্চল্য হারিয়ে বোবা বনে গেল। সে যেন এর আগে হাত-পা নেড়ে, চেঁচিয়ে মেচিয়ে কোন কমিক রোলে অভিনয় করছিল মঞ্চের উপর পাদপ্রদীপের সামনে। পর্দা পড়ে যেতেই যবনিকার অন্তরালে ও যেন একদম একা, মূক ও অন্তঃসারশূন্য হয়ে পড়ল। ... "আমি জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে—দেখলাম ঘরে আলো জ্বলছে, ধাইমার হাতে গরম জলের গামলা ... তার থেকে উষ্ণ বাষ্প বেরুচ্ছে। মায়ের হাত ... আঙুলগুলি বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে ... যন্ত্রণায় মা কুঁকড়ে উঠছেন। এ বেদনার যেন শেষ নেই। এখনও যেন সেই দৃশ্য অভিনীত হয়ে চলেছে, শেষ হয়নি; হয়তো বা কখনই শেষ হবে না। এ চলতেই থাকবে আর

আমিও জানালার পিছনে দাঁড়িয়ে মূক বেদনায় সেই যন্ত্রণার দৃশ্য দেখে যাব অনন্তকাল ধরে।”

... উঃ, গরম লাগছে। কায়া হঠাৎ চমকে উঠে বসলে। ঘামে গা ভিজে গেছে। মঙ্গতুর ঢেকে দেওয়া কম্বলও জার্সিটাকে সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে। চটের পর্দার ভিতর দিয়ে একফালি মলিন জ্যোৎস্না ভেসে আসছে। ও ঘসে ঘসে দেওয়ালের এককোণে সরে গেল। একটা গুন গুন শোনা গেল। কায়া কান খাড়া করলে। পাঁচিলের ওপিঠে কেউ মৃদুস্বরে গাইছে। গানের সুর ধোঁয়ার মতো পাকিয়ে-পাকিয়ে উঠে হাওয়ায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

কায়া এবার উঠে পড়লে। পা টিপে টিপে বাইরে এসে দাঁড়ালে। ওই যে দূর পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট 'টেরাস' দেখা যাচ্ছে। নীচে খানা-খন্দের মধ্যে থেকে কুয়াশা উপরে উঠছে। বাতাস বন্ধ হয়ে যাওয়াতে কুয়াশাও যেন মাঝপথে আটকে আছে। পাহাড়ের একদিকে কুয়াশা, অপরদিকে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কায়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন তার ছোট্ট ছায়াও জ্যোৎস্নায় তাকে অনুসরণ করে খুবানীর গাছ পর্যন্ত আসে। কায়া মঙ্গতুর কোয়ার্টারের ঝুল বারান্দা ধরে আর একটা কোয়ার্টারের কাছে এসে দাঁড়ায়। এই কোয়ার্টারটা খালিই পড়ে থাকে। শুধু ধাইমা যখন এখানে আসেন, ভোলুও আসে, তখন ভোলু এই কোয়ার্টারে রাত্রে শোয়।

সেই রাত্রে কায়া যা যা দেখেছে, তাতে করে তার ভয় পাবারই কথা। কিন্তু সে মোটেই ভয় পায়নি। আগে নানা ছোটখাটো ব্যাপারে ও এত ভয় পেতো যে সে ভয় কাটিয়ে ওঠা কষ্টকর হতো। কিন্তু সেদিন রাত্রে যে যন্ত্রণার এক দীর্ঘ মুহূর্তের সে মূক দর্শক ছিল, তাতে করে সে যেন হঠাৎ বড় হয়ে উঠল। এখন ঠিক একজন বড়র মন ও বুদ্ধি নিয়ে সে ভোলুর ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালে। ওকে এই প্রথম যেন সে ভালো করে দেখলে। ... ভোলু আর চারটে সাধারণ মানুষের মতোই মানুষ। ভোলু তার নিজস্ব স্টাইলে গাইছিল।

কায়া এবার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে এলো। ঘরের মধ্যে একটা লণ্ঠন জ্বলছে। লণ্ঠনের কাঁপা আলোয় মনে হচ্ছে কড়িকাঠের ছাদ নড়ছে। অথচ এখন কিন্তু সব থমকে থেমে আছে—পাহাড়ের ছায়া, কোয়ার্টারের ছাদ, দেওয়ালে ধোঁয়ার কালি। শুধু ভোলু মাথা নেড়ে যাচ্ছে তার গুনগুনানীর সঙ্গে তালে তাল দিয়ে। —“ভোলু দেখো এখানে, এই যে আমি, আমি কায়া। আমার মাথায়, গালে না তুমি একটু পরম মমতায় হাত বুলিয়েছিলে!” কায়ার ঠোঁট আবেগে কেঁপে উঠল। কায়া ধাইমার অতি আদরের ছেলের কাছে এখন লণ্ঠনের আলোয় দাঁড়িয়ে। ভোলু মাথা নীচু করে বসে আছে। কিন্তু তার চোখ উপরে। নাক ও থুতনির মাঝে তার খোলা মুখ দেখে অতল গহ্বরের কথা মনে পড়ে। কিন্তু তার কোনও দিকে নজর নেই। কায়ার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সে একেবারেই অবহিত নয়। কায়া যেন কোন কীট-পতঙ্গের

সামিল, উড়তে উড়তে হঠাৎ তার সামনে এসে পড়েছে। তার কোনও কৌতূহল নেই, নেই কোন বিস্ময়। ও যেন সমস্ত সময়ের সীমানার বাইরে। সে একটি অবোধ শিশুর মতোই। তার কাছে কোন কিছুরই বিশেষ মূল্য নেই।

—"তুমি গান গাইছিলে ভোলু? আমি মঙ্গতুর কোয়ার্টার থেকে তোমার গান শুনছিলাম। তোমার গান শুনেই তো এখানে এলাম!" কায়া অনর্গল বকে যেতে লাগল। ওর ধারণা এভাবে কথা বলে গেলে ভোলুর হয়তো বা কিছু মনে পড়তে পারে, ও কায়াকে কায়া বলে চিনতে পারবে। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা! ভোলুর কোনই প্রতিক্রিয়া নেই। সে যেন একটা দম দেওয়া খেলনার পুতুল! দম ফুরিয়ে গেলে পুতুলের মাথাটা যেমন দু'একবার নড়ে-চড়ে বন্ধ হয়ে যায়, তেমনভাবে ভোলুও মাথা নাড়ে দু'একবার। ও' হাতের দুটো আঙুল দিয়ে কিছু একটা ইশারা করলে। ওর গলা দিয়ে গোঁ-গোঁ করে একটা আওয়াজ বেরুল। কায়া ভোলুর কাছ ঘেঁসে বসলে। লণ্ঠনের উষ্ণতায় তার আরাম লাগছিল। সমস্ত দিনের উৎকণ্ঠা, বেদনা, মায়ের যন্ত্রণার দৃশ্য আর ছায়ারণ্য প্রকৃতিকে ভুলে সে এবার ধাইমার বোবা-কালা ছেলে ভোলুর দুনিয়ায় যেন হারিয়ে যেতে চাইলে—যে দুনিয়ায় সময়ের কোন মাপকাঠি নেই, সময় যেখানে কালাতীত!

ভোলুর হাঁ করা মুখে একটি দাঁত বেরিয়ে আছে। দাঁতটা ঝকঝক করছে। কায়া এর আগে কখনও এত সাদা দাঁত দেখেনি। হ্যাঁ, গিনীর দাঁত অবশ্য এমনই সাদা ছিল। গিনীর সেই দাঁত শেষবার সে দেখেছিল রেল লাইনের উপর তার শেষ আর্তনাদের সময়ে। ... "কি, গিনীকে বাঁচাতে পারলে না?" কায়া ঝোপের ধারে লামার হাসি এখনও শুনতে পায়।

—"বোকা কোথাকার! দেখ তোর গিনীকে—সাদা লোম কেমন রক্তে ভিজে লাল হয়ে গেছে।" ... রেল লাইনের ধারে এখনও গিনীর পেঁজা তুলোর মতো সাদা লোম উড়ে বেড়াচ্ছে।

কায়া হঠাৎ চোখ খুলে দেখে কোথাও কিচ্ছু নেই, শুধু ভোলু তার বোবা দৃষ্টি মেলে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। আর *ঠিক সেই মুহূর্তে, রাতের সেইক্ষণে, প্রথমবার কায়া নিজেকে খুব হালকা বোধ করে। সবকিছু যেন হঠাৎ নির্মল* আকাশের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। সকল বিষাদের বাইরে সে যেন একটা হালকা মন নিয়ে *খোলা আবহাওয়ায় বেরিয়ে এলো। এইমন নিয়ে সে এখন অনায়াসে* গিনীর থেঁতলানো দেহ, মায়ের যন্ত্রণাকাতর শিথিল, উলঙ্গ জানুও অগ্রাহ্য করতে *পারে। পথের ধারে খটখটে শুকনো কঙ্কাল লোকে যেমন উদাসীন নিস্পৃহতায় দেখে* থাকে, তাদের মনেও পড়ে না যে একদা এই হাড়ের খাঁচার চারপাশে একটা মানবদেহের আবরণ ছিল, যার হৃদয়, মস্তিষ্ক, বোধ-বুদ্ধি সব ছিল, ঠিক তেমনই কায়া এখন তার বিষণ্ণ অতীতকে, বেদনাবিধুর অভিজ্ঞতাকে উপেক্ষা করতে

পারছে। নিজের মধ্যে পরিবর্তনের এই আনন্দে কায়া যেন খুশিতে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সে পাগলের মতো ভোলুর দু'হাত চেপে ধরে উত্তেজনায় ফিসফিসিয়ে বলে ওঠে—"ভোলু, কিছু বল ভোলু, কথা বল। ভয় পেয়োনা। তোমার মা উপরে আমার মায়ের কাছে বসে রয়েছেন। আমরা এখানে নিরিবিলিতে বসে রয়েছি। এখানে তোমায় কেউ বিরক্ত করবে না ... আমি আছি তোমার কাছে। আমাকে চেনো তো? আমি কায়া, কায়া—সেই মেয়েটা যার গাল ছুঁয়ে তুমি তোমার সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছিলে।" কায়া যেন কথার এই সেতু ধরে তার খুশির দুর্লভ মুহূর্তটুকু ভোলুর সঙ্গে ভাগ করে নিতে চায়। নির্বিকার ভোলু একদৃষ্টে তার ঠোঁট নাড়ানো লক্ষ করে বোধ হয় কিছু বোঝার চেষ্টা করলে। তারপরেই একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। সে মেঝেয় দু'হাতে ভর দিয়ে ওঠার উপক্রম করলে। লণ্ঠনের আলোয় তার ফর্সা ন্যাড়া মাথা নীলচে দেখাচ্ছিল। .... ভোলু নিজের জায়গা থেকে একটুও না নড়ে দরজার দিকে ইশারা করে কিছু দেখাবার চেষ্টা করলে। কায়া পিছন ফিরে তাকালে। কই? কিচ্ছু তো নেই? ভোলু কি বলতে চায়? কি দেখেছে ও'? কায়া ভেবে আকুল হয়। বাইরে কুয়াশা ও আকাশে মিলে এক অদ্ভুত উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করেছে ... এক বিচিত্র রহস্যময় পরিবেশ যা কেবল মাঝরাতে পাহাড়ি দেশেই দেখতে পাওয়া যায়। ভোলুর বোবা ইঙ্গিত কি প্রকৃতির এই অভূতপূর্ব অলৌকিক দৃশ্যের প্রতি, যা শুধু সে নিজেই উপলব্ধি করতে পারে, কায়া পারে না?

আবার বাতাস উঠল। কোয়ার্টারের মাথার উপর চাঁদের ফালি সরে এলো এবার খুবানী গাছের মাথায়। একটা গাছ নড়ে উঠল, তারপর একটা গাছ। এরপর সমস্ত জঙ্গল দুলে উঠল, সড়সড় শব্দ শোনা গেল। মিস্ জোসুয়ার লেটার বক্সের পাল্লা দুলতে লাগল। লন্ডন থেকে ডাকে আসা একগাদা খবরের কাগজ তাতে আটকে আছে। মিস্ জোসুয়ার সেগুলি যেন বের করার কোন চাড় নেই। বাতাস উঠলেই লেটার বক্সটায় যেন প্রাণ সঞ্চার হয়। লেটার বক্সের পাল্লাটা বার বার খোলে আর বন্ধ হয়—চটাস্ চটাস্ করে শব্দ হয়। ঠিক মনে হয় হাততালি দিচ্ছে।

কায়া পিছন ফিরতেই মঙ্গতু তার কাঁধ দুটো চেপে ধরলে। —"আমি ভাবছিলাম তুমি এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছ।" মঙ্গতুর স্বরে ক্লান্তি ও হতাশা। এই নৈরাশ্য কি কায়ার আচরণে না ভোলুর একঘেয়ে মাথা দোলানোয় অথবা নির্বাক রাত্রির বিষণ্ণতায়?

মঙ্গতুর শরীরটা লম্বা ও বেঢপ। ওকে দেখে তছনছ হওয়া বিছানা বলে মনে হয়। ভালো করে বেঁধেছেঁদে না রাখলে যেন তার ছিরিছাঁদ থাকবে না—একদিকে হাত, অপর দিকে পা আর এক কোণে মাথা বেরিয়ে আসবে। অথচ অদ্ভুত শান্ত ও

ঠাণ্ডা তার গলার স্বর। সে স্বর এত সংহত ও সংযত যে কায়ার মনে হয় এই দুয়ের কোথাও কোন মিল নেই। আলু থালু বিছানার মতো তার দেহের সঙ্গে তার সংযত শান্ত ও ঠাণ্ডা স্বরকে বাঁধার মতো বেল্ট বোধকরি কোথাও পাওয়া যাবে না।

মঙ্গতু ভারী পায়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। কায়া বাইরে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে। মঙ্গতুর হাঁটা দেখে মনে হচ্ছে যেন কোন শিকারী অতি সন্তর্পণে অথচ ক্ষিপ্র গতিতে কোন বন্য জন্তুর গর্তের দিকে এগুচ্ছে। আর সেই জন্তুটি সব কিছু ভুলে নিজের দুনিয়ায় মশগুল হয়ে আছে। কিছুক্ষণ দুজনে মুখোমুখি হয়ে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। হঠাৎ মঙ্গতু নীচু হয়ে ভোলুর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। তার মাথার বিনুনি ভোলুর মুখে এসে পড়ল। মঙ্গতু তার হাতটি মেঝে থেকে সযত্নে তুলে নিলে। তারপর তার কানে কানে কিছু একটা বললে। ভোলু হাসছে বলে কায়ার মনে হলো। ঝকঝকে সাদা দাঁত! ভোলু যেন এক অচেনা দুনিয়া থেকে চেনা দুনিয়ায় ফিরে এলো। একটা ছোট্ট বাচ্চার মতোই সে মঙ্গতুর কথামতো আচরণ করতে লাগলে, ঠিক যেমনটি মঙ্গতু চায়। এক এক করে সে নিজের সমস্ত কাপড়জামা খুলে ফেললে। ওর পরণে যখন স্রেফ একটা গেঞ্জি ও জাঙ্গিয়া রয়ে গেল, তখন মঙ্গতু ওকে বিছানায় শুইয়ে দিলে ... আবার ওর কানে কানে কিছু বললে সে। কায়াও তার দু'একটা কথা শুনতে পেল। কিন্তু সে মঙ্গতুর ভাষা বুঝতে পারলে না, কেননা মঙ্গতু পাহাড়ি ভাষায় কথা বলছিল। কিন্তু মনে হলো মঙ্গতু যেন মন্ত্র পড়ার মতো একই কথা বারবার উচ্চারণ করে যাচ্ছে আর ভোলু ধীরে ধীরে গা ছেড়ে দিয়ে বিছানায় ঢলে পড়ছে, ঠিক যেন একটা সাপ ধীরে ধীরে ঝাঁপির মধ্যে সিঁধিয়ে যাচ্ছে। মঙ্গতু লণ্ঠনটা বুজিয়ে দিলে। পুরো ঘরটি অন্ধকারে ছেয়ে গেল। মঙ্গতু এবার কায়ার হাত ধরতেই সে ফুঁসে উঠে এক ঝটকায় তার হাতটা ছাড়িয়ে নেয়। চাপা আক্রোশে সে ফুলছে। চৌকাঠের বাইরে বেরিয়ে এসেও সে বুঝতে পারে যে ভোলু এখনও ঘুমোয়নি—সে কায়ার গমন পথের দিকে বোবা দৃষ্টি মেলে চেয়ে রয়েছে।

—"এবার চলো।"

—"কোথায়?"

—"নিজের ঘরে, আর কোথায়?"

কায়ার পিছন পিছন মঙ্গতুও নিজের ঘরে এসে দাঁড়ায়। কায়া ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েছিল। উপরে নিজের ঘরে যেতেও তার সাহসে কুলিয়ে উঠছিল না। এমনকি ছুটুর পাশেও গিয়ে শুতে ইচ্ছে করছিল না। তীব্র একটা জেদে তার মনটা শক্ত হয়ে উঠেছিল।

—"মঙ্গতু, আমি এখানেই ঘুমোই", ও মঙ্গতুর অনুমতি চায়। মঙ্গতু ওর দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকালে—কায়া কত বড় হয়ে গেছে। তার ছোট্ট বয়স থেকেই মঙ্গতু তাকে দেখে আসছে। ও যে বড় হয়ে উঠতে পারে, সে খেয়ালও বোধকরি

তার নেই। এখন এই কায়াকে দেখে সে তার ছোট্ট বয়সের কথাও ভুলে যাচ্ছে। মঙ্গতু কায়ার সঙ্গে এমন করে কথা বলে, যেন সে ছোট বা বড় বয়সের সব সীমারেখার বাইরে। তার গ্রামের পাহাড়, গাছপালা ও পাথরের মতোই যেন কায়ারও বিমূর্ত ব্যক্তিত্ব! ... "তোমার ভয় করছে?" মঙ্গতু আলতোভাবে তার চুলে হাত বোলায়। কায়ার মেরুদণ্ড শিরশির করে ওঠে। মঙ্গতুর স্বরে উষ্ণ আমন্ত্রণ আছে, ধৈর্য আছে, ভরসা আছে। সে তার উপর আস্থা রাখতে পারে। অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ বসে রইল। ভোলুর ঘরে কোন সাড়াশব্দ নেই। ওখানে যে কেউ শুয়ে ঘুমোচ্ছে তাও বোঝা যাচ্ছে না। কোনরকম ঘুমন্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের বাড়ির উপরের অংশ এবার অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। নীচে মিস্ জোসুয়ার ঘরে বাতি জ্বলছে—তিনি সারারাত আলো জ্বালিয়ে রাখেন।

—"মা কাঁদছিলেন, তুমি দেখেছ?" —কায়া দ্বিধাভরে বলে। ওর মা যেন যন্ত্রণায় খান্ খান্ হয়ে গেছেন, কায়ার মনে হয়।

—"তুমি কেমন করে জানলে?" মঙ্গতু তার দিকে যুগপৎ সংশয় ও বিস্ময়ে তাকায়।

—"আমি জানালার বাইরে দাঁড়িয়ে সব কিছু দেখেছি।"

—"ছি ... ছি ... ছি ..." মঙ্গতু শিউরে উঠল। ও মোরগের মতন এবার উবু হয়ে বসল আর নিজের হাঁটুর উপর হাত বোলাতে লাগল।

—"আ ... ছি ... ছি ... তুমি এসব দেখেছ?" মঙ্গতুর স্বরে লজ্জা ও বেদনা।

—"হ্যাঁ, আমি জানলার পিছনে দাঁড়িয়ে স ... ব দেখেছি।"

—"তুমি তার মানে ওটাকে দেখেছ?" মঙ্গতুর হাত হাঁটুতে থেমে রইল।

—"হ্যাঁ, ওটাকেও দেখেছি।" কায়া যেন এখনও সব স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে — "ওটা ধাইমার হাতের উপরে ... এসে ..." —কায়া চুপ করে যায়। ... নীলচে রঙের একটা পোঁটলার মতো। মায়ের দুই জানুর মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল। সাদা ফেনার মতো পিচ্ছিল, ক্লেদাক্ত পিণ্ড — একটা স্বপ্নের মতো, কমনীয় ছলনার রূপধারী এ-সেই স্বপ্ন, যাকে নিজ সত্তায় ধারণ করে মায়ের শরীর বেঢপ বড় হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সে নিজে কত্তো ছোট্ট—একরত্তি। মা ছাড়া যার কোন অস্তিত্বই নেই।

হিস্ ... হিস্ ... বাইরের হাওয়া এসে মঙ্গতুর মুখ থেকে নিঃসারিত শিসের সঙ্গে মেশে। ... "ইস্ ... স্ ... স্! বাচ্চাটা একবার নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিলে না ভূমিষ্ঠ হয়ে অবধি। একবার নিঃশ্বাস নিলেই, ব্যস আর কোন ভয় ছিল না। বেঁচে উঠত।"

নিঃশ্বাস ... রোদে ঝকঝক করা জীবনের আঙ্কুরোদ্গম! কায়া চোখ বন্ধ করলে। ওর মন রেলের লাইনের ধারে আবার ফিরে গেল — গিনী রোদে শুয়ে আছে। কত লাইন ... পরের পর সাজানো ... দূর দূর পর্যন্ত এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে।

লাইন কেঁপে কেঁপে ওঠে ... দূর থেকে গাড়ির আগমন বার্তা জানায়। যতক্ষণ সে রেললাইন ধরে এগোবে, গিনীরও নিঃশ্বাস পড়বে—যে নিঃশ্বাস জীবনেরই পূর্বসূচনা, সে নিঃশ্বাস জীবন্ত!

মঙ্গতু এবার উঠল। নিজের হাতের আঙুল মটকাতে লাগলে। তারপর এক এক করে নিজের পায়ের পট্টি খুলতে লাগলে। মোজার পরিবর্তে সে পায়ে পট্টি বেঁধে রাখে। ময়লা, ছেঁড়া-ধুদ্ধুড়ে কাপড়ের পট্টি। মঙ্গতু এগুলি লামা, ছুটু ও কায়ার পুরানো, ছেঁড়া কাপড় থেকে সংগ্রহ করেছে। এক এক করে মঙ্গতু পট্টির পরত খোলে, কায়া শ্বাস রোধ করে গোল গোল চোখে তাকিয়ে দেখে। শেষ পট্টিটা খোলার পর মঙ্গতুর নোংরা, বিচ্ছিরি ফাটা পা বেরিয়ে এলো। মঙ্গতু পায়ের উপর নিজের হাতটা চেপে ধরে। ওর পায়ের এক একটা ফাটা জায়গা থেকে যেন যন্ত্রণার কাতরানি নিঃসৃত হচ্ছে। মঙ্গতু মোমবাতি জ্বালালে। ঘরটা ম্লান আলোয় ভরে উঠল। বাইরে পাহাড়ের ছায়া সামনের পাঁচিলের উপর পড়েছে। মঙ্গতুর হাতে মোমবাতির শিখা কাঁপতে লাগল। তার থেকে মোম গলে গলে তার হাতে পড়তে লাগল। আ ... আ ... আঃ ...! মঙ্গতু শব্দ তোলে। এটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ না আরামের আবেগপ্রকাশ, কায়া ঠাহর করতে পারে না। ও বেঁকে যাওয়া মোমবাতিটা সোজা করে দাঁড় করায়। পাহাড়ের ছায়া এবার পাঁচিলের থেকে সরে গেলো। — "মঙ্গতু, ব্যথা কমেছে?" —কায়া উদ্‌গ্রীব হয়ে ওর পায়ের চেটো লক্ষ করে। "কম আর কই হয়! ব্যস, কিছুক্ষণের জন্য মাত্র গরম মোমে ব্যথার উপশম হয়।" —মঙ্গতু হতাশ স্বরে বলে। কায়া ঝুঁকে পড়ে মঙ্গতুর ফাটা পা দেখতে লাগলে। পায়ের কালো কালো ফাটা ঘা গরম মোমের পুলটিস পেয়ে বুজে গিয়েছে। নাঃ, এখন পাজি ব্যথাটা আর চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। কায়া পরম নিশ্চিন্তে মঙ্গতুর সঙ্গে মেঝের উপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

চটের পর্দাটা বাতাসে উড়ছে। বাইরেটা এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। কায়া এক দৃষ্টে পাহাড়ের দিকে চেয়ে রইলে। পাহাড়ের দল অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে ঘেঁসাঘেঁসি করে দাঁড়িয়ে আছে। নীলচে জঙ্গলের পিছনে অ-নে-ক দূরে কাকার বাড়ি। কোন কোন সময় দেশলাইয়ের কাঠির মতো একটা চিমনির আভাস দূর থেকে পাওয়া যায়। এটাই বোধহয় কাকার বাড়ির চিমনি। কাকার বাড়ির জায়গাটার নাম ফক্সল্যান্ড—কি মজার নাম! আগে আগে মায়ের সঙ্গে সে কাকার বাড়ি যেত। বাড়িটা বিরাট বড়, খাঁ খাঁ করছে জনশূন্য জঙ্গলের ধারে। গত কয়েকমাস ধরে সে মাকে সমানে ত্যক্ত করেছে—"চলোনা মা, ফক্সল্যান্ডে যাই!" মা তার কথা হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। মা তখন অন্তঃসত্ত্বা ... দিন এগিয়ে আসছে। তাঁর পক্ষে চড়াই ভেঙে ওঠা সম্ভব নয়। কায়া কিন্তু অন্তঃসত্ত্বা কাকে বলে জানে না। কিসের সত্ত্বা? কোথায় সত্ত্বা? দিন কিভাবে, কার কাছে এগিয়ে আসছে?

—"মঙ্গতু", কায়া এত আস্তে ডাকল যে ডাকটা সে নিজেও ভালো করে শুনতে পেলে না। মঙ্গতুকে ডাকতেই শুধু তার তৃপ্তি। মঙ্গতু ঘুমোচ্ছে। সে রাজ্যের চিন্তা মাথায় নিয়ে ঘুমায়। কাজেই তার ঘুমও পাতলা। একটু উপদ্রবেই ভেঙে যায়। মঙ্গতু ঘুমের ঝোঁকেই বলে ওঠে—"কে? ওঃ কায়া, এখনও ঘুমাওনি?" —নাঃ, কায়ার চোখে ঘুম নেই, কিন্তু তার সর্বাঙ্গে ঘুমের আমেজ। সে মঙ্গতুর কাছটিতে সরে শোবার জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ... ইঃ, মঙ্গতুর গায়ে কি বিচ্ছিরি গন্ধ! এই গন্ধটার জন্যেই তো সে তার কাছে সরে শুতে পারছে না। এই গন্ধটা চেনা, কিন্তু দুঃসহ! তবে এখন, রাতের এই মুহূর্তে, এই গন্ধও তাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলে না। সে সরতে সরতে একদম মঙ্গতুর কাছটি ঘেঁসে নিজের লেপের থেকে বেরিয়ে তার কম্বলের কাছে এসে ... হঠাৎ কায়া চমকে উঠল। এটা আবার কি? মঙ্গতুর পায়ের সঙ্গে তার পা ঠেকতেই একটা শক্ত, ঠাণ্ডা মতন জিনিস পায়ে ঠেকলো। —"মঙ্গতু ..." কায়া ফিসফিস করে বললে। মঙ্গতু ফোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছাড়লে। মেঝেতে চড়চড় করে একটা শব্দ উঠল। মেঝের কাঠের তক্তা থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া বের হয়ে এসে যেন হাড়ের মধ্যে বিঁধল।

—"তোমার পায়ে এটা কি?" কায়া এতক্ষণে পা গুটিয়ে নিয়েছে। তার পায়ের ভিতরটা শিরশির করছে। —"কেন, তুমি কি আগে কখনও এটা দেখোনি?" —মঙ্গতু জড়িয়ে জড়িয়ে বলে—"তামার বালা। আসলে পট্টির নীচে থাকে কিনা, তাই দেখা যায় না। তাই? .... ঠাণ্ডা শক্ত পায়ের বালায় খটখট শব্দ হয়। "দেখা যায়না বুঝি মঙ্গতু?" হাসি ও কাশির দমকে মঙ্গতুর দম আটকে আসতে লাগল। মঙ্গতু উঠে বসল। কায়ার দিকে ও চাইলে ... দু'পাশে চুলগুলো ছড়িয়ে দিয়ে ছোট্ট মেয়েটা শুয়ে আছে। .... "ছোট বয়সে পরেছিলাম কায়া। পাহাড়ি গ্রামে এটাই প্রথা। জন্মাবার সঙ্গে সঙ্গে পরিয়ে দেওয়া হয় আর সেটা মৃত্যু পর্যন্ত পায়ে থাকে।"

"মৃত্যু পর্যন্ত থাকে?" —কায়া মাথা তুললে—"এর মধ্যে এটা বদলানো হয়না?"

—"কে বদলাবে কি করে বদলাবে বল? তাতে করে তো পা কেটে ফেলতে হবে!"

—"না না, আমি তা বলছি না।"

কায়া মঙ্গতুর আরও কাছ ঘেঁসে আসে। এখন আর তার গায়ের বোঁটকা গন্ধ তত খারাপ লাগছে না।

—"না না, আমি বলছিলাম, যে বড় হলে পর পায়ের বালা তো ছোট হয়ে যায়, নাকি? পায়ে এঁটে যায় না? লাগে না?"

—"কি এঁটে যায় কায়া ... কিসে লাগে?" মঙ্গতু ঘুমের ঘোরে কথা বলতে বলতে কথার খেই হারিয়ে ফেলে। ও কার সঙ্গে কি কথা বলছে, সে খেয়ালই থাকে না।

—"কি বলছ?"

—"বলছি পায়ের বালা! মানুষ বড় হয়ে গেলে পর কি হয়?" —কায়া এবার অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। তার স্বর চড়ে যায়।

এবার মঙ্গতুর ঘুম ভাঙে—"এই বালাও পায়ের সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে থাকে, চওড়া হয়ে যায়। দেখো আমার পা আর পায়ের বালা—দুটোই এক মাপের।" মঙ্গতু কায়ার ঘাড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে। তার মাথার লামা-সিপ্পিদের মতো বিনুনি ওর মুখে এসে লাগে।

—"বড় হয়ে যায়, নিজে থেকে? আঙুলের মতো, নখের মতন—এই তামার বালাও? ধ্যাৎ, কি যে বলো মাথামুণ্ডু, তার ঠিক নেই।"

—"এগুলোরও প্রাণ আছে কায়া। মানুষের প্রাণের সঙ্গে এদের প্রাণও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে।

—"তারপর?" কায়া জিজ্ঞেস করল। মঙ্গতু কিন্তু এখানেই কথার ইতি টানলে। "তারপর ... ব্যস, আর কিচ্ছুনা।" মঙ্গতু আবার ঘুমে তলিয়ে যেতে লাগল। দেওয়ালের গায়ে মাথা রেখে সে শুয়েছিল। তার চোখ বন্ধ হয়ে গেল। ... "তারপর আর কি? যখন মানুষ মরে যায়, তখন কি হয়?" ..."তখন?" মঙ্গতু একটা লম্বা নিঃশ্বাস নিলে—"তখন আবার বালা ছোট হয়ে যায়, ঠিক বাচ্চাদের পায়ের মাপের মতো—পায়ের সঙ্গে ওটা এঁটে যায় —খোলা যায় না। সমস্ত দেহটা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হাড়ের সঙ্গে ওটা সেঁটে থাকে ...।"

কায়া নিজের পা আস্তে করে মঙ্গতুর পায়ের উপর থেকে সরিয়ে নেয়। নিজের জায়গায় ফিরে এসে সে শুয়ে পড়লে। ওর মনে হতে লাগল যে তার দেহ, তার সত্তা ও তার পা—তিনটে যেন আলাদা—একের সঙ্গে অপরের কোনও যোগ নেই। তিনটের মধ্যবর্তী সংযোগ হলো—বাতাস, স্রেফ বাতাস। এই বাতাস কাঠের মেঝের তক্তার মধ্যে দিয়ে ফোকর বেয়ে উঠে আসে।

নিঃশ্বাসও বোধকরি এভাবেই ওঠে? প্রথমে একবার, তারপর আর একবার, তারপর তার শৃঙ্খলা চলতে থাকে, একের পর এক ... ও পাশ ফিরলে। ... আবার তার চোখের সামনে তার জানলায় দাঁড়ানোর দৃশ্যটা ভেসে উঠল। ছোট্ট ছোট্ট দুটি পা ... মায়ের দুটি উলঙ্গ পায়ের মাঝে ... শুধু হাড় আর তার উপর সরু তারের বালা ... ছোট্ট পায়ের মতনই ছোট্ট বালা ... কেউ সেটা খুলে নেয়নি। ... উড়ন্ত ছাই-এর মধ্যেও এগুলি রিন্‌টিন্‌ করে বেজে ওঠে।

—"মঙ্গতু! বাচ্চাটা কি সত্যি সত্যিই নিঃশ্বাস নেয়নি?"

—"নারে! ছোট্ট একটুখানি নিঃশ্বাসও নয়!"

ছয়

—"কোন দিক দিয়ে বল?" ছুটু বললে।

—"সিঁড়ি দিয়ে। কায়ার উত্তর।"

—"ঠিক আছে। আমি তা'লে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। তুমি আগে পৌঁছলে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে তো?"

ছুটু রওনা দিল। ছুটুর দৌড়নো যেন বাতাসের বেগে ওড়া। কায়া ওর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলে। মাঝখানে একটা সরু পাকদণ্ডী পড়ে, মন্দিরের ঠিক পিছনে। দূর থেকে মনে হয় একটা কাঠবেড়ালী যেন ক্ষিপ্র গতিতে উপরে উঠছে। এই পাকদণ্ডীর পথের পরে ঘোড়া ও খচ্চরের খুরের দাগ। ছুটু সেই দাগ ধরে দৌড়তে লাগলে।

ভগবান জানেন কতদিন আগে থেকে কালী মন্দিরের এই রাস্তা দুটি যেন দুটি দলের জন্য নির্ধারিত হয়ে আছে। সিঁড়ি দিয়ে পায়ে চলা যাত্রী যেত। পাকদণ্ডীর পথ দিয়ে ঘোড়া ও খচ্চরের পিঠে চেপে টুরিস্টের যাতায়াত। দুই রাস্তার মাঝে পাইনের বন। তার পাতা সিঁড়ি ও পাকদণ্ডীর পথে ঝরে ঝরে পড়ে।

ছুটু কিছুদূর পর্যন্ত পিছন ফিরে কায়াকে দেখতে লাগল। কায়া এখনও সিঁড়ির উপরে বসে। ছুটু দু'একবার কায়াকে চিৎকার করে ডেকেছিল। কিন্তু সে ডাক পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এসেছিল। ... কায়াকে দেখা যাচ্ছে না। খালি সিঁড়িগুলি দুপুরের রোদে ঝকঝক করছে। পরিষ্কার, ধপধপে সাদা থাক থাক সাজানো সব সিঁড়ি।

নভেম্বরের দুপুরে দুজনে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছিল। বাড়িতে বসে করবেটাই বা কি? মা তো বিছানায়! সেই রাতের পর থেকে তো তিনি বিছানা ছেড়েই আর ওঠেননি। মঙ্গতু খালি এঘর-ওঘর করে। একবার মিস্ জোসুয়ার বাড়ি গিয়েছিল ওরা। গেট বন্ধ। বাড়িটা দেখে মনে হয় যেন বহুদিন ধরে সেটা বন্ধই পড়ে আছে—কেউ সেটা খোলে না। লেটার বক্সটা ইংরেজি খবরের কাগজে ঠাসা। তার পাল্লা দুটো হাওয়ায় খটাস খটাস করে সশব্দে হাততালির মতো শব্দ তুলছে। রাতে এই শব্দ শুনলে মনে হয় যেন খবরের কাগজগুলো বদ্ধ পায়রার মতো বাইরে আসার জন্য ছটফট করছে। তাতেই অমন শব্দ হচ্ছে।

এই নিয়মবহির্ভূত দুনিয়ায় একমাত্র ধাইমা-ই আসেন। অন্তত সপ্তাহে একদিন। সঙ্গে পোঁটলায় বাঁধা মায়ের জন্য রাজ্যের বাদাম পেস্তা, মেওয়া, বিকট গন্ধযুক্ত শিকড়-বাকড়। ভোলুও আসত। এসবের দিকে তার মন নেই। সে নির্বিকার উদাসীন ভাবে বারান্দায় বসে থাকত। গলায় সেই গুনগুনানি! কায়া অবাক হয়ে ভাবে যে সেই এক রাতে ভোলু বারান্দায় বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে তার অশ্রুসিক্ত গালে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল—ভোলুর কি সে রাতের কথা মনে পড়ে? নাকি একেবারেই সে কথা তার মন থেকে মুছে গিয়েছে? ভোলু কায়ার দিকে এখন ফিরেও তাকায় না।

এই সময় মঙ্গতু হঠাৎ তার ঘরে একদিন এসে হাজির। "তোমাকে ধাইমা ডাকছেন কায়া—শিগগির। কয়েকদিন ধরেই উনি তোমার খোঁজ করছেন।" "আমাকে ডাকছেন?" কায়া অবাক হয়ে মঙ্গতুর দিকে তাকায়। ওর যেন মঙ্গতুর কথা বিশ্বাস হয় না। সেই রাতের বিশ্রী ব্যাপারের পর কায়া এত বেশি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে যে বাহ্য জগতে কি হচ্ছে না হচ্ছে, কেউ যে তার কথা ভাবতে পারে, সে খেয়ালও নেই তার। ধাইমার তো কথাই নেই। ভদ্রমহিলা ছোট্টখাট্টো বামন মানুষ। তাঁকে দেখে পরীর গল্পের জাদুকরীর কথা মনে পড়ে। তিনি অধরা। তাঁর যেন এক আলাদা জগৎ। সে জগতে কায়ার মতো মেয়েদের প্রবেশ নিষেধ। ধাইমা এ বাড়িতে এসেই কোন দিকে না তাকিয়ে সোজা মায়ের ঘরে প্রবেশ করেন।

এই রুটিন অবশ্য বরাবরের নয়। আগে যখন ধাইমা এখানে আসতেন, কখনও সিঁড়িতে, কখনও বারান্দায় তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে মস্করা করতেন--"এই যে! এ দেখি আমাদের কায়ারানী!" উনি কায়ার কপালে, মাথায় কি যেন লক্ষ করে দেখার চেষ্টা করতেন। তারপর যেন কায়াকে নয়, কোন অদৃশ্য শূন্যে লক্ষ করে কথা বলতেন —"তুই কত বড় হয়ে গেছিস সে কথা জানিস? লম্বায় আমাকেও ছাড়িয়ে গেছিস!" বুড়ি হাসত—"আরে তোকে তো আমিই এই এখানে নিয়ে এসেছি। কোত্থেকে বলত? হু ... ই পাহাড়ের পেছন থেকে। তুই একটা নালির মধ্যে পড়েছিলি একদম একা। এই এত্তোটুকু ছিলি।" ধাইমা তাঁর গায়ের চাদর থেকে হাত বের করে কায়ার ছোট্ট শরীর হাতে মেপে দেখান। কায়া তাঁর হাত দেখে শিউরে ওঠে। গাছের শুকনো খট্‌খটে ডালের মতো রোগা একখানা হাত। কায়ার কেন জানিনা মনে হয় যে এ হাত তাঁর আসল হাত নয়। এই শুকনো ডালের পিছনে তাঁর আসল তরতাজা হাত রয়েছে। সেই অদৃশ্য হাতই এই শুকনো খটখটে হাতকে পরিচালিত করছে। কায়ার মনে হয় ধাইমা বোধকরি তার মাথার উপর কোন অশরীরী জন্তুকে দেখতে পান। উনি এমন করে তার সঙ্গে কথা বলেন যেন মনে

হয় তিনি তার সঙ্গে নয়, সেই জন্তুটার সঙ্গে কথা বলছেন।

কায়া যন্ত্রচালিতের মতো মঙ্গতুকে অনুসরণ করলে। নিজের বাড়িটাকে তার এখন পরের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। মঙ্গতুর ভারী পায়ের চাপে কাঠের মেঝে মড়মড় করে উঠছে। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়াতে কায়ার বুক আশঙ্কায় কেঁপে উঠল। ঠিক! এ কথাটা তো মনে হয়নি! সে রাত্রে ধাইমা নিশ্চয়ই জানলার ধারে কায়াকে দেখে ফেলেছিলেন। ও এখনও ছোট। এসব ব্যাপার-স্যাপার বড়দের জন্যে। তার মোটেই এসব দেখা উচিত নয়। সে নিষিদ্ধ জিনিস দেখে ফেলেছে। এখন কষে তিনি বকুনি দেবেন। তা নাহলে মায়ের ঘরে তিনি তাকে ডেকেই বা কেন পাঠাবেন? কায়ার হঠাৎ ভয় ধরলে—বকুনি খাবার ভয়। একবার মনে হলো পিছন ফিরে চম্পট দিয়ে একেবারে বাড়ির বাইরে পালিয়ে যায়। মঙ্গতু হঠাৎ পিছন ফিরে দেখবে—কেউ নেই, সব ভোঁ ভাঁ। কিম্বা ছুটুর খাটের নীচে লুকিয়ে পড়ে। সবাই কিছুক্ষণ খুঁজবে, তারপর সব ভুলে মেরে দেবে। বড়রা খুব তাড়াতাড়ি সব ভুলে যায়, এই বাঁচোয়া! কিন্তু কি করে ভোলে? ও তো কিছুই ভুলতে পারেনা? ওর স্মৃতির সাজানো ঘরটি একেবারে অটুট।

কায়ার পালান হলোনা। গুটি গুটি পায়ে সে মায়ের ঘরের দিকে মঙ্গতুর অনুসরণ করতে লাগল। মায়ের ঘর বাড়ির একেবারে অন্যপ্রান্তে—কোণের দিকে। জঙ্গল সেখান থেকে খুব কাছে। বাতাস জোরে বইলে পুরো জঙ্গল যেন বাতাসের দোলায় দোল খায়। মায়ের ঘর থেকে মনে হয় জঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে যেন পাহাড়ও দোল খাচ্ছে। ইংরেজরা এর নাম তাই বোধহয় 'নড়ন্ত পাহাড়' রেখেছিল। এখানকার লোকেরা এই পাহাড়কে নড়ন্ত পাহাড় বলেই জানে। কিন্তু শীতের সময় এই পাহাড়ই অবিশ্বাস্য রকমের শান্ত রূপ ধারণ করে। নিজের ঘরের চৌকাঠ পেরোলেই এই শান্ত পাহাড় তার নজরে পড়ে। সে এত বেশি এই দৃশ্যে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে আজ মঙ্গতুর সঙ্গে যখন বাড়ির অপর দিকে সে এলো, মনে হলো যেন সে ভুল করে অন্য কোথাও এসে পড়েছে—কেননা সেই চিরপরিচিত শান্ত পাহাড় দেখা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ সে মায়ের ঘরের চৌকাঠেই কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। জানলা বন্ধ, তাই নড়ন্ত পহাড় দেখা যাচ্ছেনা। বারান্দার ঠিক সামনেই মায়ের বিছানা। এই জায়গায়ই সেদিন মা যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করে চিৎকার করছিলেন। এখন এখানে সূর্যের আলো এসে পড়েছে। মায়ের শরীরটা এখন নির্জীব পদার্থের মতো দেখাচ্ছে। ঠিক যেন একটা রক্তমাংসের পোঁটলা বিছানায় পড়ে রয়েছে।

"এখানে এসো মা এসো! হ্যাঁ, এই যে এদিকে। ভয় কি মা? এ তো আমি তোমার ধাইমা! হ্যাঁ, এদিকে বসো",—ধাইমা কায়ার কাঁধ ধরে খাটে মায়ের পায়ের ধারে বসিয়ে দিলেন। খাট নড়ে উঠতেই মা চোখ মেলে তাকালেন। তিনি কোন কথা না বলে কায়ার দিকে শুধু চেয়ে রইলেন। সে চোখে কোন উৎকণ্ঠা বা স্নেহের

পরশ ছিল না—কেমন যেন একটা উদাসীনতা ছিল, সে চোখের ভাষা কায়া পড়তে পারেনা। ধাইমার প্রায় ফিসফিস করা গলা শোনা গেল—"এই যে, এদিকে তাকাও, চেয়ে দেখ।" কায়ায় চিবুক ধরে তিনি প্রায় হ্যাঁচকা টান মেরে উপরে তুললেন। "কোথায় ঘুরে বেড়াস রে সারাটা দিন? আমাকে এড়াতে চাস? আমায় এড়িয়ে কি তুই পার পাবি রে মেয়ে?" ধাইমা দুলে দুলে হাসতে লাগলেন। হাসির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর থলথলে পেটটাও তালে তালে নাচতে লাগল। ধাইমার দেহের উপরের অংশে কোন চাঞ্চল্য নেই। কোমর থেকে পা পর্যন্ত সবুজ ঘাঘরায় ঢাকা। কিন্তু পুরো পেটটা হাসির দমকে নাচতে থাকে—এ এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! ওর হঠাৎ লামার কথা মনে পড়ে গেল। ধাইমা সম্বন্ধে লামা বলত যে তাঁর পেটের মধ্যে তিনটে মাংসপিণ্ড আছে, আর সেইজন্যই তিনি দৈর্ঘ্যে বাড়েন নি। হাসতে গেলেই মাংসপিণ্ড তিনটি পেটের মধ্যে ওঠানামা করে। পেটের মধ্যে যেন তারা লুকোচুরি খেলে। অবশ্য কায়ার কখনই সে দৃশ্য দেখা হয়ে ওঠেনি। মা'কে অনেকবার উলঙ্গ অবস্থায় সে দেখেছে—কিন্তু ধাইমাকে কদাপি নয়। ওর কেমন যেন মনে হয় ধাইমা কাপড় খুললেই মাংসপিণ্ড তিনটি বেরিয়ে আসবে আর থলথলে পেটটা সঙ্গে সঙ্গে ঝুলে পড়বে। সে এই প্রথম ধাইমার দিকে ভালো করে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলে।

ধাইমার হাত পরণের চাদরের মধ্যে লুকানো। ঘাঘরার উপরের দিকে চাঞ্চল্যের আভাস। মনে হয় চাদরের তলায় তিনি হাতড়াচ্ছেন, কিছু খুঁজছেন। একটু পরেই কায়ার কৌতূহলের নিরসন হলো। ধাইমার হাত চাদরের তলা থেকে আত্মপ্রকাশ করল। তাঁর হাতে একটা চুমকি বসানো লাল ভেলভেটের ছোট্ট থলে। তিনি তাঁর ছোট গোল থাবার মতো হাত আবার থলের মধ্যে ঢোকালেন। —"কায়া, জানিস, এ থলের মধ্যে কি আছে? ... এতে গলার মালা আছে।" ধাইমা ময়লা দাঁত বের করে হাসতে লাগলেন। কায়া তাঁকে এই প্রথম হাসতে দেখলে। আর তাইতেই তার ধাইমা সম্পর্কে সব ভয়, সমস্ত শঙ্কা কেটে গেল। নাঃ, তিনি জাদুকরী নন, তিনি ধাইমা, এই তো কেমন সাধারণ মানুষের মতন তিনি হাসছেন! তাঁর হাতে পলার মালাটা ঝুলছিল। —"ধর দেখি? এখানে, হ্যাঁ, এই লাল পুঁতি থেকে। আঃ ভয় পাচ্ছিস কেন? তোকে খেয়ে ফেলবে নাকি লো? ... নাও, এবার এটা ধরে তোমার মায়ের মাথার উপর মালাটা তিনবার ঘোরাও। গুণতে জানিস তো? বাঃ, এই তো! আমার কায়ারানীর কত বুদ্ধি! ব্যস, হয়েছে। এবার নীচের দিকে ওই একইভাবে মালাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছুঁইয়ে দাও তো! এই যে, প্রথমে দুই কাঁধ, গলা, এবার বুক, বুকের পর এই যে পেট, এবার দুই ঠ্যাঙ, সবশেষে পায়ের পাতা ... আরে ঘোরা ঘোরা, মালা ঘুরিয়ে যা। দেখিস্, কোনও অঙ্গ যেন বাদ না পড়ে।"

ধাইমার নির্দেশ পালন করে চলে কায়া—লক্ষ্মী মেয়ের মতো। ও যখন মায়ের

সর্বাঙ্গে মালাটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ছোঁয়াচ্ছিল, মা ডলপুতুলের মতো পিট্‌পিট্‌ করে তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। রোদে থলের চুমকিগুলো ঝলসে উঠছে, চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে। ধাইমার একঘেয়ে স্বর শুনে মনে হচ্ছে যেন একগাদা মাছি ভ্যানভ্যান করছে। ... অনেক বছর অবধি এই দৃশ্যটি কায়ার চোখে ভাসতো। ঠিক যেন স্বপ্নে দেখা কোন ঘটনা। ঠিক স্বপ্নও নয়, এ যেন গতজন্মের ঘটনা, অতীতের কালো পর্দা থেকে বর্তমানের প্রেক্ষাপটে উঁকি মারছে। ছোটবেলার এইসব রহস্যজনক ব্যাপারগুলো মনে পড়লেই সে অভিভূত হয়ে ওঠে। দুপুরের রোদ্দুর, জানলার ওপিঠে তন্দ্রাচ্ছন্ন পাহাড়, মায়ের হ্যাংলা, কুঁচকে যাওয়া দেহ আর তার উপর ঘুরন্ত মালা—কী অদ্ভুত অলৌকিক এক পরিবেশ!

"তোর মা মাগী তো মরতে মরতে বেঁচে উঠল রে!" ধাইমা কায়ার হাত নিজের হাতে টেনে নেন। তার হাতের চেটোয় তিনি আঙুল বোলাতে লাগলেন। কায়ার সুড়সুড়ি লাগল।

—"দেখছিস তো? এই মালার অনেক গুণ, প্রচুর ক্ষমতা। তোর মায়ের উপর দুষ্ট গ্রহ ভর করেছিল। এই মালায় সব টেনে নিয়েছে। এখন আর কোন ভয় নেই। আর একটা কথা মন দিয়ে শোন্।" ধাইমা হাতের মুঠি খুললেন। পলার মালাটা তাঁর হাতের মুঠোয় একটা ছোট্ট কুণ্ডলী-পাকানো সাপের মতো দেখাচ্ছে। কায়ার মনে হলো সেটা যেন তার ছোট্ট লাল জিভ বের করে ফুঁসছে।

—"কালী মন্দির চিনিস তো? যেখানে তুই আর লামা চোর চোর খেলতি? আরে, আমি তোদের সব ব্যাপার-স্যাপার জানি।" ফোকলা মুখে তিনি হাসতে লাগলেন। তাঁর দন্ত বিহীন মুখটা বিরাট একটা অন্ধকার গহ্বরের মতো দেখাচ্ছে। — "শোন্, পুরুত ঠাকুর যেন দেখতে না পান। কেউ যেন না দেখে ... এই মালাটা মা কালীর শ্রীচরণে ফেলে আসিস। কি পারবি না? পারবি, নিশ্চয় পারবি, তাই নয়? এ আমার লক্ষ্মী পুতুল সোনা।" ধাইমা হাসতে গিয়ে হঠাৎ চুপ মেরে গেলেন।"— "আঃ, কেন ওকে মিছিমিছি ভয় দেখাচ্ছ, বল তো?" মা হঠাৎ কথা বলে উঠলেন। তিনি বিছানার উপর উঠে বসেছেন। জোরে জোরে তাঁর নিঃশ্বাস পড়ছে, দুর্বল বুকটা দ্রুত ওঠানামা করছে। তিনি কায়ার মাথাটা দুই হাতে টেনে নেন—"তোর আপত্তি নেই তো? ভয় করবে না তো? না হয় ছুটুকে সঙ্গে নিস ... আমার কিছু হবে না রে ...।" মায়ের গলার স্বর কাছে এসেও যেন অনেক দূরে বাতাসে ভেসে যায়। সেই রাতের পর, যে রাতে তিনি তাকে কাকার বাড়ি যাবার কথা বলেছিলেন, আজ কায়ার সঙ্গে আবার কথা বললেন। আদর করে তাকে স্পর্শ করলেন। মায়ের স্পর্শে কায়ার বহুদিনের সঞ্চিত অবরুদ্ধ বিষণ্ণতা অশ্রু হয়ে গলে গলে ঝরে পড়তে লাগল। শায়িতা মায়ের দেহের উপর মুখ রেখে সজল চোখে সেও পাশের পাহাড়ের

দিকে তাকালে। রোদে পাহাড় ঝকঝক করছে। কিন্তু কায়ার মনে হলো পাহাড়ও যেন মুভিং হিলস হয়ে তার অশ্রু সজল দেহের সঙ্গে সঙ্গে, তালে তালে নড়ছে।

... পলার মালাটা এখন কায়ার ছোট্ট হাতের মুঠোর মধ্যে ঘামে চটচট করছে। ছুটু অনেকবার বন্ধ হাতের মুঠির দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়েছে, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস তার হয়নি। ছুটু যদি একটু কৌতূহল দেখাত, হয়তো কায়া মুঠো খুলে ছুটুকে মালাটা দেখিয়েই দিত। এমনকি ধাইমা তাকে যা যা বলেছেন —সে-স-ব ছুটুকে বলে দিত। সব কথা ওকে ও বলবে। সব কথা বলে ভয় ও রহস্যের প্রাচীর ভেঙে সে ছুটুকে নির্ভয়ে দেবী কালীর শ্রীচরণে নিয়ে গিয়ে হাজির করবে। এই চণ্ডিকা কালী সম্বন্ধে তার অপার কৌতূহল!

না, মা কালী সম্পর্কে তার কোন ভয় বা শঙ্কা নেই। ও শুধু ভয় পাবার অভিনয় করে। শীতের লম্বা ফাঁকা দুপুরে, যখন ও একেবারে একা থাকে, বাবুও দিল্লী চলে যান—বাধা দেবার কেউ থাকে না—কায়া প্রায়ই ঘরের পিছন দিকের ঝুল-বারান্দায় গিয়ে চোখ মুদে বসে থাকত। ছোট্ট কাঠের বারান্দাটা বাতাসে নড়ত। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যেত। —"হে মা চণ্ডী, মা কালী, দয়া করে একবার দেখা দাও, তোমার দর্শনের আশায় হা-পিত্যেশ করে বসে আছি মা! দয়া করো। তোমার কৃপার কণামাত্র পেলে আমি সব কিছু, সবাইকে ত্যাগ করতে পারি মা, তোমার অনুজ্ঞায় আমি সর্বত্র যেতে প্রস্তুত!" কায়ার ঠোঁট কেঁপে উঠত। মন বলত আরও আরও কষ্ট করলে মা কালী সন্তুষ্ট হয়ে দর্শন দেবেন। অভিনয়ের ভঙ্গিতে, খেলার ছলে সে প্রার্থনা শুরু করত। কিন্তু এক সময় তা অভিনয় ছাড়িয়ে সত্য হয়ে উঠত। সে তখন নিজের উপরেও নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলত। ও এরপর একে একে তার ফ্রক, পেনী, সালোয়ার সব খুলে ফেলত। একেবারে উলঙ্গ হয়ে সে আকুল হয়ে প্রার্থনা করত—"মা চণ্ডী দেখ, আমি শুধু মুখে বলিনা, কাজেও করে দেখাই। আমার এখন আর কোনও বন্ধন নেই—তুচ্ছ কাপড়েও নয়—আমার এখন আর তুমি ছাড়া কেউ নেই। আমি সম্পূর্ণভাবে তোমাতে নিজেকে সমর্পণ করলাম।" মাঝে মাঝে সে একটা চোখ খুলে পিটপিট করে নিজের পরিত্যক্ত জামা-কাপড়ের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত, দেখে তার নিজের উপরেই গর্ব বোধ হতো। ... সোঁ সোঁ করে হাওয়া বইলে তার নগ্ন দেহ শিরশির করে উঠত। এখন যদি আমার অসুখ করে, নিউমোনিয়া হয় তো বেশ হয়। মরে গেলে তো আরও ভালো—মা কালী দেখবেন, তাঁর সাধনাতেই আমি নিজের জীবন সমর্পণ করলাম। সে তার শরীরে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগল। এ হাত যেন তার নিজের নয়—মা কালীর। সে কত বড় ভক্ত! উলঙ্গ হয়ে, বাইরে

ঠাণ্ডায় বসে রয়েছে। চুল খুলে পড়েছে, তার হাত গলা থেকে নেমে ধীরে ধীরে তার ছোট্ট দুটি বুকের উপর নেমে আসে, নখ দিয়ে সে খামচায়—যেন একটা নেশায় পেয়ে বসে তাকে। ... কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু তার অভিনয় জগৎ শেষ হয়ে যায়। বাস্তব জগতে ফিরে এসে নিজেই নিজেকে তিরস্কার করে—"ছি ছি কায়া, তোর লজ্জা করল নারে? এতবড় হয়ে বাচ্চাদের মতো এই অসভ্যের খেলা খেলছিস?" এবার ওর মনটা ঠিক সুইচের মতোই মা কালীর দিক থেকে অফ্ হয়ে তার নিজের সমালোচনায় অন্ হয়ে যায়।

চোখ মেলে তাকিয়ে-লজ্জায় জিভ কেটে সে তাড়াতাড়ি নিজের কাপড়-চোপড় কুড়িয়ে নিয়ে পরতে আরম্ভ করে। আবার তার মনটা নৈরাশ্যে ছেয়ে যায়—কোথায়? কোনখানে চলে গেলেন তিনি? পাহাড়িয়া রোদে বসে শীতে কাঁপতে কাঁপতে সে ভাবে—নাঃ, আমি আছি, এই বর্তমান সময়ের সীমানার মধ্যেই আছি। আমার কখনই কিচ্ছু হবে না—কক্ষনো কোন অসুখ করবে না।

... ছুটু মন্দিরের সামনে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দেখে কায়া নেই—মন্দিরের চত্বর বা সিঁড়ি কোথাও না। বাব্বাঃ, ও এত তাড়াতাড়ি ছুটতে ছুটতে পাকদণ্ডী পার হয়ে এলো, তবুও ওকে কায়া হারিয়ে দিয়ে আগেভাগেই মন্দিরে পৌঁছে গেল। ছুটু কিছুক্ষণ থ' হয়ে দাঁড়িয়ে রইলে। মন্দিরের আনাচে-কানাচে কাপড়ের টুকরো পত্‌পত্ করে পতাকার মতো উড়ছে। আশপাশের গ্রাম থেকে দর্শনাভিলাষী যাত্রীরা এসে মনস্কামনা পূর্ণ হবার প্রার্থনা জানিয়ে কাপড়ের ফালি বেঁধে রেখে যায়। এই টুকরোগুলি যেন তাদের দেবীদর্শনের সাক্ষ্য বহন করছে। কাপড়ের ফালিগুলো রোদে-বৃষ্টিতে ও বরফে বিবর্ণ হয়ে গেছে—শুধু তার পত্ পত্ করে ওড়ার শব্দটুকুই জীবন্ত হয়ে আছে।

ছুটু মন্দিরের শূন্য প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়ালে। উপরে একটা বড় ঘণ্টা টাঙানো রয়েছে, যার ঢং-ঢং শব্দে পাহাড়ে গুঞ্জন ওঠে। যখন ঘণ্টা বাজে, তখন ছুটু একবার ঘণ্টা ও একবার পাহাড়ের দিকে তাকায়। শব্দটা যেন একসঙ্গে দুদিক দিয়েই আসে। নীচে জঙ্গলের সড় সড় শব্দের দীর্ঘশ্বাস শোনা যাচ্ছে। ছুটু যেন শহরের অ-নে-ক উপরে প্রায় আকাশের কাছে দাঁড়িয়ে। নীচে জঙ্গলের মর্মরধ্বনি, উপরে উন্মুক্ত আকাশ—ব্যস আর কিছু নেই। তার বাড়ি ক-ত্তো নীচে! জঙ্গলে সড় সড় শব্দ উঠলে মন্দিরটা আরও নির্জন হয়ে ওঠে। তখন ছুটুর সমস্ত সৌন্দর্যবোধ, আনন্দ লোপ পায়। ও ভুলে যায় যে কায়া মন্দিরের অভ্যন্তরে রয়েছে আর সে বাইরে তার জন্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

ছুটু মন্দিরের চাতাল থেকে নেমে এসে মন্দির পরিক্রমা করলে। তার নিজেকে কেমন যেন এখন বোকা বোকা লাগছে। সে এসময় এমন একটা বয়সে এসে পৌঁছেছে যেখানে বড়দের কিছুদূর পর্যন্ত সঙ্গ দেওয়া যায়। কিন্তু তারপরই তাদের

নাগাল পাওয়া ভার হয়। সে যেন অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। এ যেন ঠিক দরজার কাছ পর্যন্ত তার হাত ধরে এনে, তাকে চৌকাঠে দাঁড় করিয়ে অন্দর মহলের দরজা বন্ধ করে দেওয়া! অন্দরে তার প্রবেশ নিষেধ! তাকে উপেক্ষা করা হয়—যদিও কায়ার ব্যবহারে কখনই উপেক্ষা প্রকাশ পায়নি। ছুটু অবশ্য এ নিয়ে বিশেষ ভাবে না। সে শুধু ছায়ার মতো কায়ার পিছন পিছন ঘোরে। এক এক সময় রাতে ঘুম ভেঙে যখন দেখে যে ঘরে সে একা শুয়ে আছে, কায়া কখন ওকে ফাঁকি দিয়ে মঙ্গতুর কোয়ার্টারে পালিয়েছে তখন ভয়ানক অপমান ও একা বোধ করলেও সে এই ব্যবস্থাকে নির্বিবাদে মেনে নেয়। কোন ব্যাপার বা ঘটনা একবার ঘটে গেলে সেটাই তার কাছে সহজ নিয়মে দাঁড়িয়ে যায়। ছুটুর কোনও প্রত্যাশা নেই—কায়ার কাছে তো নয়ই। কায়ার অনুপস্থিতিতে কায়ারই সঙ্গে কল্পনা করে ছুটু সময়টা দিব্যি কাটিয়ে দেয়। এ যেন ঠিক কুকুরের হাড় চিবানোর মতো! এ হাড়ে মাংস নেই, কিন্তু তাতে অদৃশ্য মাংসের স্বাদ লেগে রয়েছে।

মন্দিরের গহ্বরে প্রবেশ করে ছুটু দেখল কায়া প্রতিমার সামনে একেবারে পাথরের মতো বসে রয়েছে—নট নড়ন-চড়ন নট কিচ্ছু! ও ভয়ে ভয়ে দু'একবার দেখার চেষ্টা করলে—"কায়া, এই কায়া!" কিন্তু তার ডাকে পুরুতের ঘুমের যেমন কোন বিঘ্ন ঘটলো না, তেমনই কায়ারও কোন তাপ-উত্তাপ হলো না। পিছন ফিরে একবার দেখলেও না—আগের মতোই তার প্রস্তরবৎ ভঙ্গি! ছুটুর ডাকের জবাবে শুধু ছাতের উপর খট্‌খট্ করে শব্দ হলো। পাহাড় অঞ্চলের মর্কট-বাহিনী বোধকরি ছুটুর কথার জবাবে সাড়া দিয়ে মহানন্দে এক কড়িকাঠ থেকে অন্য কড়িকাঠে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে হুল্লোড় করতে লাগল।

হঠাৎ পিছনে কেউ ঘণ্টা বাজালে। ছুটু একদৌড়ে খোলা উঠোনে এলো। নিশ্চয়ই কেউ এসেছে। ঘণ্টা বাজিয়ে দেবীর কাছে তার আগমন বার্তা জানাচ্ছে। ... নাঃ, কেউ আসেনি। বাতাসের দোলায় ঘণ্টা বেজে উঠেছে। ধ্যাৎ তেরি, ভাল্লাগেনা! কেউ নেই ... শুধু হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ। মন্দির অব্দি আসতে গিয়ে সে হাওয়াও যেন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে। ছুটুর আবার ভয় ধরল। ভয় কাটতেই যেন সে মন্দিরের চৌকো চৌকো খোপে খেলতে লাগল। এক একটা খোপে ও এক একটা জায়গা চিহ্নিত করে রাখে; এই খোপটা মীরাট—এখানে লামা থাকে, এটা দিল্লী—বাবুর থাকার জায়গা। উঠোনের কোণের দিকের পাথরটা সামার হিল। সামার হিলে গিয়ে ছুটু মনে ভাবে—এই তো, কাকার বাড়ি! এখানে বিরু থাকে। আর দিনকয়েক পরে গিয়ে কায়াও সেখানে থাকবে।

কায়া চলে যাবে! ভাবতেই ওর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ওর পা শিথিল

হয়ে এলো। দিল্লী থেকে ফেরার পথে সামার হিল স্টেশন পড়ে। এখানে গাড়ি ঠিক তিনমিনিট দাঁড়ায়। সামার হিল এলেই সে ও কায়া গাড়ি থেকে মাথা বের করে ঝুঁকে পড়ে সামার হিল স্টেশনটা দেখত। মনে হতো, এই তো—এই গাছের ঘন অরণ্যের ঠিক পিছনেই তো কাকার বাসা।

গাড়ি চলতে শুরু করার পরেও দু'ভাইবোন সেই ঘন জঙ্গলটাই ঝুঁকে ঝুঁকে দেখত। এরপর সুড়ঙ্গের মধ্যে ট্রেনটা ঢুকলেই—ব্যস, সব অন্ধকার, কাকার বাড়ি অদৃশ্য।

কায়া চলে যাবে—এই কথাটা ছুটুর মনের মধ্যে কাঁটার মতো খচ্ খচ্ করে ওঠে। তা মনের মধ্যেকার লুকানো শঙ্কাটা যেন বহুরূপীর মতো রঙ বদলে বদলে তার সঙ্গে নানা ছলনা করে। ছুটু এখনও অনেক কিছুই জানে না। সে জানে না, বড়রা যাকে মৃত্যু বলে থাকে, সেই মৃত্যুর স্বরূপ কি? কিন্তু কেউ চলে গেলে পর মনে যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়, অভাববোধ জন্মায়, সে মৃত্যুর মতোই কষ্টকর। ছুটুর বয়সী ছেলেরা এই অভাববোধটাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এই বেদনা একটা অদৃশ্য জালের মতো হাওয়ায় ভেসে ভেসে তাদের একবার ছুঁয়েই অদৃশ্য হয়ে যায়। একে ভালো করে বোঝা যায় না, ধরা যায় না। এই জাল সরে গেলে সব বিস্মরণ হয়ে যায়। নিঃস্ব দুপুরের রিক্ততায় তার কান্না পেয়ে যায়। কিন্তু এক অনির্বচনীয় ক্রোধ যেন সেই ঠেলে আসা কান্নাকেও ঠেকিয়ে রাখে। .... ছুটু তার খেলাঘরের 'সামার হিলের' উপর দাঁড়িয়ে চেঁচায়—"এই কায়া, এই পেত্নী!"

কায়া কষে নিজের চোখ বন্ধ করে বসেছিল।

তার চোখের সামনে লাল-নীল নানা রকমের রঙের খেলার মধ্যে ছুটুর চিৎকার ঘুরে ঘুরে ফিরছিল। তার চেঁচানিতে মা কালীর মুখটা ধ্যানচ্যুত হয়ে পড়ছিল। ... 'ইচ্ছে করছে বাইরে বেরিয়ে পাজিটার মুখ খিমচে রক্তারক্তি করে দিই"—কায়া মনে মনে দাঁত কিড়মিড় করে উঠলে। হঠাৎ সে মা কালীর মুখে স্মিত হাসি দেখতে পেলে। যেন ছুটুর চিৎকারের শব্দগুলির এক একটা তিনি তাঁর গলার মুণ্ডমালার সঙ্গে গেঁথে নিচ্ছেন। কায়ার মন হঠাৎ করে শান্ত হয়ে উঠল। ঘামে ভেজা হাতের মুঠি সে একবার খুলে দিলে। গলার মালাটা তার মুঠোর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ঘামে নেতিয়ে পড়েছে। ধাইমার কথাগুলি তার একে একে মনে পড়তে লাগল। মায়ের রহস্যময় অসুখ, শ্বাস কষ্টে বুকের হাপরের মতো ওঠানামা করা, বিস্তৃত নগ্ন উরুর মধ্যবর্তী একটি রক্তমাংসের শিশু—সবকিছু যেন মালার এক একটি পুঁতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। সে আজ মায়ের এক একটি কষ্ট সংগ্রহ করে মালার মধ্যে ভরে নিয়ে মা কালীর শ্রীচরণে বিসর্জন দিয়ে যাচ্ছে—

এই কথাটা কেউ জানতে পারবে না। মা কালী পরম স্নেহে এই দুঃসহ যন্ত্রণার মালাটি গ্রহণ করে তাদের সবাইকে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও শীতের অসহনীয় কষ্ট থেকে চিরদিনের মতো মুক্ত করবেন। ... হঠাৎ একটা ছপছপ শব্দে কায়ার ধ্যানভঙ্গ হলো। চোখ খুলে দেখলে যে তার হাতের চেটো প্রবলভাবে কাঁপছে, শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। এতক্ষণে তার উৎকণ্ঠা ও ভয় দূর হয়ে শীত করতে শুরু করেছে। গাছের ডাল তুষারপাতের সময় যেমন থরথর করে কাঁপে, তেমন করেই মায়ের অসুখের গুরুভারে আবিষ্ট মালাটি দেবীর চরণে অর্পণ করার সময় কায়ার হাতও বেতসলতার মতোই বেপথুমান হয়ে পড়ল। সে তার ক্লান্ত চোখদুটি তুলে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলে। বাসি ফুল, বাতাসা ও সিঁদুরে পরিবেষ্টিতা মা কালী এখন নিস্তব্ধ, নিঃসঙ্গ ও একাকী দাঁড়িয়ে। তাঁর চোখে উৎকণ্ঠার কাতর অসহায় দৃষ্টি। পায়ের তলায় সদ্য সমর্পিত কুণ্ডলী পাকানো ছোট্ট লাল বিষধর মালা —মায়ের কষ্টের সমস্ত বিষ টেনে নিয়ে তাঁর চরণে আশ্রয় গ্রহণ করেছে। তার গায়ে এখনও কায়ার ছোট্ট হাতের ঘামের জলকণা লেগে রয়েছে। কায়া তার হাত মেলে ধরলে। হাতে বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া লাগছে। —"কায়া, ওরে, ও কায়ারে! এই বাঁদরী কায়া" নানা সম্ভাষণে ছুটুর ডাক আবার ভেসে আসে।

ছুটুর ডাক সহসা মৃদু হতে মৃদুতর হয়ে এলো। মনে হলো মন্দিরের দেওয়াল যেন ছুটুর আহ্বান শুষে নিচ্ছে। সে হঠাৎ উপলব্ধি করলে এ আহ্বান ছুটুর হতে পারে না—এ ডাক বাইরে থেকে আসছে না—এর উৎপত্তি এই মন্দিরেরই গহ্বরে—যে ডাকের প্রতীক্ষা সে দিনের পর দিন তাদের ছোট্ট সরু ঝুল বারান্দায় ঠায় বসে থেকে করেছে! এই ডাকে মন জুড়িয়ে যায়—এতে পরম নির্ভরতা ও সান্ত্বনার আশ্বাসবাণী রয়েছে! এ ডাক হয়ত চর্মকর্ণে শোনা যায় না, কিন্তু শরীরের সমস্ত শিরা-উপশিরা দিয়ে একে উপলব্ধি করা যায়। না—এ ডাক আমি কিছুতেই হারিয়ে যেতে দেব না। যদি কোনওদিন, ভুল করেও লামা মীরাট থেকে এখানে আবার ফিরে আসে, আমায় দেখে সে চমকে যাবে। আমার পরিবর্তনে সে বোধকরি মূক হয়ে যাবে। মন্দিরের গহ্বরে দুপুরের মুছে যাওয়া আলোয় দাঁড়িয়ে কায়া তার মধ্যে আর এক নতুন কায়ায় অস্তিত্ব অনুভব করে। এই নতুন কলেবরের কায়া সকলের চোখ এড়িয়ে পুরানো দেহ থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়েছে। এই কায়াই মাঝরাতে খোলা বারান্দায় একা নির্বিকার ও উলঙ্গ হয়ে শুয়ে থেকেছে। এই কায়ার সঙ্গে পুরানো কায়ার কোন যোগসূত্র নেই—এ কায়া নিশ্চল, উদাসীন ও একাকী, নির্বিকার অন্য আর এক কায়া। এক কায়া অন্য কায়ার শরীরের আবাহন যেন শুনতে পায়। এই শরীরে নেই কোন চিন্তার লেশ, আছে শুধু এক অদ্ভুত সহজাত

বোধ যা একটি বন্য জন্তুর মতোই নিজের পরিবর্তন আপনা আপনি টের পায়।

হঠাৎ কায়া আবার বর্তমানে ফিরে এলো। এতক্ষণে সে উপলব্ধি করে, যে এই মায়ার পরে মোহ এবং মোহের শেষে এক অদ্ভুত ও অপরিসীম আতঙ্ক যেন তার গতি রোধ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে—এরপর আর তার যাবার রাস্তা নেই। এ যেন তার পর্বতারোহণের অভিযান। কয়েক পা এগিয়ে পথের শেষে এসে সে দিক্‌ভ্রষ্ট হয়ে পড়েছে, মাথা ঘুরে শ্বাসরোধ হয়ে গেছে। এক অজানা ভয়ে সে তার আতঙ্কের বোঝা সেখানেই নামিয়ে দিয়ে আবার তার চিরপরিচিত জগতে ফিরে আসে, একেবারে সিঁড়ির কাছে যেখানে ছুটু তার অপেক্ষায় বসে রয়েছে।

বাইরে বেরিয়ে এসে কায়া দেখলে যে দুপুরের রোদ মরে গিয়েছে। মন্দিরে সিঁড়ির গায়ে গাছের ছায়া এসে পড়েছে। ছুটু সেখানে চুপচাপ বসে। বেশ বোঝা যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে ও রাগে ফুঁসছে। কায়া চুপটি করে ছুটুর পাশে বসে পড়লে। দুজনেই চুপচাপ, শুধু সোঁ সোঁ করে বাতাস বইছে। একটু পরে কায়া আস্তে করে জিজ্ঞেস করে—"ঘুমোচ্ছিস ভাই?" —ছুটু কোন উত্তর দিলেনা। কায়া মৃদু হেসে ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে—"আমরা বড্ড দেরি হয়ে গিয়েছে নারে?" ছুটু নিরুত্তর। রাগে ও গরগর করছে। অবশ্য এখন আর একাএকা বোধ হচ্ছে না। একটু পরে বললে—"এতক্ষণ কি করছিলে বসে বসে?" —ছুটুর মাথায় কায়ার বিলি করা হাত থেমে গেল।

—"শুনছিলাম।" কায়া জবাব দিলে।

—"আমার ডাক শুনতে পেয়েছিলে?" ছুটু এবার আগ্রহ দেখায়।

—"তুই একটা আস্ত পাগল! এভাবে কেউ চেঁচায়?"

ছুটু অভিমান ভরে কায়ার হাত ঠেলে সরিয়ে দিলে। ইচ্ছে করল কায়াকে ফেলে রেখেই তর্ তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে যায়। কিন্তু, আবার তো সেই একা পড়ে যাওয়া! নিঃসঙ্গতাকে ওর বড় ভয়। তাই সে জোর করে অভিমান দূরে ঠেলে দিলে।

—"আমি এখানে খেলছিলাম।" ছুটু এবার নরম স্বরে বলে।

—"আচ্ছা।" —কায়া পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ছিল।

—"ওই যে, ওখানে খেলছিলাম। পাথরের খোপগুলোকে এক একটা শহর ভেবে নিয়ে শহরের মধ্যে খেলছিলাম।"

—"আমি শুনতে পাচ্ছিলাম।" কায়া বলে—"মন্দিরের ভিতরে বসে সব শোনা যায়।" কায়া আরও অনেক কিছু বলতে গিয়েও চুপ করে যায়। ইচ্ছে করল বটে ওকে সব বলে দেয়। পলার মালা, সেটা হঠাৎ কেমন করে অদৃশ্য হয়ে গেল, মা কালী কেমন করুণ, নির্বাক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুখ দিয়ে তার একটা কথাও বের হলো না। মনে হলো কথাটা গোপন থাক —দেবী মা ও তার মধ্যেই কথাটা গুপ্ত হয়ে থাক। এ যেন তাদের দুজনের মধ্যে এক বন্ধন সেতু!

বাইরের কারুর সাধ্যি নেই যে সেটা ভেদ করে ভিতরে ঢোকে!

সিঁড়ির কাছটা এখন একেবারে নির্জন। সামনের জঙ্গলে এক এক সময় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হচ্ছে। যেন কেউ নিস্তরঙ্গ জলে ঢিল মারছে। গাছের কচিপাতা অঙ্কুরের মতো হঠাৎ খুলে ছড়িয়ে পড়ে আর তার মধ্যে থেকে হতবুদ্ধি পাখির দল বেরিয়ে এসে গাছের চতুর্দিকে চক্রাকারে ঘুরতে থাকে।

—"বাড়ি যাবেনা নাকি?" ছুটুর এমার শীত করতে শুরু করেছে।

—"যাচ্ছি।" উদাসভাবে কায়া বলে। কিন্তু সে নড়ে না। সিঁড়িতে চিন্তামগ্ন হয়ে বসে থাকে। উপরে মন্দিরে ঘণ্টা বাজছে ... তার রেশ নির্জন পাহাড়ের প্রান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে।

—"ছুটু, আমার একটা কথা রাখবি ভাই?"

—"কি কথা রে কায়া?"

—"আমি চলে গেলে পর আমার জিনিসপত্তর সামলে-সুমলে রাখবি তো?"

—"গতবছরের মতন?" ছুটু উৎসাহিত হয় ওঠে। কায়া অনেকক্ষণ এক দৃষ্টে ছুটুর দিকে তাকিয়ে থাকে। তারপর তার কাঁধে মাথাটা এলিয়ে দেয়।

—"তুমি কবে ফিরবে কায়া?"

—"একমাস পরে। বাবু যখন দিল্লী থেকে ফিরবেন, তার সঙ্গে আসব।" কায়া মৃদু স্বরে বললে। সে এত ধীরে কথাটা বললে, মনে হলো যেন এক ঘড়া টইটম্বুর জলের মতো আশায়-বিশ্বাসে ভরা গাগরীটি সে বহন করে চলেছে অতি সন্তর্পণে, যাতে এক ছলকও উপছে না পড়ে। কাকার বাড়িতে একমাস থাকা মানে বিস্তৃত মরুভূমিতে একেবারে একা অনেক দিন ধরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা। কিন্তু বাবুর আসা? সে একটি প্রত্যাশিত ঘটনা বই কিছু নয়। সিমলা-দিল্লীর দূরত্ব যেন কায়ার আয়ত্তের মধ্যে। এর সঙ্গে তার নিজের ঘর, নিজের জিনিসপত্র—সবই তার একেবারে নিজস্ব। এই দিল্লী-সিমলার কল্পনা করে বা তার নিজস্ব অধিকারভুক্ত পরিধির স্মৃতিভাণ্ডার নিয়ে সে অনায়াসে মরুভূমিতে একা একা এই একমাস কাটিয়ে দিতে পারে।

—"আমার জিনিসপত্তর ভালোভাবে রাখতে পারবি তো?"

—"হ্যাঁ, কিন্তু কখনও লামা এসে যদি চায়, তা'লে?"

কায়া মাথা তুলে বাইরে দেখলে। অক্টোবরের আসন্ন রোদ পাহাড়ে পাহাড়ে রঙ ছড়িয়ে ধীরে ধীরে অস্তাচলের পথে নেমে যাচ্ছে।

—"লামা আর এখানে কোনদিনও আসবে না।" কায়া এত আস্তে কথাটা বললে যেন সেটা ছুটুর কানে না যায়। কিন্তু ছুটু বিচলিত হয়ে পড়ল।

কায়া যেন তার নিজের জিনিসপত্রের ভার তার উপর ফেলে দিয়ে চিরদিনের মতো বিদায় নিতে চলেছে। বস্তুত কায়ার কাছে সময়ের একটা নির্ধারিত সীমা আছে

—দিন, রাত, মাস, বছর—এতে সময় বেশ গাড়ির চাকার মতো গড়গড়িয়ে চলে। কিন্তু ছুটুর কাছে সময়ের কোন বাঁধাধরা মাপ নেই—এ যেন এক অঢেল অনন্ত সময়! এই সময়ের মধ্যে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সেটা একটা অবশ্যম্ভাবী সত্যে পর্যবসিত হয়ে পড়ে। একবার ঘটে যাওয়া মানেই তার চিরস্থায়িত্ব কায়েম হওয়া। তাই ছুটু যেন সান্ত্বনা পায় না—সান্ত্বনা পাবার মতো, একা পথ চলার মতো, বিশ্বাসকে বেঁধে রাখার মতো তার কাছে যথেষ্ট পাথেয় নেই।

ছুটুর বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল, কান্না ঠেলে বেরুতে চাইল! কায়া এক ঝটকায় তার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নিল। ছুটুর বড় বড় চোখ দু'টো জলে ভাসছিল।

—"বোকা ছেলে। আমি তো শিগগিরই আবার ফিরে আসব। দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।" ... কায়াও ছুটুর বিষাদে বিষণ্ণ বোধ করে। ঘনিয়ে আসা সন্ধ্যার অন্ধকারে ছুটুর ছলছলে চোখের দিকে চেয়ে আবার বললে—

—"তুই জানতেও পারবি না কোথা দিয়ে সময় কেটে যাবে।"

—"কাকা কি তোমায় আর আসতে দেবেন?" একক্ষণে ছুটু সহজভাবে কায়ার দিকে সোজাসুজি চোখ তুলে কথা বলে।

—"না দেবার কি আছে?" কায়ার স্বরে যুগপৎ রাগ ও বিরক্তি—"বাবুকে কি তিনি বাধা দিতে পারবেন?"

—"বটেই তো", ছুটু মনে মনে বললে, "বাবুকে বাধা দেবার সাধ্যি কারুর নেই।" এর আগেও তিনি দিল্লী থেকে ফেরার পথে কাকার বাড়ি থেকে কায়াকে নিয়ে বাড়ি ফিরতেন। সে বারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাদের যাওয়া দেখত। বাবু পিছনে থাকতেন আর কায়া তাঁর ছড়িটাকে ধরে সামনে এগিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটত। এই দৃশ্যটি সে একমাস চোখের সামনে ধরে কাটিয়ে দিত। এই দৃশ্যটি তার পক্ষে একটা মাইলস্টোন ছিল। এই মাইল স্টোনটা শেষ হলেই আবার বাড়িটা যেন বাড়ি বলে মনে হতো। বাবুর ঘর, কায়ার আলমারী—আবার খোলা হতো আর মঙ্গতু শীতের প্রথম রাতে ঘরে ঘরে আগুন জ্বেলে রাখত।

—"তুমি চলে গেলেই বরফ পড়া আরম্ভ হবে।"

এবার কায়া হেসে ফেললে—"তুই কি করে জানলি?"

ছুটুর মনে পড়ে গেল, গতবছর ঠিক এমনটিই ঘটেছিল। অবশ্য তুষারপাত নয় —কায়ার শূন্য শয্যা! রাতে এক এক সময় সে চমকে বিছানার উপর উঠে বসত। বাইরে তুষারপাতের শীতলশুভ্রতা দেখে ওর মনটাও শূন্য হয়ে যেত। মনে হতো বাড়িতে কেউ নেই—এই নিঃসীম, হিমশীতল শুভ্র রাতে সে একাই শূন্য ঘরে জেগে

বসে রয়েছে। এই স্মৃতি তার মনের গহনের বোবা অন্ধকারে এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসে গিয়েছে যে কায়াকে এ বিষয়ে বুঝিয়ে বলা একেবারেই দুঃসাধ্য!

—"ছুটু!" কায়ার স্বরে অপরিচিতের সুর। ছুটু ভয় পেয়ে গেল।

—"কিছু বলছ?"

—"ন্-নাঃ! কিছুনা।"

—"বলো না, কি বলছিলে?"

—"লামার কথা তোর মনে পড়ে?" নীরবতার গহ্বর থেকে কায়া উঠে আসে। ছুটু চুপ মেরে যায়। কায়া যেন কোন দুরূহ ধাঁধার সমাধান চেয়ে বসেছে। পাহাড়ের হলদেটে শ্লথ অপরাহ্নের সীমানায় যেন লামা দাঁড়িয়ে ছুটুর উত্তরের প্রতীক্ষা করছে।

—"আমি যখনই বাইরে যাই ..." ছুটু বলে।

—"বাইরে কোথায়?"

—"নীচে স্টেশনে। তখন মনে হয় সে আছে, কাছাকাছিই কোথাও আছে।

—"তুই বলতে চাস রেললাইনের ওপারে?"

—"কায়া?" কায়া ছুটুর দিকে তাকালে।

—"গিনী কি সত্যি সত্যিই মরে গেছে?"

হঠাৎ মনে হলো পড়ন্ত রোদের আলোছায়ায় দাঁড়িয়ে যেন কেউ হেসে উঠল। দুজনেই চমকে উঠে জড়োসড়ো হয়ে বসল। এ এক অদ্ভুত ভ্রান্তি। হঠাৎ করে মনে হয় যেন কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ভ্রান্তি ভ্রান্তিই! এ ধরনের ভ্রান্তি পাহাড়ি এলাকায় হয়ে থাকে। বিশেষত যখন সূর্য ডুবে যায়, কিন্তু তার আলোর রেশ হারিয়ে যায়না। তখন ছায়া সেই আলোর হাত ধরে জড়াজড়ি করে কিছুক্ষণ একসঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকে। সে সময় নানা ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। ... ধ্যাৎ, কেউ কোত্থাও নেই।

গিনী কি সত্যিই মরে গিয়েছে? মৃত্যু কি, তা কায়া জানে। কিন্তু তার চিহ্ন সে খুঁজে পায়নি। লামাকে যে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করবে—সে সাহস তার হয়নি। তার বেঁচে থাকার যেমন কোন প্রমাণ নেই, তেমনি তার মৃত্যুরও কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়নি। লামা সবসময় 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' গোছের ভাব নিয়ে থাকত। আর এভাবে থাকতে থাকতেই সে একদিন দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। হঠাৎ করেই সে যেন তাদের বাড়ির কঠিন, শীতল চার দেওয়ালের মধ্যে থেকে মুক্ত হয়ে একটা যবনিকার পর্দা টেনে দিয়ে চলে গেল। কিন্তু কায়া কি কখনও পরিত্রাণ পাবে? কথাটা মনে হতেই তার অন্তরটা কে যেন করাত দিয়ে চিরে দিল—ও শিউরে উঠলে। নিজেকেই ভয় করতে লাগল। অন্তরের ইচ্ছার কপাট যে সে ভুলবশত খুলে ফেলেছিল। সেটাই আবার তড়িঘড়ি বন্ধ করে দিলে। ... ছুটুকে কায়া পরম স্নেহভরে কাছে টেনে নিলে। ... সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তার অস্তমিত কিরণের ছটায়

পাহাড় যেন রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। অন্ধকার শহরের উপর দিয়ে তার সোনালী রেখার শেষ রেশটুকু আস্তে আস্তে মিলিয়ে যাচ্ছে। ... অন্ধকার নেমে এলো। দুজনে অনেকক্ষণ অন্ধকারে সিঁড়ির উপর চুপচাপ বসে রইল।

—"কায়া!" ছুটু কথা বলে উঠলে, "এক্ষুনি কে হাসলো রে?"

—"কেউ নয়। আমিই হেসেছিলাম।" কায়া জবাব দিলে।

দুজনে এবার সিঁড়ি বেয়ে আস্তে আস্তে নামতে লাগল।

সাত

ওরা দু'জনে একনাগাড়ে উপরে উঠছে। কালী মন্দির অনেক পিছনে ফেলে এসেছে। শেষ চড়াইটা তারা পার হচ্ছে। দুজনেই চুপচাপ। কায়ার নাক-চোখ দিয়ে অনর্গল জল পড়ছে। পিসির ঘন ঘন হাপরের মতো নিঃশ্বাসে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। আজ দুর্দান্ত শীত।

রিজে পৌঁছে ওরা স্বস্তির নিঃশ্বাস নিল। যাক্ বাবাঃ, সব চড়াই শেষ। রিজে সব উন্মুক্ত। নীচে জল, উপরে জাখু পাহাড়, রিজের বেঞ্চের উপরে নভেম্বরের মিষ্টি নরম রোদ। সমস্ত শহরটা যেন শীতে জবুথবু হয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। ওরা দুজনে এখন শহর ছাড়িয়ে অনেক উঁচুতে দাঁড়িয়ে।

উপরে আকাশে সাদা আর নীল রঙের মেলা .... হাল্কা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। সকালের হাল্কা মেঘ একটু পরেই দুপুরের নরম রোদে পাহাড়ের চুড়োয় বরফের সঙ্গে মিশে জমাট বেঁধে যাবে। এই মেঘ তাদেরই মতো নীচের গহ্বর পেরিয়ে উপরে উঠে এসেছে। মেঘের সঙ্গে পুরো শহরটাই যেন মেঘের ভেলায় চেপে উপরে উঠে আসছে বলে মনে হয়।

রিজের মাঝামাঝি এসে ওরা দাঁড়ালে। পিসি বেচারী ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তিনি একটা বেঞ্চের উপর বসে পড়লেন। রিজের ধারে বেঞ্চের ছড়াছড়ি। গরমকালে ব্যান্ডপার্টি এখানে এসে যখন ব্যান্ড বাজিয়ে কুচকাওয়াজ করে, তখন এই বেঞ্চগুলিতে তিলধারণের জায়গা থাকে না। এখন বেঞ্চগুলি খালি পড়ে আছে। রাস্তায় লোক নেই। কিছু কুলি ও রিক্সাচালক ইতি-উতি রাস্তার ধারে আগুন জ্বালিয়ে হাত সেঁকছে। স্বচ্ছ খোলা হাওয়ায় নীল ধোঁয়া উড়ছে।

পিসি নীচের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। কায়া গির্জা ঘরের দিকে চেয়ে ছিল। গির্জার ঠিক পাশেই জাখু পাহাড়ে উঠবার চড়াই। বাঁদিকে হার্ডিঞ্জ লাইব্রেরি। লাইব্রেরির জানলা বন্ধ। তার কাচে রোদের ঝিলিক।

—"এবার ওঠা যাক্, পিসি।"

—"আরে এত তাড়ার কি আছে? এসেই তো গেছি প্রায়। আরও কিছুক্ষণ বসি।" পিসি কায়ার মুখটা নিজের দিকে ফিরিয়ে নীচের দিকে দেখালেন—

—"দেখ্ কায়া, এই রাস্তা বেয়ে আমরা এতটা উপরে হেঁটে এসেছি!" পিসির

স্বরে কিশোরীর উল্লাস। কায়াও অনেক হাল্কা বোধ করে। পিসির ছোঁয়া তাকেও লেগেছে। সে নীচের দিকে তাকালে। উপর থেকে মনে হচ্ছে ওটা আর একটা শহর, এই উপরের জায়গা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। নীচে যে গাছগুলো তফাতে দাঁড়িয়েছিল, উপরে উঠে সেই গাছগুলিকেই দেখে ঘন সন্নিবিষ্ট জঙ্গল বলে মনে হচ্ছে। দুপাশে সারি সারি গাছের মধ্যবর্তী রাস্তা, যেটা নীচে থেকে অনেক উঁচু চড়াই বলে মনে হচ্ছিল, উপরে উঠে এসে সেটাকেই উৎরাই বলে মনে হচ্ছে। রাস্তাটা যেন কাঠবিড়ালীর মতো অধোমুখী হয়ে সাবলীল গতিতে দৌড়ে চলেছে, তার পিঠের উপর অগুনতি বাড়ির ছাদ রোদে চক্‌চক্ করছে।

—"কায়া দেখ্, হুই যে ওদিকে শুল্কঘর, আর ওদিকের পাহাড়ের গায়ে এনানডেল—এখান থেকে অবিশ্যি দেখা যাচ্ছেনা।

আর উই যে, ওদিকে—তোর বাবুর, তোদের সকলের বাড়ি।" —পিসি চুপ করলেন। কিন্তু তাঁর নজর ওই একটি বাড়ির উপর—তার ভাইয়ের বাড়ি। পিছনে ঝুল বারান্দা, নীচে কোয়ার্টার, মধ্যে মিস্ জোসুয়ার বাগানের গাছপালা — এখান থেকে ঠিক একটা কালো কাপড়ের মতো দেখাচ্ছে। ওদিকে কোয়ার্টারের পাঁচিল। পাঁচিলের উপর মঙ্গতু ভিজে কাপড় মেলে দেয়, হাওয়ায় সেগুলি পতপত করে ওড়ে।

পিসির আঙুলেরই অনুসরণ করে কায়া এবার অন্যদিকে তাকায়। অস্তমিত লাল টকটকে সূর্যের উপর তার চোখ স্থির হয়ে থেমে থাকে। সূর্যের মরে যাওয়া আলো ও ঘনিয়ে আসা অন্ধকারের মধ্যবর্তী ওই লাল গোল বিন্দু যেন সিঁদুরের বিন্দুর মতো জ্বলজ্বল করছে।

দ্বিতীয় খণ্ড

শহরের অনেক উপরে

এক

গেটের ফটক খোলাই ছিল। দু'দিকের ঝোপের মধ্যে গেটের পাল্লা দুটো ঢেকেছিল। দেখলেই বোঝা যায় যে গেটটা দিনরাত খোলাই পড়ে থাকে।

গেটের কাছেই ঢালু মতো জায়গাটায় একটি পুরানো ও বৃদ্ধ ওক গাছ দাঁড়িয়ে। বিশাল ওকের দীর্ঘ ছায়া নুড়ি বিছানো ছোট্ট রাস্তাটার উপর এসে পড়েছে। এই গাছের গায়ে ছোট্ট একটি কাঠের তক্তার উপর বড়বড় করে সাদা হরফে লেখা রয়েছে—ফক্সল্যান্ড। ওকের ধূসর খরখরে পাতার আড়ালে 'ফক্স' লেখাটা ঢাকা পড়ে শুধু 'ল্যান্ড' কথাটাই পড়া যাচ্ছে।

গেটটা যদিও বড় রাস্তার উপর, কিন্তু বাড়ির মধ্যে ঢুকতে হলে ঢালু বেয়ে নীচে নামতে হয়। নীচের রাস্তার কোনটা এবড়ো-খেবড়ো, কোনটা আরও এঁকে বেঁকে নীচে গিয়েছে৷ কোনটা ক্ষেতে গিয়ে মিশেছে, আবার কোনটা অন্য বাড়ির মধ্যে গিয়ে সেঁধিয়েছে। শুধু একটাই ঘোরানো রাস্তা ফক্সল্যান্ড অব্দি সোজাসুজি যাচ্ছে। এই ঘোরানো রাস্তার দু'দিকে ঘন গাছের ছায়া, ঠিক চাঁদোয়ার মতো ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দিনের বেলায়ও নীচে ঘন অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। ওই ঝিঁঝিঁর ডাকই এ পথে পর্যটকের পথনির্দেশক।

ঘোরানো রাস্তার শেষে কোনও গাছ নেই, অতএব ছায়াঘন অন্ধকারও নেই। খোলা আকাশ দেখা যাচ্ছে। আকাশ এখন অস্তরাগে লাল হয়ে আছে। সামনে কাকার বাড়িতেও এই লালের ছোঁয়া লেগেছে।

কাকা বাইরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাকা কি তাদের জন্য অপেক্ষা করে আছেন না এ তাঁর বৈকালিক রুটিন মাত্র! এতক্ষণ কায়া সামনের দিকে এগিয়ে হাঁটছিল। কিন্তু কাকাকে দেখেই পিসি কায়াকে ঠেলে এগিয়ে এলেন। হুড়মুড়িয়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠেই পোঁটলাটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কাকাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। কাকা চুপচাপ পিসির মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে—তাঁর দৃষ্টি এখন বাইরে নিবদ্ধ।

কায়া ঠায় সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে। ও'র কথা কারও খেয়াল নেই। সে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ... পিসিটা না, একটা ছিঁচকাঁদুনে! আরে যে পিসি বীরবিক্রমে নেপোলিয়নের মতো রিক্সাওয়ালার সঙ্গে ভাড়া নিয়ে ঝগড়া করে, সেই পিসিই যে

এভাবে ফ্যাঁচফ্যাঁচ করে কাকার সামনে ছোট্ট বাচ্চাদের মতো কাঁদতে পারে, সে ধারণা কায়ার ছিল না। ওর হাসি পেয়ে গেল।

হঠাৎ কাকার নজর কায়ার উপর পড়ল। কায়া সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে এলো। কাকা তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন। পিসির কান্না এতক্ষণে বন্ধ হয়েছে। তিনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলেন। কাকা পিসিকে একটু তফাতে নিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন—"হেঁটে এসেছ?"

—"আরে রিক্সা কি আর পাওয়া যায়!" পিসি আমতা আমতা করলেন। কান্নাকাটির পর পিসিকে এখন বেশ ঝরঝরে দেখাচ্ছে। চোখের জলে তাঁর মুখের চামড়াটাও বেশ ধুয়ে মুছে তরতাজা হয়ে গিয়েছে। কাকার ভ্রূ কুঁচকে উঠল—"তুমি বড় অদ্ভুত প্রকৃতির। আরে নিজের জন্য না হোক, এই বাচ্চা মেয়েটার কথা তো ভাববে!"

কায়ার হঠাৎ পিসির জন্য খারাপ লাগল। একবার ভাবলে যে বলে দেয়—"আমি মোটেই ক্লান্ত হইনি।" কিন্তু পিসির হয়ে কিছু বলার আগেই কাকা পুঁটলী-পোঁটলা তুলে নিয়ে কায়াকে জিজ্ঞেস করেন — "বাড়ির সব ভালো তো?"

—"তুমি তো সবই জানো ..." পিসির আবার কান্না ঠেলে বেরুতে লাগল। কিন্তু কাকা আর দাঁড়ালেন না। দরজার কাছে এসে একটা কাঠের তক্তা তুলে নিয়ে একপাশে সরিয়ে রাখলেন। এবার কায়ার দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন—"বাঁদরের উৎপাতের জন্যই এটা রাখা। নইলে ব্যাটারা দরজা খুলে একেবারে ভিতরে ঢুকে পড়ে।"

কাকার দিকে এবারে কায়া ভালো করে চেয়ে দেখলে। বাবার চেয়ে কাকা বয়সে ছোট—কিন্তু তাঁকেই বড় দেখায়। লম্বা, ছিপছিপে শরীর, কোথাও মেদবাহুল্য নেই। চলাফেরায় কেমন একটা হাল্কা ফুরফুরে অথচ সাবলীল ভঙ্গি। কেমন আলতো ভাবে টুক করে দরজাটা খুলে ফেললেন!

কায়া এগিয়ে গেল। আরে, এতদিন পরেও সিঁড়ির সামনে আয়নার ঠিক পিছনে সেই সতর্ক বাণীটি আজও ঠিক তেমনই অটুট আছে!

—'Attention please, Steps ahead' (সাবধান, সামনে সিঁড়ি আছে)। দু'ধাপ সিঁড়ি নীচে নামলেই ড্রয়িংরুম। এর আগে যখন কায়া এখানে এসেছে, তখন পায়ের পাতায় ভর দিয়ে উঁচু হয়ে আয়নায় নিজের চেহারা দেখেছে। এখন আর তাকে পায়ের পাতায় ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলো না। সে লম্বা হয়ে গেছে। সিঁড়ি দিয়ে নামবার মুখেই সে আয়নায় নিজের পূর্ণ অবয়বটি দেখতে পেলে। নিজের চেহারা আয়নায় দেখে ও'র কেমন অদ্ভুত লাগল। একি সে নিজে না আর কেউ? ওর চেহারা কি এমন ছিল? ঠিক মনে হচ্ছে আয়নার মধ্যে অন্য কারও দুটি বিষণ্ণ চোখ তার দিকে চেয়ে রয়েছে।

পিসি অনেক আগেই কাকার সঙ্গে বাড়ির ভিতরে চলে গিয়েছেন। কায়াও এগুতে লাগল।

হঠাৎ একটা গুমরে গুমরে ওঠার মতো কান্নার শব্দে কায়া চমকে উঠলে। একটা স্বরের সঙ্গে অনেকগুলো কান্নার স্বর মিলিত হলো।

—"ও কিছু না, শেয়ালের ডাক। অন্ধকার হলেই ওরা সমস্বরে ডাক ছেড়ে কাঁদে", কাকা মৃদু হেসে বললেন। ... কায়া সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলে। কাকা উপরে নিজের ঘরে চলে গেলেন, পিসি তাদের দুজনের জন্য পাশের নির্ধারিত ঘরে। কায়া বুঝতে পারল না কী করে এই সময়টুকু কাটাবে। সে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে জানলার ধারে বসে পড়লে।

অন্ধকার হয়ে এসেছে। একটা লাল রঙের আভা এখনও পাহাড়ের গায়ে লেগে রয়েছে। পড়ন্ত সূর্যের আলোর রেশ আকাশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত এক সমান্তরাল রেখা টানে প্রসারিত হয়ে আছে। ঘরে এখনও আলো জ্বালানো হয়নি। যেখানে জানলার ধারে সে বসে আছে, শুধু সেটুকু জায়গায় একটা হলদে আলোর রেশ এখনও লেগে রয়েছে। এছাড়া ঘরের অবশিষ্ট অংশ অন্ধকারে ছেয়ে গেছে।

আচ্ছা এখানে বসেই বা ওর কি লাভ হচ্ছে? বাইরে জঙ্গলে হাওয়ার সোঁ সোঁ শব্দ, এই বিরাট বড় বাড়িটা প্রায় খালিই বলা চলে, আর অন্ধকারে শিয়ালের মড়া কান্না। এমনধারা কি রোজই হয়? সে কি চিরকালই এতে আবদ্ধ হয়ে থাকবে? ... বাড়ির কথা তার মনে পড়ে গেল। ছুটু এখন কি করছে? মা'-ই বা কি করছেন? ছুটু নিশ্চয় একা একা তার ঘরে বসে রয়েছে। মা নিশ্চয়ই নিজের ঘরে শুয়ে। নীচে, হাওয়ায় মিস্ জোসুয়ার লেটার বক্সটার পাল্লাদুটো ঠাস্‌ঠাস্ করে পড়ছে। এখানকার সবই অচেনা, এমনকি এক একটা শব্দ পর্যন্ত। শুধু একটাই চেনা কথা আছে—'Attention please, Steps ahead!'

কাকার ড্রইংরুমের সঙ্গে লাগোয়া লাইব্রেরি। তারপর একটু এগিয়েই বিরুর ঘর। এই দুই জায়গার মাঝে বিরাট বড় একটা টেবিল, তার দু'পাশে চেয়ার সাজানো। এর চারদিকে লম্বা লম্বা কাচের আলমারী সাজানো। এই আলমারীগুলোর মাঝে উপরে যাবার সিঁড়ি। উপরে উঠেই কাকার ঘর। কায়া কিছুক্ষণ সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে রইলে। সে যখনই কাকার বাড়িতে আসে, এই সিঁড়িটা দেখে খুব মজা লাগে। কেমন মজার ব্যাপার না? বাইরে না বেরিয়েও কেমন বাড়ির ভিতরেই সিঁড়ি বেয়ে গট্ গট্ করে উপরে যাওয়া যায়?

কাকা এখন উপরে, তাঁর নিজের ঘরে। কায়ার উপরের ঘরে কোন আগ্রহ নেই। সে লাইব্রেরির পরের ঘরটার সামনে এসে দাঁড়ালে। দরজা বন্ধ, কিন্তু ভিতর থেকে আলোর একটা সূক্ষ্ম রেখা দরজার নীচের ফাঁক দিয়ে বাইরে বেরিয়ে

লাইব্রেরির মেঝেতে এসে পড়েছে।

কানে হঠাৎ একটা মিষ্টি সুরের রেশ এসে লাগল। ঠিক যেন ঝর্ণার জল এক জায়গায় থেমে একই সুরে কুলকুল করে বইছে। সেই সুরের গুঞ্জন ঘরের এক দিক থেকে অন্য দিকে ভেসে ভেসে যাচ্ছে। আঃ, মনটা একেবারে জুড়িয়ে গেল।

কায়ার অদম্য ইচ্ছা হলো যে দরজা খুলে দেখে ভিতরে কে রয়েছে। কিন্তু সাহসে কুলালো না। অচেনা বাড়িতে বন্ধ দরজা দেখলেই মনে কেমন জানি আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। নিজের পাড়াতে ও পাশের বাড়িতে শীতকালে তালাবন্ধ হয়ে গেলে একটা অজানা আশঙ্কা ও ভয়ে ওর গা ছমছম করে ওঠে। সে আর ছুটু এই বাড়িগুলোর সামনে এলেই চোখ বুঁজে এক দৌড়ে পার হয়ে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচত। হঠাৎ কায়ার পিসির কথা মনে পড়ল। আহা, তার জন্য পিসিবুড়ি অপেক্ষা করে বসে আছেন। সে পিছন ফিরলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই ঘরের দরজাটা খুলে গেল। খোলা দরজা দিয়ে আসা জোরালো আলোয় কড়িকাঠের ছায়া অনেক বড় হয়ে উঠল।

দরজা ধরে বিরু দাঁড়িয়ে!

কায়া থমকে দাঁড়ালে। দুজনে নিঃশব্দে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে রইল। দরজার ধারে দাঁড়ানো ছেলেটি কি বিরু? নাঃ, কোন সন্দেহ নেই যে এই-ই বিরু। কত্তো বদলে গিয়েছে ও!

—"কখন এলে? বিরু দরজাটা হাট করে খুলে দিলে।

—"এই, একটু আগে, বিকেলে।"

—"হ্যাঁ, বাবা অবশ্য বলছিলেন যে তোমরা আজ আসবে।" বিরু কায়ার দিকে চেয়ে রইল।

—"মঙ্গতুর সঙ্গে এসেছ?"

—"না, পিসি এসেছেন।"

—"লামার মা?" ... কায়া সম্মতিসূচক মাথা নাড়ে।

—"ভিতরে এসো না! ডিনারের এখনও দেরি আছে।" বিরু পিছন ফিরলে। ঘরে জোরালো আলো, তার মুখের উপর পড়ল—দীর্ঘ অবয়ব, কোমল, শান্ত মুখ, চোখের বড় বড় পালকের ছায়া তার গালের উপর এসে পড়েছে। কাকার মতই লম্বা লম্বা হাত-পা। গত বছরেও যখন বিরুর সঙ্গে দেখা হয়, তখন সে এই এত্তোটুকু ছিল। এ বিরু যেন অন্য কোন বিরু।

কায়া ঘরের ভিতরে ঢুকলে। এ যেন সম্পূর্ণ এক অন্য জগৎ। সামনে আগুন জ্বালানোর ছোট্ট আঙ্গাটি। তার মধ্যে প্রচুর শুকনো কাঠ রাখা—গনগন করে আগুন জ্বলছে। একটা পালঙ্ক, যার মাথার দিকটা বালিশের মতো উঁচু হয়ে রয়েছে। বিছানার পাশে ইজিচেয়ার। জানলার ঠিক পাশেই একটা পিয়ানো আর পিয়ানোর

সামনে ছোট্ট একটা স্টুল। কায়া মুগ্ধ চোখে দেখতে লাগলে। পিসি যে তার পথ চেয়ে আছেন। সে কথা সে ভুলেই গেল।

পিয়ানো দেখে কায়া তাজ্জব। বাব্বাঃ, কত্তো বড় আর কি ভারী! এই যন্ত্রটা থেকেই কেমন সুন্দর হাল্কা আর মিঠে সুর বেরোচ্ছিল। কায়া জীবনে এই প্রথম পিয়ানো দেখলে। —"এটা তুমিই বাজাচ্ছিলে বুঝি?"

—"হ্যাঁ। এটা বাবা এনে দিয়েছেন। এক ইংরেজ এ দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে নিজের সমস্ত জিনিসপত্র বেচে-বুচে দিয়ে গেছে। একগাদা বইও আছে।"

—"আমাদেরও বাড়ির একতলাতে না একজন ইংরেজ মহিলা থাকে ...", কায়া মহোৎসাহে জানাল। হঠাৎ সে বিষাদ বোধ করলে। তাই তো! মিস্ জোসুয়ার কাছে তো কিছুই নেই, শুধু একটা বস্তাপচা পুরানো গ্রামোফোন আর গোনাগুনতি কয়েকটা রেকর্ড ছাড়া! তিনি যখন যাবেন দিয়ে যাবেন কী? ... দুজনে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলে। তারপর বিরু একটু ইতস্তত করে বললে— "তোমার বাবু কি দিল্লীতে?"

—"হ্যাঁ, কেন?" কায়া বললে।

—"না, মানে তোমার মায়ের তো একটা মরা বাচ্চা হয়েছিল, তাইনা?"

কায়া কোন উত্তর দিলে না।

—"তুমি দেখেছিলে?" বিরু আবার জিজ্ঞেস করে।

—"কি?"

—"বাচ্চাটাকে?"

—"ন্-নাঃ!" কায়া হঠাৎ মিথ্যে বলে ফেললে। তবে এটাকে ঠিক মিথ্যেও বলা যায় না। কেননা সে লুকিয়ে লুকিয়ে ধাইমার হাতে যে একটা রক্তমাংসের দলা দেখেছিল, সেটা যে একটা বাচ্চা—মরা বাচ্চাও হতে পারে, সে ধারণাই তার নেই। বাচ্চা হবে বেশ নাদুস-নুদুস, হাত পা টেবো টেবো, মাটিতে হামা দিয়ে বেড়াবে, তবেই না সে বাচ্চা! যে দৃশ্য সে সেদিন জানলায় দেখে ফেলেছে, সেটা তার মনের মধ্যেই ধরে রাখা আছে। তাকে কখনও বিরুর মতো কথায় প্রকাশ করার চেষ্টা করেনি। বিরুর জগতের সঙ্গে কায়ার নিজস্ব জগতের কোন মিল নেই। তার জগৎ টুকরো টুকরো স্মৃতি দিয়ে তৈরি; বিরুর মতো এমন কঠোর-কঠিন বাস্তব জগৎ তা নয়। কায়ার হঠাৎ মনে হলো সে যেন অ-নে-ক ছোট! ছুটুর কাছে যে মুরুব্বিয়ানা সে দেখায় বা দেখাতে পারে, এই রোগা লিকলিকে ছেলেটার কাছে তা যেন খেলো হয়ে যায়। কায়ার বড় বড় হাবভাব, মরুব্বিয়ানা এখানে এসে একেবারেই ধূলিসাৎ হয়ে গেছে।

—"কি ভাবছ?"

বিরুর কথায় কায়ার চমক ভাঙে। সে এখন অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে।

মুচকি হেসে সে জবাব দিলে—“কই, কিছু না!”

—“তুমি কত বড় হয়ে গেছ, আগের চেয়ে অনেক বেশি।” বিরু বলে।

—“আমি জানি।” কায়া যেন নিজের বড় হবার রহস্য নিজেই উন্মোচন করে।

—“এবার এসে তো আমি সিঁড়ির আয়নায় নিজের পুরো চেহারাটা খুব ভালো করে দেখতে পেয়েছি।”

—“আগে কি অর্ধেকটা দেখতে পেতে?”

— “না তো! আগে তো কিছুই দেখতে পেতাম না!” কায়া যেন কথাটা বলে একটা চাপা উল্লাস বোধ করে। ছুটুর সঙ্গে সে কোনদিনও এভাবে কথা বলেনি। তার কাছে সে বড়, রাশভারী দিদি। আর লামার কাছে তো কথাই নেই। লামা তার কথা শুনবে কি, তাকে সে পাত্তাই দেয়নি কোনদিন।

হঠাৎ কায়ার নজর বিরুর বিছানার উপর পড়ল। এক কোণে দুটি ছোট বোনার কাঁটা আর একদলা সাদা উল পড়ে রয়েছে।

—“কার এটা?”

—“এটা মোজা—মাত্র অর্ধেকটা বুনতে পেরেছি।”

—“ওমা, তুমি বুনতেও পারো নাকি?” কায়ার চোখ কপালে ওঠে।

—“হ্যাঁ ... কেন, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে?”

—“ওমা, ছেলে হয়ে ... তুমি বোনো?”

—“বাঃ, বোনার ব্যাপারে ছেলে-মেয়ের কি আছে?” বিরুর স্বরে কোন চাঞ্চল্য নেই। সে পরম স্নেহে উলের গোলায় হাত বোলাতে লাগল। বিরুর আঙুল দেখলে সাদা সাদা মোমবাতি বলে মনে হয়—ফর্সা, সরু আঙুল। আঙুলের গায়ে হাল্কা ধূসর রোঁয়া—কায়ার দেহে শিহরণ জাগে।

—“তুমি বুনতে পারো?” বিরু জিজ্ঞাসা করল।

কায়া ‘না’ সূচক মাথা নাড়লে।

—“আমার না খুব ভালো লাগে এসব। তোমরা তো কত কি বুনতে পারো —মোজা, দস্তানা, ছোট ছোট সোয়েটার।”

—“আচ্ছা তুমি বুনে কি কর?”

—“কি আর করব? বুনে নিয়ে আবার খুলে ফেলি!”

আবার কায়া চোখ কপালে তুললে—“সে কি?” কিন্তু বিরু নির্বিকার। এ যেন কোন ব্যাপারই নয়। সহসা কায়ার মনে হলো বিরু যেন অনেক দূরের মানুষ—ধরা-ছোঁওয়ার বাইরে—শান্ত, সংহত ও নির্বিকার। কায়ার সঙ্গে তার কোনও মিল নেই। তার ঘরের বিছানা পরিষ্কার, ফিটফাট! টানটান করা চাদর, পিয়ানো, উলের গোলা—এর সঙ্গে তার অগোছালো, ছন্নছাড়া ঘরের কোন মিল নেই।

—“তুমি এ ঘরে একলাই থাকো?”

—"একলা মানে?" বিরু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকায়।

—"না, মানে, তোমার ঘরে কেউ কখনও আসে না?"

—"কেন আসবে না? পাহাড়ি আসে, বাবা আসেন। সপ্তাহে দু'দিন মাস্টারমশাই আসেন—একথা কেন জিজ্ঞেস করছ বল তো?"

—"এই পাহাড়ি-টা কে?"

—"এখানে কাজ করে। ও, তুমি এখনও আমাদের রান্নাঘর দেখোনি বুঝি?"

কায়া বিরুর মুখের উপর একটা আবছা বিরক্তির আভাস পায়। সে মুখে একটা চাপ, উৎকণ্ঠা, একটা দ্বন্দ্বের প্রকাশ রয়েছে। বিরুর শান্ত সমাহিত মুখের উপর অভিব্যক্তির পরিবর্তন খুব সহজেই বোঝা যায়।

দরজায় কেউ নক্ করল। কিন্তু দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকলে না।

—"যাও, তোমাকে খেতে ডাকছে।" বিরু বললে।

—"তুমি খাবে না?"

—"আমি খেয়ে নিয়েছি। আমি সন্ধ্যার মধ্যেই খেয়ে নিই .... তুমি যাও।"

হঠাৎ বিরুর স্বরে কেমন যেন রুক্ষতা প্রকাশ পেল। রুক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে উদাসীনতাও।

কায়া উঠে দাঁড়ালে। দরজার কাছ পর্যন্ত এসে থমকে দাঁড়াল। এভাবে চলে যেতে খারাপ লাগছে। সে বিরুর দিকে তাকালে। বিরু একাগ্রচিত্তে বসে বসে মোজা বুনছে।

—"আমি কিন্তু খেয়ে-দেয়ে আবার আসব ..." কায়া বললে।

এবার বিরু মৃদু হাসলে। বোনা থেকে মাথা তুলে বললে—"আমি এখানেই আছি।" এরপর যতক্ষণ না কায়া দরজার বাইরে বেরিয়ে গেল, ততক্ষণ ও চেয়ে রইলে।

খাবার ঘরে পিসি ও কাকা তার জন্য অপেক্ষা করছেন।

একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসতে গিয়ে তার পিসির উপর নজর পড়ল। পিসিকে সে প্রথম চেয়ারের উপর বসতে দেখলে। তাদের বাড়িতে পিসি মাটিতে ছাড়া আর কোথাও বসেন না। হাতমুখ ধুয়ে, শাড়ি বদলে, পিসিকে বেশ তরতাজা দেখাচ্ছে। চেয়ারে বসে পিসিরও বোধকরি অস্বস্তি হচ্ছে। উনি সঙ্কুচিতভাবে কাকার সঙ্গে কথা বলছেন।

—"কিরে, বিরুর সঙ্গে গল্প সল্প করে এলি?" কাকা কথার মাঝখানেই কায়াকে সম্বোধন করলেন।

কায়ার চোখে হঠাৎ জল ভরে এলো। চোখের জলে পিসি ও কাকার চেহারা টলমল করছে। কোনরকমে মুখের গ্রাস গিলে সে উত্তর দিলে—"হ্যাঁ কাকা!"

—"সারাদিন—সারাটা দিন উড়নচণ্ডীর মতো ঘুরে বেড়াত।" পিসি এতক্ষণে কথা

বলেন। "তবুও এখানে কিছুদিন ভালো করে থাকবে। সঙ্গী-টঙ্গী আছে তো!"

কাকা বোধকরি পিসির কথা ভালো করে শুনতে পাননি। উনি টেবিলের দিকে তাকিয়ে অন্যমনস্কভাবে বললেন—"কে? কে উড়নচণ্ডীর মতো ঘুরে বেড়ায়?"

—"এই ছুঁড়িটা, আর কে!" পিসির মনও কিন্তু এখন উড়ু উড়ু। টেবিল থেকে উঠতে পারলে যেন বাঁচেন। কম চড়াই নাকি? বাব্বাঃ, একেবারে হাড়ে-মজ্জায় ক্লান্তি সেঁধিয়ে রয়েছে। ক্রমান্বয়ে হাই উঠছে। শুতে পারলে বাঁচা যায়। থালা সরিয়ে দিয়ে পিসি জমিয়ে একটা হাই তোলেন।

—"বাব্বাঃ, এ বাড়িটা কেমন হানাবাড়ির মতো নির্জন।" পিসি বলেন।

—"নির্জন কোথায়?" কাকা পিসির দিকে একটু বিরক্ত হয়ে তাকালেন। এখানে থাকতে থাকতে কাকা আসলে পুরানো হয়ে গিয়েছেন। কাজেই বাড়ির কোন খুঁত তাঁর চোখে পড়েনা। তিনি নিজের পুরানো জীবন, মায় নিজের মৃতা স্ত্রীকেও ধীরে ধীরে ভুলতে শুরু করেছেন। তিনি ভুলতে বসেছেন যে কোনও এক সময় 'বীরুর মা' আখ্যাধারিণী এক মহিলা বেঁচে থাকাকালীন এঘর-ওঘর করতেন, তাঁর বিছানার পাশে নিজের জায়গাটুকু করে নিয়ে শুতেন। বিরুর মা সেই জাতের নারী, যে নিঃশব্দে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে নিজের দেহের সঙ্গে সঙ্গে স্মৃতিও মুছে দিয়ে যান।

সবকিছুই তো যেমন কে তেমন রয়েছে। নির্জনতা কোথা রে বাপু?

—"এক এক সময় মনে হয়, বাড়িটা কিনেই ফেলি। এখানেই যখন থাকতে হবে, তখন শুধু শুধু ভাড়া গুণে কি লাভ?" কাকা পিসিকে বলেন।

পিসি যেন ঘুম থেকে উঠলেন।

—"কি ভেবেছটা কি তুমি, অ্যাঁ? চিরজীবন এই পচা জায়গায় পড়ে থাকবে?"

পাহাড়ে বাস করাটাই পিসির কাছে একটা চরম বেখাপ্পা ব্যাপার। বাবু চাকরির খাতিরে এখানে-ওখানে ঘোরেন, তাঁর কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু কাকা? তিনি তো ঝাড়া হাত-পা মানুষ। আর্মি থেকে অনেকদিন আগে রিটায়ার করেছেন, সংসারের কোন ঝুট-ঝামেলা নেই—স্ত্রী বহুদিন গত। এক বিরু রয়েছে। তা সে বড় হয়েছে, তারও থাকার ব্যবস্থা কোন না কোনখানে হয়েই যাবে।

তাহলে? এমন কি কথা থাকতে পারে, যাতে করে তিনি এই জায়গা ছেড়ে নড়তে একেবারেই নারাজ?

—"এ জায়গা ছেড়ে আর কোথায়ই বা যাব, তুমিই বলে দাওনা!" কাকার স্বরে অসহায়তা ফুটে উঠল।

—"আমি বলব আর তুমি সেটা শুনবে? হুঁ, তবেই হয়েছে। তোমাদের দুই ভাইয়ের সঙ্গে তো আমার কোন যোগাযোগই নেই। একজন এ মাথায়, অপরজন ও মাথায় থাকে। আমি হতভাগী বছরে দু'বার কি তিনবার তোমাদের জন্যে যে দৌড়ে দৌড়ে এই টঙের উপর চড়ে আসি—আমার কষ্টের কথাটা তোমরা দুই ভাই কি

কখনও ভেবেছ! স্বার্থপর—সব স্বার্থপর!"

কাকার মুখটা মলিন হয়ে গেল। মনে হলো, তাঁর পরম বেদনার জায়গাটিতে পিসি আঘাত দিয়েছেন। —"তোমাকে তো কতবার আমাদের কাছে এসে থাকতে বলেছি। কিন্তু তুমিও তো বাপু কম জেদী নও! প্রথমে লামার ছুতো তুলে তুমি আসতে নারাজ ছিলে। কিন্তু এখন তো লামাও নেই—তবে? এখানে আসতে তোমার কিসের বাধা? আসলে পাহাড়ি জায়গা তোমার ভালো লাগে না, তাই। তুমি তো মনে কর এখানে মানুষ থাকে না।"

পাহাড়—হুঁ! পিসি মনে মনে মুখ বেঁকান। পাহাড়ি শহর আমার কি করবে রে? বলে পর্বতপ্রমাণ দুঃখ সয়ে এতবড় জীবনটা কাটিয়ে দিলাম—"হাতি ঘোড়া গেল তল, মশা বলে কত জল!" পাহাড় আমার একেবারেই সয়না, তাই না নীচে শহরে থাকা।"

—"আমার তো কিছু না, কিন্তু এই আমি বলে দিলুম যে এই পাহাড়ই তোদের দু'জনের মাথা খাবে একদিন, হুঁ!"

কায়া ভাবলে, পাহাড় কি কোন জন্তু নাকি রে বাবা, যে মাথা খেয়ে ফেলার কথা হচ্ছে! না এর মুখ আছে, না আছে দাঁত। মানুষের মতো পাহাড় কক্ষণও এত নিষ্ঠুর নয়। কাকা নিশ্চয়ই এই আজগুবি কথা শুনে এক্ষুনি হেসে উঠবেন। কিন্তু আশ্চর্য, কাকা কোন প্রতিক্রিয়াই ব্যক্ত করলেন না। যেমন চুপচাপ বসেছিলেন, তেমনই চুপচাপ বসে থাকলেন। পিসি তাঁর এমন এক স্পর্শকাতর জায়গায় অঙ্গুলি সঙ্কেত করলেন—যেটা সবচেয়ে ব্যথার জায়গা, —সবচেয়ে অ-সুরক্ষিত। এখানে হয়তো ভয় করেনা, কিন্তু সবসময়ই একটা বিপদের আভাস মাথার উপর খোলা তরোয়ালের মতো ঝুলে থাকে। করুণ চোখে কাকা এবার পিসির দিকে তাকান—"আমার কাছে না সয়, দাদার কাছেও তো এসে থাকতে পারো? তাঁর তো পরিপূর্ণ সংসার রয়েছে। তাঁর কাছে থাকতে কিসের বাধা?"

—"সংসার? দাদার সংসারকে সংসার বল তুমি?" পিসির স্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। "সে নিজে সবসময় দিল্লীতে, বাচ্চা দুটো অনাথ আতুরের মতো আঁদাড়ে-বাদাড়ে ঘুরে বেড়ায়, বৌদি একা একা অতবড় বাড়িতে খালি এঘর-ওঘর করেন। আমি লামাকে ও বাড়িতে পাঠিয়ে খুব ভুল করেছিলাম! এরপরেও তুমি আমায় ও বাড়িতে গিয়ে থাকতে বলছ?" পিসির মুখ রাগে লাল টকটক করছে। উনি হয়ত আরও কিছু বলতেন, কিন্তু কায়ার দিকে চোখ পড়তেই চুপ করে গেলেন। কায়ার মন কিন্তু তাদের কথায় নেই। তার মন এখন বাইরে—মেঘের ওপারে। প্রচণ্ড বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। জানলা ও স্কাইলাইটের ভিতর দিয়ে মেঘ ঘরে ঢুকে পড়েছে। এবার বৃষ্টি হবে। কায়া দেখেছে, যখনই মেঘ বাড়ির ভিতর হুড়মুড় করে ঢুকে পড়ে, তখনই মুষলধারে বৃষ্টি হয়। খুব জোরে জোরে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বিদ্যুতের আলোকে

লাইব্রেরির বই, চেয়ার, টেবিল, লাইব্রেরি-ঘর, বিরুর ঘরের দরজা ঝলমল করে উঠছে। এই ভুতুড়ে নিঃশব্দতার মধ্যেও অন্ধকারে একটি ছোট্ট ছেলে দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে হাঁপাতে হাঁপাতে রাতের খাবার রেখে চলে যায়। ওকে দেখে কায়ার মনে হয় যেন ছেলেটিকে স্বপ্নের মধ্যে দেখেছে—নেপালীদের মতো গোলগাল মুখ, টেবো টেবো হাত, আপেলের মতো লাল টুকটুকে গাল। চোখের কোলে চামড়া ময়লায় কালো হয়ে রয়েছে। এই-ই বোধহয় বিরুদের চাকর—পাহাড়ি। পাহাড়ি সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরে ঘুরে কাজ করে। ওর কারো দিকে চাইবার মতো ফুরসত নেই, কৌতূহলও নেই। এ বাড়ির নতুন সদস্য কায়ার দিকেও সে একবারের তরেও ফিরে তাকায়নি। ঝড়ের বেগে এসে হাতের প্লেট থেকে গরম গরম ফুলকো ফুলকো রুটি তাদের প্লেটে ঢেলে দিয়েই সে তুফানের বেগে বেরিয়ে যায়। সিঁড়ি দিয়ে তার ধুপধাপ করে নেমে যাবার শব্দ অনেকক্ষণ ধরে পাওয়া যায়। কায়ার দেখতে খুব মজা লাগে। ও' অপেক্ষা করে থাকে যে কখন আবার ও হাঁপাতে হাঁপাতে এসে দাঁড়াবে। অন্ধকারে ওকে ঠিক একটা বেঁটে ভূত বলে মনে হয়। চোখে ঘুমের আমেজ থাকলে ওর বেঁটে শরীরও বড় দেখায়। ... পিসি ও কাকার আলোচনা অনেকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। ছাতের উপর শার্সির কাচ বেয়ে টপ টপ করে জল পড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে। কায়ার মনে হলো, সে যেন কাকার বাড়ি নয় নিজের বাড়িতে, নিজের ঘরে বসে আছে আর পাহাড়ি যেন একগোছা রুটি নিয়ে দৌড়তে দৌড়তে হাঁপাতে হাঁপাতে আসছে। তার হাতের রুটির গোছা জলে ভিজে গেছে।

—"আরে, কায়া যে ঘুমিয়ে পড়লি!"

কাকার গলা। তার কাঁধ ধরে নাড়ছেন। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। পিসি এঁটো বাসন গুছিয়ে একদিকে রাখলেন। কাকা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘুমন্ত কায়ার চুলে হাত বোলাতে লাগলেন। তারপর একটু দ্বিধাজড়িত স্বরে বললেন—"তোমরা গিয়ে এবার শুয়ে পড়ো—সারাদিনের ক্লান্তি! আমি একটু ঘুরে আসছি, আমার অপেক্ষায় জেগে থেকো না।"

পিসি কিছু বললেন না। কায়ার হাত ধরে চেয়ার থেকে নামিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালেন। দু'জনে একই ঘরে শোবে।

কায়ার ঘুম এখন পুরোপুরি ভেঙে গিয়েছে। লাইব্রেরির সামনে দিয়ে যাবার সময়ে বিরুর ঘরের দিকে নজর গেল। ঘরের দরজা বন্ধ। কোনও সাড়া শব্দ নেই। বিরু ঘুমিয়ে পড়েছে। কায়া একটুকু দাঁড়াতে পারলে না; পিসি তার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকতেই—আঃ, কি নরম মোলায়েম কার্পেট। মুহূর্তের জন্য মনে হলো এ

মিস্ জোসুয়ার ঘর, কাকার বাড়ি নয়। ঠিক তাঁর ঘরের মতন দেওয়ালে ওয়াল পেপার। বন্ধঘরের সেই রকমই বাসি গন্ধ। কে জানে, কতদিন পরে এঘর খোলা হয়েছে!

ঘরের মধ্যে মুখোমুখি দুটি খাটে দুটি বিছানা। মাঝখানে তেপায়া। তেপায়ার উপর জলের জাগ, দুটি গ্লাস রাখা। খাটের নীচে পুরানো সিন্দুক বাক্স। ইঁদুরের খুট্খুট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। দেওয়ালে কিচ্ছু নেই। এক কোণে শুধু একটা মাকড়সার জাল আটকে আছে। এ ঘরে বোধহয় কেউ কখনও আসে না।

পিসি কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর কায়াকে বললেন — "জানিস, এখানে এলেই তোর কাকিমাকে বড্ড বেশি মনে পড়ে ..."

—"উনি এঘরে থাকতেন বুঝি?" কায়া জিজ্ঞেস করে।

—"হ্যাঁ, এ ঘরেই শেষ পর্যন্ত ছিলেন—তোর কি আর মনে আছে? তুই তো তখন এত্তোটুকু ছিলি।"

পিসি পোঁটলা খুললেন। নিজের ও কায়ার জামাকাপড় আলাদা আলাদা করে রাখলেন। ... টিনের ছাদে সমানে টিপ্-টিপ্ টপ্-টপ্ ছন্দে বর্ষার গান চলেছে। বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার, মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। অন্যের বাড়িতে টিনের ছাদে বর্ষার শব্দটাও যেন অন্যরকম—ঠিক নিজের বাড়ির মতন নয়।

পিসি খানিকক্ষণ কায়ার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর হাতের কাপড় বিছানায় রেখে তার খাটে এলেন। আলতোভাবে তার কাঁধে হাত রেখে বললেন—"কায়া, মাঝে মাঝে তোর কি হয় রে?"

—"কি হয়েছে পিসি?" কায়া ভয়ে ভয়ে পিসির দিকে চাইলে। পিসি খুব নরম সুরে বললেন—"শূন্যে চেয়ে চেয়ে তুই এত কি দেখিস? আমি কয়েক দিন ধরেই তোকে লক্ষ করছি ... এক এক সময় মনে হয় তুই বোধহয় চোখ খুলেই ঘুমোচ্ছিস ... যেন ..." বলেই একটু চুপ করলেন। তারপর অসমাপ্ত কথাটা শেষ করতে বলে ফেলেন—"মনে হয় ইহজগৎ পেরিয়ে তুই যেন অন্য কোন দুনিয়ায় বিচরণ করছিস। তোর শরীর ভালো আছে তো রে?"

কায়া একটু পিছনে সরে বসলে। পিসির হাত তার কাঁধ থেকে নেমে গেল। কায়া হাসছে।

—"আরে পিসি, এই তো আমি তোমার সামনে বসে!" পিসি তার দিকে চেয়ে হতাশ ভাবে মাথা নাড়লেন। তারপর একটা নিঃশ্বাস ফেলে নিজের বিছানার দিকে পা বাড়ালেন। যেন শুধু কায়া নয়, মায় সমস্ত জগৎটার উপরেই তাঁর প্রবল অনীহা এসে গিয়েছে। আর কিচ্ছু করার নেই। একটা হতাশ ভাব নিয়ে তিনি বিছানার উপর চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়লেন।

কায়াও শুয়ে পড়লে। অনেকক্ষণ পর্যন্ত বৃষ্টির টাপুর-টুপুর গান সে শুনতে

লাগল। জানালার বাইরে বৃষ্টির ছাঁটে সব একাকার হয়ে গেছে। বর্ষার ধারায় ধুধু করা রূপালী পর্দা ফেলা অন্ধকার রাত! বিদ্যুতের ঝিলিক মাঝে মাঝে করাতের মতো অন্ধকারকে চিরে বেরিয়ে যাচ্ছে।

—"শুনতে পাচ্ছিস কায়া?"

—"কি পিসি?"

—"কে যেন সিঁড়ি বেয়ে উঠছে।"

কায়া কিছু শুনতে পেলে না। তারপর মনে হলো কাঠের বাড়িটা যেন নড়ছে। সে উঠে বসে দরজার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইলে। পাশেই ড্রইংরুমে আলো দেখা গেল—আলোটা নড়ছে। কেউ বোধহয় টর্চের আলো ফেলছে।

—"শুয়ে পড়। তোর কাকা।" পিসি শান্ত স্বরে বললেন।

—"বেরিয়েছিলেন?"

পিসির তরফ থেকে কোন সাড়া নেই। শুধু তাঁর নিঃশ্বাসের শব্দ শোনা গেল। পিসি বোধকরি প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। এখন তাঁর কৌতূহলের নিরসন হয়েছে।

সমস্ত বাড়ি এখন নিস্তব্ধ-নিঃঝুম। কায়া আবার শুয়ে পড়লে। এবার বিছানাটা বরফের মতো ঠাণ্ডা লাগছে। বাড়ি হলে এতক্ষণে ছুটুকে বিছানায় টেনে নিতো। ছুটু ঘুমোলেই তার গা বেশ গরম হয়ে ওঠে। ছুটুর দেহের ওমে সে আরাম বোধ করে। এখানে কেউ নেই, ও একা শুয়ে। এই প্রথম সে ছুটুর অভাব বোধ করে। ছুটুর সঙ্গে শুতে না পারার অপরাধবোধ ওকে কুরে কুরে খায়। এরপরই তার খেয়াল হয়—কাল তো পিসিও ফিরে যাবেন। তারপর? সে আবার একা! ভাবতেই তার শিরদাঁড়ায় একটা ঠাণ্ডা শিহরণ খেলে যায়। সে নিজের বুকটা দুহাত দিয়ে জোরে চেপে ধরে। —"শীত করছে কায়া?" পিসি কথা বলে উঠলেন।

কায়া মটকা মেরে পড়ে থাকলে, যাতে পিসি মনে করেন যে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু পিসি অন্ধকারেও ঠিক টের পেলেন যে কায়া শীতে ঠকঠক করে কাঁপছে। তিনি এবার উঠে নিজের বিছানা থেকে একটা কম্বল তুলে নিয়ে কায়ার উপর ঢেকে দিলেন। তারপর তারই বিছানায় বসে পরম স্নেহে তিনি বললেন—"কায়া, এখানে তোর বড্ড একা লাগবে না রে?"

কায়া কোন উত্তর না দিয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

—"আমি কিছুদিন এখানে থাকতে পারতাম। কিন্তু কি করি বল? তোর মা'ও যে বড় একলা পড়ে গেছে। সে তো আমাকে ছাড়তেই চাইছিল না ...।"

কিন্তু আমাকে মা অনায়াসে ছাড়তে পেরেছে ... অভিমানে কায়ার বুক ভরে ওঠে। মায়ের সঙ্গে সঙ্গে তার নিজস্ব চেনা জগতের উপরেও অভিমান উপচে পড়ে। কিন্তু পিসিকেই বা সে কি বলে প্রবোধ দেবে? তাঁর নিজেরও বোধকরি ওই

একই সমস্যা রয়েছে।

কায়া ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে পিসি আবার নিজের খাটে ফিরে যান। — "বাপরে বাপ, বৃষ্টির যেন আর শেষ নেই। অনর্গল টাপুর-টুপুর শব্দে কি আর ঘুম আসে?" পিসি বক্‌বক্ করতে করতে শুয়ে পড়েন। শোবার পর পাশ ফিরে আর একবার কায়ার বিছানার দিকে তাকালেন। নাঃ, মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়েছে।

কায়া কিন্তু ঘুমের ভান করে পড়েছিল। কাকা এত রাতে কোথায় গিয়েছিলেন কে জানে। হঠাৎ পাহাড়ির চেহারাটা চোখের সামনে ভেসে উঠল। কেমন নীচ থেকে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে রুটি পরিবেশন করে আবার তরতর করে নেমে যায়। রান্নাঘরটা বোধহয় নীচে। হয়ত মঙ্গতুর মতো তারও নীচে একটা কোয়ার্টার আছে। সব চাকরদের কোয়ার্টার বোধকরি একইরকম দেখতে—বিড়ির গন্ধ আর ভ্যাপসা গরমে ভরপুর রহস্যময় অন্ধকারে ঘেরা। কিন্তু পাহাড়ি তো একটা বাচ্চা ছেলে। ঠিক ছুট্টুর মতো। অতটুকু ছেলে একা একা একটা কোয়ার্টারে কি করে থাকে? .... আচ্ছা, ছুট্টু এখন কি করছে কে জানে! নিশ্চয়ই মায়ের ঘরে গিয়ে সেঁধিয়েছে। এখন আরামে সেখানে ঘুমোচ্ছে। বাড়ি তো এখন প্রায় খালিই বলা চলে। সে নিজে কাকার বাড়িতে, বাবু দিল্লীতে আছেন আর লামা মীরাটে বসে। এখন হলঘরের মধ্যে 'নীলদরিয়ার' শতরঞ্চিটা নিশ্চয় হাওয়ার সঙ্গে খেলা করছে। মিস্ জোসুয়ার লেটার বক্সটাও হাওয়ার দমকে ঠাস ঠাস করে পড়ছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও যেন সে সব কিছু এখান থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। এখন চোখ বন্ধ করেও সে এই ঘর, এই জায়গা থেকে দূরে চলে গিয়ে, অন্ধকার সীমানা পেরিয়ে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে, হাত বাড়িয়ে ছুট্টুকে ছুঁতে পারে, তার খাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা বাবুর স্পর্শ পর্যন্ত পেতে পারে। এই অন্ধকারের প্রান্তে দাঁড়িয়ে সে নিজেকে এখন অনেক মুক্ত, অনেক বিস্তৃত, অনেক আত্মনির্ভর বলে মনে করতে পারছে। এখানে সে নিজের ইচ্ছেমতো কাঁদতে পারে, কেঁদে হালকা বোধ করতে পারে। এখানে তাকে দেখে ফেলার বা বাধা দেবার কেউ নেই। এখানে সে স্বতন্ত্র, মুক্ত!

দুই

পিসি পরের দিন যেতে পারলেন না। কাকার উপরোধ ও মুষলধারে বর্ষা—দু'য়ে-দুই মিলে তাঁকে আটকে রেখে দিল। বৃষ্টি থামার কোনও লক্ষণ নেই।

এর পরের দিন বৃষ্টি বন্ধ হলো, আকাশের মুখ দেখা গেল। পিসি যাবার জন্যে তৈরি হলেন। কাকা পিসির ওজর আপত্তিতে কান না দিয়ে রিক্সা ডেকে আনলেন। বাড়ির সকলে মোড়ের মাথায় গেট পর্যন্ত পিসিকে পৌঁছে দিতে গেল। পিসি বোধহয় সকলের সামনে রিক্সার উপর চেপে বসতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। এই লজ্জাবশতই বোধকরি তিনি যাবার সময়ে কারুর সঙ্গে একটি কথাও বললেন না। পোঁটলাটা রিক্সার উপর চাপিয়ে গ্যাঁট হয়ে চড়ে বসলেন। কাকা পিসিকে মল রোড পর্যন্ত পৌঁছে দেবেন। রিক্সা চলতে শুরু করলে পিসি হঠাৎ রিক্সাওয়ালাকে থামতে নির্দেশ দিলেন। কায়া ভাবলে পিসি হয়ত তাকে কিছু বলবেন। সে এক দৌড়ে রিক্সার কাছে গেল। কিন্তু পিসি ততক্ষণে আবার রিক্সাওয়ালাকে এগুতে বলেছেন। কায়া দৌড়তে দৌড়তে বড় গাছটা পর্যন্ত গেল। তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল— রিক্সা ততক্ষণে তার দৃষ্টিপথের বাইরে চলে গেছে। গাছের গায়ে টাঙানো বোর্ডে লেখা 'ফক্সল্যান্ড' কথার অর্ধেকটা বর্ষার জলে বাকি অর্ধেকটা কায়ার চোখের জলে ততক্ষণে ঝাপসা হয়ে উঠেছে। রিক্সার ঘণ্টি অনেকদূর পর্যন্ত শোনা যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে তাও মিলিয়ে গেল। কায়ার মনটা আবার অবসাদে ভরে উঠল। তার বাড়ি ফিরতে মন চাইছিল না। পিসি চলে গিয়েছেন, রাত্রে তাঁর বিছানাটা খালি পড়ে থাকবে। .... কায়া এবার ধীরে ধীরে নীচে নামতে লাগলে। ছুঁচলো পাথর বৃষ্টির জলে ধুয়ে গিয়ে কাদার মধ্যে থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। গাছের পাতা একটু নড়লেই তার থেকে টুপ করে বৃষ্টির জল কায়ার মাথায় পড়ছে। পিসির চলে যাওয়ার দৃশ্যটা ও এখন আস্তে আস্তে ভোলার চেষ্টা করবে। মনে ভাববে, যেন অসংখ্য পাহাড়ি রাস্তার খানা-খন্দের মতো পিসির প্রস্থান পর্বটাও একটা গহ্বর! সেই গহ্বরটা সে একলাফে ডিঙিয়ে পেরিয়ে এসেছে। ও এর আগেও তো এমন কত ঘটনা, কত বেদনাবিধুর স্মৃতি এভাবে পিছনে ফেলে এসেছে। বাবুর দিল্লী যাবার ঘটনা তার মধ্যে সবচেয়ে বড়। সে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাবুর যাওয়া দেখত। আস্তে আস্তে মোড়ের মাথায় রিক্সাটা বাঁক নিলেই সেটা ছোট্ট বিন্দুতে গিয়ে দাঁড়াত। চড়াই ভেঙে যাবার মুখে

সেটাকে দূর থেকে একটা ছোট্ট পোকার মতো দেখাত। আর আশ্চর্য! রিক্সাটা মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তার দুঃখের ভারও কমে যেত। স্মৃতির এই বেদনার দিকে কায়া কখনও পিছু ফিরে চায়নি। সে জানে, মাটি খুঁড়ে বেদনায় ভরা ভাণ্ডটা বের করতে গেলে তা উপচে পড়বে, তাকে সামলানো তখন দায় হবে। এও কি এক ধরনের সুখ না শৈশবের সারল্যের মোড়কে জড়ানো কেবল দুঃখ মাত্র? কেন এমন হয়? কায়া আজ যে বয়ঃসন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে—সেখানে সুখ, দুঃখ পরস্পর বিরোধী—কোন অনুভূতি নয়, একটি যেন অপরটির পরিপূরক!

... গত রাতের বর্ষায় পথের সমস্ত ধুলোমাটি গলে গিয়ে বড় রাস্তার উপরে এসে পড়েছে। এতে করে রাস্তাটা যেন সরু হয়ে গিয়েছে—আর কাদায় প্যাচপ্যাচ করছে। এমন একটি জায়গায় এসে বিরু দাঁড়িয়ে পড়ল। পিছনের পায়ের শব্দ সে কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করে।

—"বিরু?"

—"এই যে, আমি এখানে।" ঘন গাছের ভিতর দিয়ে বিরু উঁকি দেয়।

বর্ষার পর এক উজ্জ্বল ঝকঝকে দিন। নীচের দিকে তাকালে মনে হয় যেন রাতারাতি অনেকগুলি ছোট ছোট ঝিল গড়ে উঠেছে। ক্ষেতের মধ্যে বর্ষার জল ঢুকে পড়েছে। পাহাড় যেন নেয়ে ধুয়ে সাফ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

সেদিন দুপুরে বিরু কায়ার ঘরে এসেছিল। ঘরের মধ্যে কায়ার জিনিসপত্র ইতস্তত বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো। অগোছালো বিছানা, বিছানায় রাতের বাসি কাপড় ছড়ানো, পড়বে বলে সঙ্গে করে আনা বই, টেবিলের উপর তার রিবন, ক্লিপ ইত্যাদি সব ছড়িয়ে রয়েছে। শান্ত চোখে এসবের দিকে তাকিয়ে বিরু কায়াকে বলে —"বেড়াতে যাবে?"

—"বেড়াতে? কোথায়?"

—"এখানে বেড়ানোর মতো অনেক জায়গা আছে।" বিরু তার ভাসা ভাসা চোখ কায়ার মুখের উপর রেখে বলে—"তুমি তো দেখছি ঘরের মধ্যে বসে কুড়ের মতো দিন কাটাতে ভালোবাস।"

—"আমি যে এখানকার রাস্তাঘাট চিনিই না ভাই!"

—"এখানে ইংরেজের আমলের একটা পুরানো গির্জাঘর রয়েছে।"

—"সেটা কি অনেক দূরে?" কায়া উৎসাহিত হয়ে ওঠে—"মানে বলছিলাম কি, আমি কি এইভাবেই, মানে কাপড় না বদলে যেতে পারি?"

বিরু তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। সালোয়ারের উপর বেঢপ বড়, লম্বা সবুজ রঙের কামিজ, চটির বাইরে পায়ের একাংশ বেরিয়ে আছে, ছোট্ট ফ্যাকাসে মুখের

উপর কোটরগত দুটি বড় বড় চোখ আর হেলাফেলায় বাঁধা রুক্ষ চুলের গোছা যেন বাত্যাহত পাখির বাসার মতো তার কাঁধ বেয়ে নেমে এসেছে।

—"উপরে কিন্তু শীত করবে। কোট আছে তোমার?"

... ক্ষেতের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা সরু পথে তারা উপরে উঠছিল। পাকা সড়ক শেষ হয়ে এখন কাদা প্যাচপেচে পথে তারা সন্তর্পণে হাঁটছিল। এক এক সময় বাস বা লরির শব্দে তারা থমকে দাঁড়িয়ে পড়ছে। নীচে দেখা যাচ্ছে যে ঢালুপথ বেয়ে, পাকা সড়ক ধরে সেগুলি শহর পানে চলেছে। গাড়িগুলোকে উপর থেকে ঠিক খেলনার গাড়ি বলে মনে হচ্ছে। নির্জন সড়ক কিছুক্ষণ সরব থাকে। তারপর আবার যে কে সেই।

—"আর কতদূর?"

—"কি হলো? আর হাঁটতে পারছ না বুঝি?"

বিরুর অভিধানে 'ক্লান্তি' কথাটা নেই। সে যে কতবার এই রাস্তা ধরে সোজা জাখু পাহাড় পর্যন্ত এক নাগাড়ে হেঁটে গিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

ওরা পাহাড়ের গা ঘেঁষে হাঁটছিল। এ রাস্তা গাড়ির রাস্তার অ-নে-ক উপরে। কিন্তু জাখু পাহাড়ের অনেক নীচে। ... উপরে সূর্যের পীতাভ আলো ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে। সূর্যের হলদে আলোটাকে ঠিক একটা কম পাওয়ারের বাল্ব বলে মনে হচ্ছে। বাল্বটা যেন একটা খোলা নীল সিলিঙে টাঙানো রয়েছে।

এক এক সময় কায়া বিরুর কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটু এগিয়ে গিয়েই আবার মোড়ের মাথায় বিরুর দেখা মিলছে। সুন্দর, সুঠাম চেহারা। গলাবন্ধ পুরো হাতার ব্রাউন রঙের সোয়েটার, চুলে রুক্ষ, বাদামী চুলের কুচি ছড়িয়ে পড়েছে। জাপানীদের মতো কুতকুতে চোখ কিন্তু দীর্ঘ আয়ত পল্লব। সে পিছন ফিরলেও পাশ থেকে তার চোখের লম্বা পালক দেখা যায়। বিরু সস্নেহে কায়াকে জিজ্ঞেস করে—"হাঁপিয়ে পড়োনি তো?" বিরুর সস্নেহ স্বরে কায়া আর একটি উষ্ণ সস্নেহ স্পর্শের আভাস পায়—বাবুর স্পর্শ! তাঁর ধীর পদক্ষেপে ঘরে নক্ করে ঢোকা, তার দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে চেয়ে থাকা। বিরুর চোখের দৃষ্টিতে ঠিক সেই স্নেহেরই আভাস পাওয়া যাচ্ছে। এই অনুকম্পা, অকৃপণ স্নেহ কায়ার মনে ঝড় তোলে—ঠিক যেন শান্ত নিস্তব্ধ দুপুরের হঠাৎ ওঠা উদ্দাম হাওয়ায় উথাল-পাথাল ঘন অরণ্যের দুরন্ত মাতামাতি।

কিছুক্ষণ পরেই তারা একটি কালো রঙের কাঠের কাঠামোর সামনে এসে দাঁড়াল। এই-ই গির্জাঘর। ঘোরানো রাস্তাটা ময়দানে এসে মিশে গিয়েছে। ময়দানের উপর পাথরের একটা বড় চাতাল। দেখে মনে হয়, কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য বাঁধান স্টেজ।

ময়দানের চতুর্দিকে সারি সারি গাছ। গাছের নীচে জল ও থকথকে কাদার মধ্যে

সুন্দর ছোট্ট ছোট্ট নানা রঙের ফুল ফুটে আছে—লাল, নীল, বেগুনী মখমলের মতো নরম নরম ফুল মাঠময় ছড়িয়ে রয়েছে। এই নাম না-জানা ফুলের দল নভেম্বরের বর্ষা, কুয়াশা ও শীত মাথায় করে দাঁড়িয়ে আছে।

কায়া আগে কখনও এত উঁচু পাহাড়ে এমন সুন্দর ফুল দেখেনি। ... চারটে কাঠের সিঁড়ি পার হয়ে গির্জাঘরের বাঁধানো স্টেজে পৌঁছতে হয়। উপরে চড়ার পর বিরুকে দেখা গেল। গির্জাঘরের খোলা দরজায় হাত রেখে বিরু দাঁড়িয়ে। দরজার অপর অংশটি পাথরের উপর পড়েছিল—তার চারদিকে মাটি ও ঘাসের সমাগম। ঠিক যেন জটায়ুর বিশাল পাখা অনন্তকাল ধরে ধরাশায়ী হয়ে রয়েছে।

—"এই-ই গির্জাঘর?" কায়া বিরুর দিকে তাকাল।

—"তা তোমার কি ধারণা? এটা অন্য কিছু?" বিরু কায়ার হতাশায় ইষৎ অসন্তুষ্ট!

—"না না, আমি তা বলছি না।"

গির্জা সম্বন্ধে কায়ার কল্পনা অন্যরকম ছিল—এর একেবারেই বিপরীত। .... চারটে মীনার চারদিকে থাকবে, মাঝখানে উঁচু লম্বা জায়গায় বিশাল ঘড়ি, স্টেনগ্লাসের বড় বড় জানলা। এই গির্জাঘরের সঙ্গে তার কল্পনার গির্জাঘরের একরত্তিও মিল নেই। ... ওরা ভিতরে ঢুকল। কিন্তু ভিতর বলেও তো কিছু নেই — ভিতর বাহির—সব এক। গির্জার অবয়ব বলতে শুধু চারটি দেওয়াল, মাঝখানে বিশাল এক শূন্য গহ্বর! আগে যেখানে 'অল্টার' ছিল, এখন সে জায়গা শুকনো কাঠকুটো, ঘুঁটে-গোবরে ভর্তি এক মালখানা। এই জ্বালানীর গুদামে একটা কালো বিড়াল গুটিসুটি মেরে বসে আছে। কায়াদের পায়ের শব্দ পেতেই সেটা একলাফ দিয়ে দরজার বাইরে অন্তর্হিত হলো। —"ব্যস, এই-ই গির্জা, এরপর আর কিছু নেই!" বিরু বলে। তার বোধহয় কায়ার সামনে নিজেকে হেয় লাগছিল। সে বড় মুখ করে তাকে গির্জা দেখাতে নিয়ে এসেছিল। কিন্তু কায়া যে নিরাশ হয়েছে, সেটা বুঝতে পেরে বিরুর খারাপ লাগছিল।

কায়ার কিন্তু বিরুর প্রতি কোন লক্ষ্যই নেই। সে এবার এগিয়ে অল্টারের ডানদিকে গেল। মনে হয় এখানে আগে চ্যাপেল ছিল। এখানে মেঝেটা উঁচু-নীচু, এবড়ো-খেবড়ো। হাঁটতে গিয়ে পা কখনো খালি মেঝেতে পড়ছে, কখনও কাঠের আলগা তক্তায় হোঁচট খাচ্ছে। গির্জার হাল দেখে এটিকে ঠিক একটা কঙ্কাল বলে মনে হয়। মাংস-মজ্জা সব শিয়ালে খেয়ে গিয়েছে—পড়ে রয়েছে শুধু হাড়ের খাঁচাখানা! এখানকার কাঠের তক্তাগুলিও একে একে উধাও হয়ে বোধকরি আশেপাশের গ্রামে লোকেদের হেঁসেলে গিয়ে ঢুকেছে। কিন্তু কিছু তক্তা ও পাতলা চেরাকাঠের তাপ্পি এখনও অবশিষ্ট রয়ে গেছে—যেখানে হাতরাখা যায় অথবা পা ফেলে হাঁটা যায়। কিন্তু গির্জার এই ধ্বংসাবশেষের পরমায়ু শেষ হতে চলেছে। ...

হঠাৎ, এমা! এটা কি? কায়ার গালে ভিজে ভিজে, নরম নরম কি একটা ঠেকল। অন্ধকারে সেটা তারপর ধড়ফড় করে উড়ে গেল। ইস্! কি বিচ্ছিরি গন্ধ! কায়া বিরুকে ডাকতে গিয়েও ডাকতে পারল না। ও একটা কাঠের তক্তার উপরে বসে পড়ল। তার গলা, বুক, ঠোঁট সব শুকিয়ে উঠেছে। মাথাটা ঘুরতে শুরু করেছে।

—"কি হয়েছে?" বিরু ঘাবড়ে গেল। সে চ্যাপেলের জানলার ধারে দাঁড়িয়েছিল। বাইরে সূর্যের মৃদু আলো তার মুখের উপর এসে পড়েছে।

—"আমার গালে না নরম, আঠা আঠা কি যেন একটা লাগল।" কায়া হাসতে চেষ্টা করে।

—"ওঃ, ওটা চামচিকে। ভয়ের কিছু নেই। চামচিকে অত্যন্ত নিরীহ প্রাণী।"

ও চামচিকে! হ্যাঁ, নামটা সে শুনেছে বটে। কিন্তু দেখলে এই প্রথম। ইঃ! চামচিকে এমন বিচ্ছিরি হয় বুঝি?

—"তুমি কি এ জায়গায় রোজই আস?" কায়া জিজ্ঞেস করলে।

—"হ্যাঁ, এক এক সময়ে আসি। কেউ জানে না যে আমি এখানে আসি। অনেকে তো এও জানে না যে এখানে একটা গির্জাঘরও আছে।"

বিরু এখনও দাঁড়িয়ে। বাইরে থেকে তার দৃষ্টি সরেনি। গাছের মাথায় সূর্যের আলো পড়েছে। গির্জাঘরের অন্ধকার, বাসি গন্ধের বাইরে এক খোলামেলা উজ্জ্বল দুনিয়া।

—"এখন বুঝি এখানে কেউ আসে না?" কায়ার স্বরে কৌতূহল ফুটে ওঠে।

—"কে আর আসবে?" বিরুর স্বরে ঔদাসীন্য—"আগে ইংরেজরা আসত, আমরা ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম।"

—"কি দেখতে ভাই?"

—"ওরা রিক্সায় চেপে আসত। মেয়েরা রঙ-বেরঙের ছাতা মাথায় দিত। তারপর একটু ইতস্তত করে বলে—"ওদের পা কেমন খোলা-ফর্সা ধবধবে পা। এক কুচিও লোম নেই পায়ে।" —বিরু বলে চলে—"এ তো আর আমাদের পা নয়! ওদের পা কেমন মোমের মতো সাদা, নরম।"

—"ধ্যুৎ, ওরা তো নাইলনের মোজা পায়ে দিয়ে থাকে, জান না বুঝি?"—কায়া বলে, "সেইজন্যই তো ..."

—"সেইজন্য কি?"

—"ওদের পায়ের লোম দেখা যায় না।"

—"তা তুমি একথা কেমন করে জানলে?" বিরু সন্দিহান।

—"আমাদের বাড়ির একতলায় না, মিস্ জোসুয়া থাকেন। তাঁর পাও ঠিক এরকম—মোমের মতো সাদা ধবধবে, তাইতেই তো জানতে পারলাম।"

পুরানো গির্জা ঘরের মধ্যে ঘুটঘুট্টে অন্ধকার ও মেমসাহেবদের সাদা ঠ্যাঙ—এ

দুটির মধ্যে বোধহয় বিশেষ কোন যোগাযোগ নেই। তাই তাদের আলোচনাও বেশি দূর এগুলো না। ... দু'জনেই এবার চুপচাপ। ঘরের মধ্যে মাকড়সার জাল ও ঝুল হাওয়ায় নড়ে উঠল, তার ছায়া জানলার ভাঙা কাচের উপরে পড়ল।

—"এটা দেখেছ কায়া?" বিরু দরজা থেকে একটু তফাতে একটা লম্বা কুলুঙ্গির দিকে এলো।

একটা দেওয়ালের গায়ে দুটো কাঠের সরু তক্তা আড়াআড়ি ভাবে লাগানো। একটা নগ্ন দেহ ... তার দুটি টানটান করা হাতে পেরেকের ফুটো এখনও নজরে পড়ে। একটির উপর আর একটি পা ঝোলানো—সেখানেও পেরেকের নিষ্ঠুর চিহ্ন। নরম রোদ ধীরে ধীরে নগ্নমূর্তিটির পায়ের কাছে সরে আসছিল। এর চারদিকে একটা কাঠের ফ্রেম—সেটাও পুরানো ঝুরঝুরে হয়ে গেছে। সেখানে ইতি-উতি রক্তের দাগ। রক্তের ছিটে হাতে, পায়ে, বুকে ও মাথায়। ঘাড় থেকে মাথাটা নীচের দিকে ভেঙে পড়েছে—অর্ধমুদ্রিত চোখ।

এই নগ্ন শরীরে যেখানে পেরেকের ক্ষতের উপর সূর্যের আলো এসে পড়েছে, সেখানে কায়া অপলকে চেয়ে রইলে। তার ভারি ইচ্ছে করল যে অন্তত একবার সে ওই ঘুণ ধরা কাঠের ফ্রেমে ঝুলিয়ে রাখা ওই নগ্ন শরীরের ছোট ছোট ক্ষতগুলি ছুঁয়ে দেখে, কিন্তু সে আত্মসম্বরণ করলে। ওর মনে হলো, যেন মৃদু বাতাস তাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল—না ... না ... ছুঁয়োনা! কায়া রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। হাওয়ার এ ধরনের সবাক স্পর্শের অনুভূতি সে এই প্রথম পেলে। ... হঠাৎ কায়ার চমক ভাঙল। মনে হলো যেন একটা নরম ছায়া ফ্রেমের উপরে পড়ছে। সে পিছন ফিরে গির্জাঘরের দরজার দিকে তাকায়—নাঃ, কেউ তো নেই? তবে কার ছায়া পড়ল?

—"ওমা, তুমি এখানে বসে? জানো একটা ব্যাপার ঘটেছে। এক্ষুনি না কেউ ভিতরে এসেছিল। তুমি দেখেছ?" কায়া কথাগুলি বলতে গিয়েও বিরুর নিস্পৃহ, শান্ত ও উদাসীন মুখ দেখে কথা গিলে ফেলে। কে জানে, কেন এ মুখের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুই বলা চলে না। চামচিকে, তার বিকট গন্ধ, দেওয়ালের ফ্রেমে টাঙানো উলঙ্গ ক্ষতবিক্ষত দেহ দেখে যে শঙ্কা হয় বা ভয় লাগে, বিরুর শান্ত কঠিন মুখের সামনে সেই শঙ্কা বা ভয়ও তুচ্ছ হয়ে যায়। ওর সামনে এলেই একটা অদ্ভুত সঙ্কোচ ও জড়তা তাকে চেপে ধরে। ভয়ের জায়গায় কোন মানুষ এসে দাঁড়ালে কি ভয়টা তুচ্ছ হয়ে যায়? অনির্দিষ্টতা কি হাল্কা বাতাসে ভর দিয়ে উড়ে যায়?

—"এবার ফেরা যাক্!" বিরু দরজার সামনে থেকে সরে দাঁড়াতেই এক ঝলক রোদ এসে গির্জাঘরে পড়ল। ভাঙা কড়িকাঠের মধ্যেও সূর্যের আলো লম্বা হয়ে পড়ল।

—"এত শিগগির যাব?" কায়া যেন দমে যায়। "আর একটুক্ষণ থাকি না কেন?"

—"বাড়ির সকলে ভাববে যে! এখন তো এখানে কিছুদিন থাকবে। এরপর না হয় আবার একদিন আসা যাবে, কেমন?"

কায়া মাথা নাড়ল—একবার, দু'বার। তারপর ধীরে ধীরে দু'দিকে মাথা নাড়তে লাগলে—"উঁহু! আমি এখানে আর থাকবই না!"

—"তুমি কি করে যাবে? তোমার বাবু না আসা পর্যন্ত তো থাকতেই হবে।"

—"আমি পালিয়ে যাব।" কায়া বলে।

—"পালিয়ে যাবে!" বিরু অবাক হয়।

কায়াও যুগপৎ অবাক হয়ে বিরুর দিকে চেয়ে রইলে। ও তো এমনি মিছিমিছি কথাটা বললে! কিন্তু এখন মনে হচ্ছে এই গির্জাঘরের বাসি পচা অন্ধকার ঘরে যা হোক্ কিছু বলা চলে—এমনিই, মিছিমিছি!

—"কি হলো বিরু? ভয় পেয়ে গেলে নাকি?"

—"কিসের ভয়?"

—"এই যে একটু আগে বললাম আমি পালিয়ে যাব?"

বিরুর চোখে আবার আগের মতো শান্ত-সমাহিত ভাব ফিরে এলো। কায়ার পালানোর কথা শুনে সে অত্যধিক বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিরু কোনরকম উৎকণ্ঠা বা উদ্বেগ সইতে পারে না। সে তার ঘরের পিয়ানো, বইয়ের গাদা ও আঙ্গাটির জ্বলন্ত উষ্ণ আঁচের গণ্ডীর মধ্যেই থাকতে ভালোবাসে। কায়ার পালানোর কথায় যে তার মনের মধ্যে ঝড় উঠেছিল, তা হঠাৎ শান্ত হয়ে গেল। কায়ার জগৎ যে শুকনো মরুভূমির ঝঞ্ঝাবাত্যা, সেখানে সে নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেনা।

কায়ার জগৎ বাস্তবিকই সম্পূর্ণ আলাদা। বিরুর সঙ্গে পাহাড়ের টিলায় গির্জাঘরেও সে থেকে থেকে ফিরে যায় তাদের লাল টিনের চালার বাড়িতে। সে বাড়ির সামনে রোদে ঝকঝক করা এঁকেবেঁকে যাওয়া রেল লাইন আছে, মিস্ জোসুয়ার লেটার বক্স রয়েছে।

আচ্ছা, সে যে এই মুহূর্তে এখানে দাঁড়িয়ে, এই গির্জাঘরে, বিরু ঠিক তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে; ওই যে ঠিক তার পিছনে কুলুঙ্গির অন্ধকারে দেওয়ালে টাঙানো পেরেকে ক্ষতবিক্ষত দেহ—এই জগৎ সত্য না যেখান থেকে সে এসেছে, সেটা সত্য? এখন তো মনে হচ্ছে যে পিসির সঙ্গে সে যে দুনিয়াটা পিছনে ফেলে এসেছে, সেটি একটি মায়া, এক প্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছু নয়। এখানে এই উপলব্ধির জগৎটাই তার একান্ত নিজস্ব জগৎ—পরম বাস্তব ও সত্য!

আমি কি এই জগৎ ফেলে পালাতে পারি? অসম্ভব! কায়ার হাসি পেয়ে যায়। ধ্যাৎ, বিরুটা একটা বোকা! আরে, এও তো একটা খেলা। এমন খেলা তো সে আগেও কত খেলেছে। সেই যে বাড়ির খোলা ঝুল-বারান্দার উপর মুক্ত আকাশের নীচে উলঙ্গ হয়ে ... ছি, ছি, কায়ার লজ্জা করতে লাগল। বিরুটা কি ভাবলো কে

জানে। সে তো সত্যি সত্যিই পালিয়ে যাচ্ছে না? তাহলে তার কি দরকার ছিল তাকে এমনভাবে ভয় দেখানোর? কায়ার অদম্য ইচ্ছে হলো যে নিজের বুকটা চিরে বিরুর হাতটা টেনে নিয়ে তার উপর রেখে দেখায়—'দেখো! আমি সত্যি সত্যিই কোথাও যাব না—এটাই একমাত্র সত্য—এতে কোন মিথ্যা বা ছলনা নেই। আমার অন্তরের অন্তস্তলে কোন ছলচাতুরী বা মিথ্যা নেই। তুমি খামোখা ভয় পেয়োনা।'

কায়া পিছন ফিরে দেখল—আরে? বিরু কোথায় গেল? ও বোকার মতো এখানে একা একা দাঁড়িয়ে কি সব ভেবে চলেছে আর বিরুটার কোন পাত্তাই নেই। গির্জার কড়িকাঠে একটা ধূসর রঙের আস্তরণ ছেয়ে ফেলেছে। মেঘ ঘরের ভিতর ঢুকতে শুরু করেছে। কায়া চাপা কণ্ঠে ডাকলে—'বিরু!' তার স্বর প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে এলো—'বিরু ... বিরু ... বিরু ...!!!' কায়া একদৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো ... যাক্! ওই তো বিরু, নীচে উৎরাইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে গির্জাঘরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে। তার পিছনে গাছেরা জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। আশে-পাশে বড় বড় পাথরের চাঁই।

... বিরু ও কায়া চুপচাপ নীচে নামছিল। আকাশ এখন ঘন মেঘে ছেয়ে গেছে। পাহাড়ের উপর নীলাম্বরের ঘন ছায়া এক স্বপ্নলোকের সৃষ্টি করেছে।

—"তুমি আগে-ভাগে চলে এলে যে বড়?" নীরবতা ভেঙে কায়া প্রশ্ন করে।

—"এই ... এমনিই ...।"

বিরু নিঃশব্দে মাথা নীচু করে হাঁটতে থাকে। হাওয়ায় তার চুল বারবার চোখের উপর এসে পড়ছিল।

—"তুমি আমার উপর রেগে গিয়েছ, তাই না?" কায়া দ্বিধাজড়িত স্বরে বলে।

—"না-না। আসলে তুমি এত নিঃশব্দে ও একাগ্রচিত্তে মূর্তিটার সামনে দাঁড়িয়েছিলে যে আমার মনে হলো তুমি প্রার্থনা করছ। তোমাকে ডিসটার্ব করতে আমার সঙ্কোচ হলো।"

—"প্রার্থনা? কাকে? কেন?" কায়া এবার মন খুলে হাসতে লাগলে। তার মনের মেঘ কেটে গেছে।

—"ওই যে, কুলুঙ্গির কাছে ... দেওয়ালের উপর ... যেখানে ... যেখানে ... ওই যে দুটো কালো কাঠের তক্তার সঙ্গে একটা দেহ ঝুলছে ... সেখানে ..." বিরু চুপ করে যায়।

—"ও। আচ্ছা বিরু, ওটা কার দেহ? অমন করে নিষ্ঠুরের মতো পেরেকের সঙ্গে ঝুলছিল?"

—"তুমি জান না বুঝি? উনি তো যীশুখ্রীস্ট—সকলের জন্য, সবাইকার ভালো করতে গিয়ে নিজে তিনি শূলে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।"

—"সক্কলের জন্যে তিনি নিজে মরে গিয়েছিলেন?" কায়ার বিস্ময়ের আর

অবধি থাকে না। —“কিন্তু কেন ...?”

—“সে তো ঠিক আমার জানা নেই। আমি তাঁর সম্বন্ধে বইয়ে পড়েছি।” — বিরু আবার মৌনব্রত ধারণ করে। দুজনে নিঃশব্দে উৎরাই বেয়ে নামতে লাগল। কায়া মনে মনে ঠিক করলে একদিন সে একা একাই এখানে আবার আসবে। ভালো করে সে দেখবে, বুঝবে মানুষটিকে, যে কিনা সক্কলের জন্যে ওই অন্ধকার গহ্বরে কড়িকাঠের পেরেকের সঙ্গে ঝুলে আছেন।

তিন

... দরজাটা আস্তে আস্তে ক্যাঁচকোঁচ করে খুলে গেল। কায়ার ঘুম ভেঙে গেল। এ সময় কে এলো?

নাঃ, বোধহয় কেউ আসেনি—এমনিই হাওয়ায় শব্দ হয়েছে। দুপুরের টানা একঘুমে বিকেল হয়ে গেছে। ঘুমের চোখে তো কিছুক্ষণ বুঝতেই পারলে না যে সে কোথায় আছে! অভ্যাসবশত তার হাতটা বিছানার পাশে চলে যায় ... ছুট্টু কই? ... ও, ছুট্টু এখানে কি করে আসবে? এ তো কাকার বাড়ি। বাস্তবিক এত দিন হয়ে গেল সে এখানে রয়েছে, এখনো পুরোনো অভ্যেস গেল না।

নাঃ, দরজায় খট্ খট্ কড়া নাড়ার শব্দ হয়েই চলেছে। কেউ এসেছে। কিন্তু কে হতে পারে? বিরু? না কাকা? না—দুজনের কেউ নয়।

—"আপনি কি এখন খাবেন, না একটু পরে?" —পাহাড়ি দরজায় দাঁড়িয়ে। কায়ার চোখে এখনও ঘুম জড়িয়ে আছে। জড়িত স্বরে সে পাহাড়িকে ডাকে—"ভিতরে এসো না!"

—"আপনি ঘুমোচ্ছিলেন?" পাহাড়ির দু'চোখে বিস্ময়। তার পরনে একটা ঝুল পাঞ্জাবী—তারও সবকটি বোতাম ছেঁড়া। মাথায় কান ঢাকা খয়েরী রঙের বাঁদর টুপি। টুপিটা চিবুক পর্যন্ত ঢাকা।

—"সাহেব ফিরেছেন?"

—"না আজ তাঁর ফিরতে দেরি হবে।"

—"আর তোমার 'বাবা'?" বিরুকে পাহাড়ি 'বাবা' বলে ডাকে।

—"বাবা তার মাস্টারের সঙ্গে বেরিয়েছে।"

কায়ার মনে পড়ল সন্ধ্যাবেলায় পিয়ানোর লেসন নেবার পর বিরু তার মিউজিক টিউটরকে বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেয়। —তার মানে বাড়িতে কেউ নেই। পাহাড়ি যেতে উদ্যত হলে, কায়া বিছানায় ধড়মড় করে উঠে বসলে—"আরে দাঁড়াও দাঁড়াও ...।" পাহাড়ি যদি চলে যেত, বোধকরি তার পিছন পিছন দৌড়ে তাকে ধরতেও পিছপা হতো না।

—"না-না, 'ছোটবিবি' ..." পাহাড়ি অপ্রস্তুত হয়। "বাতি জ্বালিয়ে দিই?"

—"এক্ষুনি বাতি জ্বালানোর কি হলো? বাইরে দেখো না, এখনও কত্তো আলো

রয়েছে?”

বাইরে সূর্যাস্তের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে। পাহাড়ে পাহাড়ে তার সোনালী রেশ। তাদের বাড়িতে খুব তাড়াতাড়ি অন্ধকার হয়ে যায়। কাকার বাড়িটা অনেক উঁচুতে, তাই অন্ধকারও দেরিতে নামে। বাড়ির জানলায় এখন পাহাড়ের সূর্যাস্তের আলো পড়েছে।

—“আমি এবারে যাই?” পাহাড়ি গোল গোল চোখে কায়াকে নিরীক্ষণ করে। বেচারা কখনও এপায়ে কখনও ওপায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। সে ভীষণ অস্বস্তি বোধ করছে।

—“কোথায় যাবে?” কায়াও নাছোড়বান্দা।

পাহাড়ি অবাক হয়ে তার দিকে তাকালে—“কোথায় আবার? আমার কোয়ার্টারে?”

—“তোমার কোয়ার্টার কোথায়?”

—“আপনি জানেন না বুঝি?” পাহাড়ি এবার উৎসাহ বোধ করে। অজান্তেই সে তার সমস্ত দ্বিধা ও জড়তা ভুলে দুই পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়।

—“ওই যে নীচে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে? সেটা পেরুলেই সো ... জা ... খুব কাছেই আমার কোয়ার্টার। একটা উৎরাইয়ের ওয়াস্তা কেবল।”

কায়া চেয়ে চেয়ে পাহাড়িকে দেখতে লাগল।

—“আমি না কোন দিনও ওখানে যাইনি।”

—“আপনি যাবেন?”

—“আমি কি ওখানে যেতে পারি?”

—“ওমা যেতে না পারার কি আছে?”

কায়া হঠাৎ স্থির করলে যে সে পাহাড়ির সঙ্গে যাবে। কিন্তু তারপরেই তার মনে হলো কাজটা কি ঠিক হবে? কাকা বাড়ি নেই, তাঁকে না জিজ্ঞেস করে কোথাও যাওয়া কি ঠিক? তারপরেই মনে হলো, বিরুও বাড়ি নেই, পুরো বাড়িটা অন্ধকার, খাঁ খাঁ করছে। অন্তত কিছুক্ষণ তো এই খাঁ খাঁ করা ভুতুড়ে নির্জনতার হাত থেকে রেহাই পেতে পারি!

আস্তে আস্তে বাইরের আলো কমে আসছে। একটা রঙিন, মিষ্টি উজ্জ্বল আলো জায়গাটায় ছেয়ে রয়েছে। অন্ধকারেও এই রঙিন ভাবটা বজায় থাকে।

— “আপনি সত্যি সত্যিই যাবেন তো আমার সঙ্গে?” — পাহাড়ির মনে দ্বিধা।

— “হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয়ই যাব। তুমি এগোও, আমি আসছি।”

কায়া ঝটপট জামা বদলে নিলে। বাড়িতে মা সবসময় বকাবকি করেন, সালোয়ার কামিজ পরতে বলেন। এখানে কেউ বলার নেই! তাই সে তার নীল রঙের ফ্রকটি বের করল। আসার সময় এই একটিমাত্রই ফ্রক সে সঙ্গে করে নিয়ে

আসতে পেরেছে। অবশ্য এই ফ্রকটা স্কুল-য়ুনিফর্ম। মনটা একটু খুঁত খুঁত করতে লাগল ... স্কুল য়ুনিফর্মের ফ্রক পরা মানেই স্কুল স্কুল ভাব ... সেই ক্লাসরুম, ডেস্ক-বেঞ্চ, বইখাতার গাদা—এখনও এই ফ্রকটা থেকে স্কুল স্কুল গন্ধ বেরুচ্ছে। ফ্রকটার দু'দিকে পকেট আছে। হাঁটু অব্দি এটা ঝুলে পড়েছে। পকেটে এখনও গোটা কয়েক পেন্সিল ও চকের টুকরো পড়ে রয়েছে।

বাইরে এসে কায়া দেখলে পাহাড়ি সিঁড়ির পরে দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করছে।

—"একটু দাঁড়ান 'ছোটবিবি', আমি টর্চ নিয়ে আসছি। নীচে কোথাও আলো নেই।"

—" না না, কিছু দরকার নেই—টর্চ-ফর্চ আমার লাগে না। অন্ধকারে আমার কোনও অসুবিধা হয় না।" কায়া তাড়াতাড়ি বলে। ওর টর্চের বড় ভয়! অন্ধকার ঘরে তবুও একরকম। কিন্তু বাইরে টর্চের আলো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেললে, সেটা দেখে তার কেমন যেন মাথা ঘুরে ওঠে। আর বাতির প্রয়োজনটাই বা কিসে? বেশ তো বারান্দায় আলো জ্বলছে। এই আলোটা নীচে উৎরাই পর্যন্ত পৌঁছচ্ছে। তার ওপিঠে কোয়ার্টারের আলো দেখা যাচ্ছে। শুধু মধ্যেকার একটা ছোট্ট অংশে একটু অন্ধকার রয়েছে—তা তাতে কোন অসুবিধা হবে না।

নীচে পথের উপর নভেম্বরের শুকনো করকরে পাতা রাস্তায় বিছানো রয়েছে। গাছের লম্বা সারি, কোয়ার্টার অব্দি সারে সারে দাঁড়িয়ে। দূর থেকে দেখে মনে হয় কেউ যেন দাঁড়িয়ে আছে। নির্মেঘ আকাশে তারার চুমকি জ্বলছে! এমনটিই ঠিক তাদের বাড়ির ছাদ থেকেও দেখা যায়।

পাহাড়ি, রাস্তার মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লে।

সামনেই দোতলা কোয়ার্টার। নীচের তলায় অন্ধকার। শুধু উপরের দুটি ঘরে বাতি জ্বলছে।

—"আরে? দাঁড়িয়ে পড়লে কেন? চল না।" কায়া পাহাড়িকে ঠেলা মারে। সে কিন্তু একচুলও নড়লে না। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ কায়ার হাত ধরে হ্যাঁচকা টান মেরে তাকে নীচের অন্ধকার অংশে নিয়ে যায়। পাহাড়ি উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তার হাত কাঁপছে, গরম গরম নিঃশ্বাস কায়ার মুখের উপর পড়ছে। তারা দুজনে একটা শেডের তলায় দাঁড়ায়। জায়গাটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। কায়া পাহাড়ির হ্যাঁচকা টানে এত হতভম্ব হয়ে গিয়েছে যে একটা টুঁ শব্দ পর্যন্ত করতে পারলে না। সে বুঝতে পারছে না যে পাহাড়ি কেন এমন করছে। তার ঘন ঘন উষ্ণ শ্বাস তার গায়ে লাগছিল। শেডের উপরে মৃদু খরখর শব্দ হলো। শেডটা নড়ে উঠল। কিন্তু উপরে কি হচ্ছে বোঝা গেল না। পাহাড়ি সিঁড়ির দিকে একটু এগিয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে কেউ নামছে।

কায়া চোখ বড় বড় করে দেখার চেষ্টা করলে পাহাড়ি কি দেখছে। উপর ও

নীচের তলার মধ্যে গোনা-গুনতি সিঁড়ি—গোটা পাঁচেক কি গোটা ছয়েক। কায়ার মতো মেয়ে সেটা এক লাফে পার হতে পারে।

—"পাহাড়ি, কে নামছে?"

—"আঃ ছোটবিবি দাঁড়াও, এখন কথা বলো না।"

উপরের আলো এবার নীচের সিঁড়ির উপর পড়েছে। সিঁড়ি বেয়ে যিনি নেমে আসছেন তিনি তার কাকা! ... কায়া হতবুদ্ধি! কাকা এত রাতে কোয়ার্টারে কেন এসেছেন? কাকাকে দূর থেকে অন্ধকারেও চেনা যায়—পেশীবহুল লম্বা-চওড়া শরীর, হাতে ছড়ি! ছড়িটা দিয়ে সিঁড়ি ঠাহর করতে করতে তিনি নামছেন।

কায়া চুপচাপ অন্ধকারে শেডের তলায় দাঁড়িয়ে থাকে। কাকার লম্বা-চওড়া শরীরটা ধীরে ধীরে ঘন গাছের আড়ালে, বাড়ির দিকে মিলিয়ে গেল। দূর থেকে তাঁর ছড়ির খট্ খট্ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

—"এবার যাওয়া যাক্" পাহাড়ি বলে।

ওরা দুজনে শেডের বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে প্রকৃতি এখন শান্ত। শান্তি পাহাড়ির মুখেও। আগের মতো এখন আর তার মুখে উত্তেজনা নেই।

—"তুমি এখানে এসে কেন লুকালে পাহাড়ি?"

পাহাড়ি জবাব দিলে না। তার মুখে একটি ইঙ্গিতপূর্ণ হাসি খেলে গেল। কায়া বুঝল যে পাহাড়িকে দেখে যতটা ভালো মানুষ বলে মনে হয়, সে ঠিক ততটাই সেয়ানা। মঙ্গতুকেও দেখে তাই মনে হয়। পাহাড়ি লোকেরা সকলেই বোধহয় একরকম। তারা যেমন খুব ভালো মানুষ বা নিরীহ নয়, তেমনি আবার তাদের মধ্যে কোন ছলচাতুরীও থাকে না। এরা এমন এক অপরিচিতের বর্মে নিজেদের ঢেকে রাখে যা ভেদ করা কায়ার পক্ষে দুরূহ ও দুর্বোধ্য!

একবার কায়ার ইচ্ছে করল পিছন ফিরে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। কাকাকে এখন এখানে এই অসময়ে দেখে কেন জানি না তার সমস্ত উৎসাহ উড়ে যায়। তার পা শ্লথ হয়ে পড়ে। ইচ্ছে করছে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে বসে থাকে।

সে নিজেই বা এত রাতে বাড়ির চাকরের সঙ্গে কি করতে এখানে এসেছে? নিজেকে সে মনে মনে ধিক্কার দেয়।

—"একি, আপনি আসবেন না?"

পাহাড়ি গলার স্বরে এখন আর কোন উত্তেজনা নেই। তার স্বরে এখন আতিথ্যের উষ্ণ আবাহন! সে স্বর কেবলমাত্র কর্ণকুহরেই প্রবেশ করে না, সেটি যেন পাহাড়িরই অবয়ব ধরে তার সামনে দাঁড়িয়ে তাকে তার বাড়িতে আসার নিমন্ত্রণ জানায়। এ নিমন্ত্রণ ঠেলে সরিয়ে দেওয়া যায় না।

কয়েকটি সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে যেতে তাদের বিশেষ সময় লাগল না। উঠতেই ছোট্ট একটি ঘরের সঙ্গে লাগোয়া খোলা ছাদ—কাঠের রেলিঙে ঘেরা।

পিছনের দিকে দুটি ঘর—একটি রান্নাঘর, অপরটি শোবার ঘর। রান্না ঘরে আলো জ্বলছে। ভিতরে কেউ নেই। শোবার ঘরের সামনে চিকের পর্দা ফেলা। ভিতরে আলো জ্বলছে—যদিও বাইরে থেকে তা দেখা যাচ্ছে না।

—"ভিতরে কেউ নেই নাকি?" কায়া একটু দ্বিধার স্বরে পাহাড়িকে জিজ্ঞেস করে। পাহাড়িও একটু ইতস্তত করে চিকের পর্দা তুলে ঘরের ভিতরে ঢুকল।

কায়া ঘরের কাছে থমকে দাঁড়ায়!

এখন চতুর্দিকে রাতের স্তব্ধতা। কোয়ার্টারের পিছন দিকে শিয়ালের 'হুক্কাহুয়া' আর কয়েকটি কুকুরের ভৌ ভৌ ডাক শোনা যাচ্ছে। ... পাহাড়ি চিক তুলে কায়াকে আহ্বান জানায়—"ভিতরে আসবেন না?" তার ঠোঁটে এখনও হাসিটা লেগে রয়েছে।

কায়া ভেবেছিল মঙ্গতুর মতনই পাহাড়ির কোয়ার্টারে চটের আসন, ঘর গরম রাখার জন্য উনুনের আগুন, তার চতুর্দিকে ছাই জমে আছে, আর একটা উগ্র, মাথা ধরানো তামাকের গন্ধ। কিন্তু নাঃ, ভিতরে উঁকি দিতেই সে চমৎকৃত হয়ে গেল। দেওয়ালে হেলান দিয়ে শিথিলভাবে বসে এক নারী। সে কায়ার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল—তার দৃষ্টিতে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা। তারই মতো কায়ারও চোখে কৌতূহল। কে এই নারী? তার পরণে লাল লহঙ্গা, নাকে মস্ত বড় নথ—তার সাদা পাথরটা আলোয় ঝকমক করছিল। তার হাতদুটি অলসভাবে তার কোলে পড়ে রয়েছে। একটা মাদুর ঘরের মাঝখানে বিছানো রয়েছে।

—"এদিকে এসো!" সে মিষ্টিসুরে কায়াকে ডাকলে।

কায়া পিছন ফিরে পাহাড়ির দিকে তাকালে। ঘরের চৌকাঠের কাছে পাহাড়ি দুটি পা ফাঁক করে দু'দিকে ছড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার মধ্যে এক তটস্থ ভাব। সে খুব মন দিয়ে শিয়ালের ডাক শুনছে। শিয়ালের কান্নারও যেন বিরাম নেই।

—"এসো না!" —মহিলাটি আবারও কায়াকে ডাকলে। মৃদুমধুর কণ্ঠ, কিন্তু সে কণ্ঠে এমন একটি আদেশের স্বর আছে যে কায়া এবার সে ডাক উপেক্ষা করতে পারলে না। সে ভিতরে ঢুকে মাদুরের উপর বসে পড়লে।

ঘরটা সুন্দর ও ছিমছাম-পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘরের এককোণে বিছানা পাতা, তার উপর একটি পরিষ্কার নীল চাদর বিছানো। তার ঠিক সামনেই রান্নাঘরে যাবার দরজা। এই দরজার গায়ে নানা ফিল্মস্টারের রঙ-বেরঙের ছবি সাঁটা রয়েছে। মাদুরের এ পাশে কালো কাপড়ে ঢাকা সেলাইয়ের কল। বিছানার পিছন দিকে একটা বিরাট সাদা টিনের সিন্দুক। তাতে পিতলের একটা বড় তালা ঝুলছে। এই ঘরের সঙ্গে মঙ্গতুর ঘরের কোন তুলনাই করা চলে না। কায়ার লজ্জা করতে লাগল— 'এ মা, এ কোথায় এসে পড়লাম'। কিন্তু এখন তো ওঠাও যাবে না। মহিলাটির নজর এখন সরাসরি কায়ার উপর।

কায়া একটু লজ্জিতভাবে নিজের ফ্রকটা পা পর্যন্ত টেনে নিলে। তার এখন প্রচণ্ড অস্বস্তি হচ্ছে। এ ধরনের অস্বস্তিকর পরিবেশে সে আগে কখনও পড়েনি।

—"বড়বিবি ফিরে গেছেন?" মহিলাটি নরম স্বরে কথা বললে।

—"বড়বিবি কে?" কায়া আশ্চর্য হয়।

—"যিনি তোমার সঙ্গে এসেছিলেন?"

—"ও পিসিমা? আপনি তাঁকে চেনেন? দেখেছেন কখনও?"

—"ওমা, তা আবার দেখব না? কতবার দেখেছি! এখান থেকে সব দেখা যায়।"

মহিলাটি হেসে উঠলে। তার নাকের নথ হাসির সঙ্গে সঙ্গে দুলে উঠল। তার চেহারার সঙ্গে পাহাড়ির চেহারার হুবহু মিল। পার্থক্যের মধ্যে তার কপালটা একটু উঁচু আর মুখের মধ্যে একটা হলদেটে ভাব। মনে হয় একটু জল লাগলেই বুঝি এই হলদে রঙটি গলে যাবে।

কায়া এখন মহিলাটির প্রতি একটা অদ্ভুত আকর্ষণ বোধ করে।

—"এখন তো বেশ কিছুদিন এখানে থাকবে, নয়?"

—"হ্যাঁ, ডিসেম্বর অব্দি। বাবু নিতে আসবেন।" — মহিলাটিও মাথা নাড়লে।

—"কোন ঘরে আছ? 'পুরানো বিবি'র ঘরে?"

—"আপনি কেমন করে জানলেন?"

—"জানি। যদিও কোনদিনই ও বাড়ি দেখিনি।" খুব মৃদুস্বরে সে বলে।

—"আপনি কি কখনও কাকার বাড়ি যাননি?"

—"নাঃ, আমি ওখানে যাই না।"

সেকি! কায়া অবিশ্বাসের চোখে তার দিকে তাকালে। কোয়ার্টার থেকে তার কাকার বাড়ির মধ্যে মোটে ছোট্ট একটি রাস্তার ব্যবধান! সেটা পেরিয়ে কি কাকার বাড়ি যাওয়া যায় না?

মহিলাটি হাসতে লাগলে। কায়ার সে হাসি দেখে খুব ভালো লাগল— ঠিক যেন একটি বাচ্চা মেয়ে হাসছে।

—"আমি ওখানে যাই না বটে, কিন্তু স-ব জানি। তুমি যে ঘরে আছ, সে ঘরে তোমার বাবুও এসে থাকেন। উনি ও ঘরটায় থাকতে ভালোবাসেন। আমি তোমার মাকে কখনও দেখিনি। তিনি বোধকরি এখানে কোনদিনও আসেন নি।"

— "বাবুর সঙ্গে আপনার আলাপ আছে?"

—"কোথায় আর! আমি তো সর্বদা এই কোয়ার্টারের চৌহদ্দির মধ্যেই থাকি।"

—"উনি রিক্সায় চেপে এখানে আসেন ..." এবারে পাহাড়ি কথা বলে।

সে এখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে। কায়া তার অস্তিত্ব একেবারেই ভুলে গিয়েছিল।

—"আমার ছেলে ..." মহিলাটি বলে। পাহাড়ি হাসতে লাগলে। ঠিক সেই মুহূর্তে কায়ার কাছে ঘরের ও বাইরের পরিবেশ বিস্বাদ লাগল। একি? সে কোথায় বসে আছে? বাইরে জঙ্গলে শিয়ালের কান্না, বৃক্ষ পরিবেষ্ঠিত এই নির্জন কোয়ার্টার, কোয়ার্টারের মধ্যে এক অচেনা নারী, আর তার সামনে সে বসে—যে কিনা কায়া সম্বন্ধে, তার আত্মীয় পরিজন সম্বন্ধে সব কিছু জানে, অথচ তার সম্বন্ধে সে নিজে কিছুই জানে না।

আচ্ছা, আজ যদি সে পাহাড়ির সঙ্গে এখানে না আসত, তাহলে কি হতো? এই মায়াবিনী নারীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ বা পরিচয় হতো না, সে জানতেও পারত না যে সে এখানে, এই কোয়ার্টারের বাসিন্দা।

মহিলাটি অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে আর কায়া তাকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে চলেছে। তার দুই ঠোঁটের মাঝে, নথের নীচে তার কথা বলার সময় ছোট্ট একটা ফাঁক দেখা যাচ্ছে। নথের সঙ্গে সঙ্গে সেটাও যেন ঝকমক করে উঠছে। গলার স্বর ভরাট, কথার উচ্চারণ তীক্ষ্ণ ও স্পষ্ট! কথার ভঙ্গীতে মনে হয় ভদ্রমহিলার আত্মবিশ্বাসের যথেষ্ট অভাব। তার দুই হাত উড়নির নীচে ঢাকা। পা দুটি লহঙ্গার বাইরে বেরিয়ে আছে — মেহেন্দী রঞ্জিত টুকটুকে পায়ে রূপার মল। মল দুটি দেখে কায়ার মঙ্গতুর কথা মনে পড়ে গেল। সে এই মল সম্বন্ধে নানা কথা সেদিন রাতে বলেছিল।

—"আপনি কি সমস্ত দিন-রাত এখানেই পড়ে থাকেন?" হঠাৎ কায়া জিজ্ঞেস করলে।

—"নাহলে আর কোথায় যাই?" মহিলার স্বরে বিস্ময়।

—"কেন, বাইরে কখনো ঘুরতে-টুরতে যান না?"

—"বাইরে?" মহিলাটি যেন আকাশ থেকে পড়লে। তার জগৎ যে রান্নাঘর ও শোবার ঘরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ, তারও যে একটা আলাদা স্বাদ আছে, সে কথা সে কায়াকে কি করে বোঝাবে? —"হ্যাঁ, একবার, নীচে ঝর্ণা দেখতে গিয়েছিলাম বটে। তুমি ঝর্ণাটা দেখেছ?" তিনি হেসে কায়াকে জিজ্ঞেস করেন।

—"ওমা, এখানে ঝর্ণা আছে নাকি?"

— "হ্যাঁ, আছে। কেন তোমার কাকা বুঝি তোমায় এ সম্বন্ধে কিছু বলেননি?"

কায়ার কানে 'তোমার কাকা' শব্দটি টং করে সেতারের ঝঙ্কারের মতো বেজে উঠল। এই কথাটি সে মনের সমস্ত মাধুর্য মিশিয়ে উচ্চারণ করলে। হলদে চামড়ার উপর ঈষৎ কুঞ্চন দেখা দিল।

—"এবার তুমি বাড়ি যাও। সকলে হয়ত ভাবছে।"

মহিলাটির স্বরে এমন একটি দৃঢ়তা আছে যা না মেনে পারা যায় না। কায়া উঠে দাঁড়ালে। সে বুঝে উঠতে পারলে না যে 'সকলে ভাববে'র 'সকলে'টা কারা?

কে তার জন্যে ভাববে বা কে তার অপেক্ষায় পথ চেয়ে বসে আছে? কায়া এখানে এসে অবধি সবাইকে যেন ভুলে গিয়েছিল। পারলে ও রাতভোর এখানেই থাকে।

—"আমি কি আবার এখানে আসতে পারি?" কায়া একটু ইতস্তত করে জিজ্ঞেস করলে।

—"তুমি এ জায়গায় আবার আসতে চাও?" মহিলাটি কৌতুকপূর্ণ দৃষ্টিতে কায়ার দিকে তাকায়। ... "এখানে কে-উ আসে না!"

পাহাড়ি তার মায়ের দিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালে। তার দৃষ্টিতে সন্দিগ্ধতার সাথে সাথে একটা অবিশ্বস্ততার অস্বস্তি ছিল। বাচ্চারা যেমন বড়দের মিথ্যা ভাষণে সন্দিহান হয়েও মুখ ফুটে কিছু বলতে পারে না, তেমনই শঙ্কা, সন্দেহ ও অবিশ্বাস পাহাড়ির দৃষ্টিতে! এ এক অব্যক্ত যন্ত্রণা! পাহাড়ির মুখের ভাবে যন্ত্রণার চেয়েও লজ্জাই বেশি প্রকাশ পাচ্ছে।

মহিলাটি উঠে দাঁড়িয়ে কায়ার কাছে এলো। কায়া ভাবলে উনি রান্নাঘরে যাচ্ছেন। কিন্তু তিনি কায়ার সামনেই দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর মৃদুস্বরে বললেন, "এখানে আসার কথা কারুর কাছে বোলনা কিন্তু, বুঝলে?" পরক্ষণেই তিনি দ্রুত পদক্ষেপে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলেন। কায়া বুঝতে পারলে তার শেষকটি কথা স্রেফ তাকেই লক্ষ্য করে বলা হয়েছে—পাহাড়ির কানে সেটি যায়নি। পাহাড়ি মনের আনন্দে বাইরে বসে সিটি বাজাচ্ছে।

বাড়ির কাছাকাছি এসে পাহাড়ি দাঁড়িয়ে পড়লে।

—"আমি ফিরে যাই, 'ছোটবিবি'? আপনি একা একা যেতে পারবেন তো?"

—"তুমি আমার সঙ্গে বাড়ি পর্যন্ত যাবে না, পাহাড়ি?"

—"আমায় রান্না করতে হবে যে!"

—"ঠিক আছে, তুমি যাও। আমি একাই চলে যাব'খন।" কায়া কথা শেষ করার আগেই পাহাড়ি দৌড় দিলে। তার ছায়া কোয়ার্টারের দিকে মিলিয়ে গেল।

বাড়িতে সিঁড়ির কাছে এসে কায়া থমকে দাঁড়ায়। সমস্ত ঘরের আলো জ্বলছে।

কায়ার হঠাৎ অনেক আগে দেখা একটি পুরানো ছবির কথা মনে পড়ে গেল। সমুদ্রের মধ্যে অন্ধকারে একা একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে! কাকার বাড়িটিও কায়ার ঠিক জাহাজ বলেই মনে হয়। অক্টোবর-নভেম্বরের সময় যখন দমকা হাওয়া থাকে না, তখন বাড়িটাকে ঠিক ছবিটার জাহাজ বলে মনে হয়। লম্বা গ্যালারীটা যেন জাহাজের ডেক। সেখানে সব সময় একটা ছোট গোল টেবিল ও কিছু ইজিচেয়ার রাখা থাকে। গরমকালে কাকা বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে সেখানে বসে তাস খেলেন ও খাওয়া-দাওয়া করেন। সেপ্টেম্বর মাস পড়তে না পড়তেই তারা সব নীচে শহরের দিকে চম্পট

দেয়। তখন গ্যালারী খালি খালি দেখায়। টেবিল, চেয়ার আর ফুলের টবগুলি যেন গরমকালের মৌরসীপাট্টার সাক্ষ্য বহন করে। কাকা বাড়িতে থাকলে অনেক রাত পর্যন্ত গ্যালারীতেই কাটান—সম্পূর্ণ একা! সঙ্গী বলতে টেবিলের উপর একটা বোতল, একটা গেলাস আর এক জগ জল—ব্যস, আর কিচ্ছু না। এছাড়া থাকে সামনে সঞ্জৌলীর আলোকমালা ... পাহাড়ের সারির মাঝে মিট্ মিট্ করে জ্বলে। ... কাকার বাড়ির গ্যালারীর এটিই সবচেয়ে বড় বিউটি, আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু!

এখানে বসে একসাথে তিনটি পাহাড় দেখা যায়। ডাইনে জাখুপাহাড়, সামনে সঞ্জৌলীর শহরতলী আর বাঁয়ে ইলশিয়ম রাউন্ডের পাহাড়মালা, যেটা সোজা ক্যাথু পর্যন্ত গিয়ে মিশেছে। তিনটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী উপত্যকা কোথাও সমতল, কোথাও এবড়ো-খেবড়ো, কোথাও উঁচু কোথাও বা নীচু! কোন কোন জায়গা ঘন জঙ্গলে ঢাকা আবার কোথাও একেবারে চাঁচাছোলা পরিষ্কার! এর ভিতরে ইতি-উতি বাড়িগুলি দেখে মনে হয় ঠিক যেন কেউ তাস খেলতে খেলতে এলোমেলো করে সেগুলি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেছে! সন্ধ্যা হতে না হতেই বাতি জ্বললে দূর থেকে মনে হয় যেন জোনাকি দলের মেলা বসে গিয়েছে। কুয়াশা পড়লে (এ সময় কুয়াশা পড়ে থাকে) বোধ হয় সামনে সাদা ধবধবে ঝিলের মধ্যে সব যেন একজোট হয়ে সাঁতার কাটছে। কুয়াশা সরলেই আবার সেই জোনাকির মেলা! ... এই খেলা যতক্ষণ চলে, ততক্ষণ কাকাও চেয়ার ছেড়ে নড়েন না। হাতে গেলাস ও সামনে বোতল নিয়ে তিনি তন্ময় হয়ে 'জাহাজের ডেকের উপর' বসে বসে প্রকৃতির রূপ উপভোগ করেন।

জাহাজের ডেকের উপর কাকা এখনও বসে!

—"কে? কাকার গলার স্বর গ্যালারীতে গুঞ্জন তুলল।

পিছনে পালাবার কোন রাস্তা নেই। অবশ্য কায়া পালাতে চায় না। সে সোজা এবং দৃঢ় পায়ে হেঁটে কাকার চেয়ারের সামনে দাঁড়ায়।

—"ও, তুই! বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলি বুঝি?" কাকার মুখের উপর আলো পড়েছে।

—"হ্যাঁ।" কায়া জবাব দিলে।

কায়ার চোখের উপর আবার ভেসে উঠল—কাকা কোয়ার্টারের সিঁড়ি ভেঙে তর্ তর্ করে নেমে যাচ্ছেন। সত্যিই কি তিনি কাকা ছিলেন না আর কেউ? সে ভুল দেখেনি তো? এই যে এখন কাকা এখানে বসে আছেন, তার সামনে ছোট তেপায়া, তার উপর বোতল, কাকার হাতে গেলাস—এই কাকা সত্য না সিঁড়ি দিয়ে চোরের মতো নেমে যাওয়া কাকা সত্য? না সবটাই একটি মরীচিকার মতন মিথ্যা, যা পাহাড়ের অন্ধকারে, ঘন গাছের অরণ্যেই সম্ভব?

—"একাই গিয়েছিলি?"

—"ন্‌না ... এ ... পাহাড়ি সঙ্গে ছিল।"

কাকা হাতে গেলাস তুলে নিলেন। গেলাসের তলানীটুকুতে চুমুক দিলেন।

—"এখানে মন বসেছে?"

—"হ্যাঁ ... এ্যাঁ ...।"

—"বাড়ির কথা মনে পড়ে না?"

কায়া কাকার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল—পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে লাগলে। একবার মনে হলো যে বলে—না, বাড়ির কথা একেবারেই মনে পড়ে না। কিন্তু সে একবার তার বেড়াতে যাবার ব্যাপারে মিথ্যা কথা বলে ফেলেছে। দ্বিতীয়বার অনৃতভাষণে তার জিহ্বা সায় দিলে না।

—"তোমার বাবুর কিন্তু এখানে মন টেঁকেনা জানো? এখানে এলেই তাঁর একটা পালাই পালাই ভাব থাকে।"

কাকা মিষ্টি করে হাসলেন। বাবু তাঁর বড় ভাই। কিন্তু কাকার হাবেভাবে মনে হয় বুঝিবা তিনি তাঁর ছোট ভাই। বাবুর উল্লেখে কাকার গলার স্বরে বাৎসল্য ভাব ফুটে ওঠে। বস্তুত, আর্মিতে এত বছর থাকার দরুন তাঁকে সবসময়ই বাইরে বাইরে ঘুরতে হয়েছে। উষ্ণ গৃহকোণ, পারিবারিক স্নেহবন্ধনের স্বাদ তাঁর প্রায় জোটেইনি বলা যায়। কাজে কাজেই বাবু আর পিসির প্রতি তাঁর মমতা ও আসক্তি প্রয়োজনেরও অতিরিক্তই রয়ে গিয়েছে। যেন এতদিনের অভাব তিনি কড়ায়-গণ্ডায় পুরিয়ে ফেলতে চান।

—"তোর এখানে প্রথমবারের আসার কথা মনে আছে, কায়া?"

—"প্রথমবাব? সেটা কবে কাকা?" কায়া আগ্রহভরে তাকায়।

—"তুই তখন এত্তোটুকু! বছর দুই বয়স হবে। দাদা তোকে টাট্টু ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে এসেছিলেন। তখন তোর কাকিমা বেঁচে। তিনিই তো তোর নামকরণ করেছিলেন। তুই এক্কেবারে রোগা, লিকলিকে ছিলি, ঠিক যেন হাড়ের উপর চামড়া বসানো ...।"

কাকা কি মদের ঝোঁকে কথা বলছেন? না না, কাকা তো চিরকালই তার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন, ঠিক বন্ধুর মতো। মিস্ জোসুয়াও তো কায়াকে একজন 'দায়িত্বজ্ঞান সম্পন্ন মেয়ে' বলেই সব সময় উল্লেখ করেন ... হঠাৎ কায়ার বুক ঠেলে কান্না বেরিয়ে আসে। তার বাড়ির কথা মনে পড়ে যায়—ছুটু, মা, মিস্ জোসুয়া, মঙ্গতু, মিস্ জোসুয়ার লেটার বক্সটা, রেললাইন্ ... ওঃ ...!!! উদ্‌গত অশ্রু রোধ করে কায়া কাকাকে বললে—"মিস্ জোসুয়া তোমার কথা খুব বলেন।"

কাকা গেল্লাসের থেকে চোখ তুলে তাকালেন—"মিস্ জোসুয়া? আরে বুড়ি এখনও বেঁচে আছে?" —কাকা হাসলেন। হাসলে পর তাঁর চোখের তলার চামড়াটা কুঁচকে যায়। কায়া এবার কাকাকে ভালো করে লক্ষ করে। মুখের

বলিরেখা সব চোখের তলায় এসে জমা হয়ে আছে। এতদিন সেগুলি দেখা যায়নি। এই মুহূর্তে কাকার নির্মল হাসিতে তারাও আত্মপ্রকাশ করল। ... কাকাও বুড়ো হয়ে গেছেন!

—"কিছু লোক এ পৃথিবীতে অখণ্ড পরমায়ু নিয়ে আসে, বুঝলি!" —কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

... বাইরে পাতলা কুয়াশা হাল্কা মেঘের মতো উড়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথার উপর আকাশে তারা ফুটে উঠেছে—ঠিক যেন একটি ময়লা, হলুদ নিষ্প্রভ পর্দার উপরে চুমকি বসানো।

—"তোর শীত করছে না তো?" —হঠাৎ কাকা বর্তমানে ফিরে আসেন। কায়া জোরে জোরে মাথা নেড়ে না বললে। বাপরে, আবার ভিতরের ঘরে? —একা একা? ভাবলেই গায়ে কাঁটা দেয়। কাকাও ওঠার কোন উপক্রম করলেন না। কায়া আশ্বস্ত হয়ে চেয়ারে আবার আরাম করে গা ঢেলে দেয়।

—"বিরু এখনও ফেরেনি বুঝি?"

—"ও দেরিতে ফিরবে। ওর টীচার সঞ্জৌলীতে থাকেন তো ...।" কাকার যেন হঠাৎ কিছু মনে পড়ল। ... "তুই বিরুর পিয়ানোটা দেখেছিস?"

—"হ্যাঁ ..."

—"এটা কিন্তু আমায় কিনতে হয়নি, ফাউ পেয়েছি। এখন এটা বিরুর সম্পত্তি।"

কাকা বৈঠকী মেজাজে গল্প করে চলেছেন। তিনি যেন কায়ার সঙ্গে নয়, তাঁর সমবয়সী বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গরমকালে মজলিসি বৈঠকে জমিয়ে বসে আড্ডা দিচ্ছেন।

—"এই পিয়ানোটা কলকাতা থেকে আনিয়েছি।"

—"তুমি নিয়ে এসেছিলে বুঝি?"

—"উঁহু, আমি নয়, আমার চিঠি।" কাকার চোখ চকচক করে। তিনি উৎসাহ-সহকারে বলতে লাগলেন—"ব্যাপারটা হলো কি জানিস? এখানে তো ভেরেণ্ডা ভাজা ছাড়া আর কোন কাজ নেই। সব সময় কি-করি, কি-করি ভাব। এইসময় হঠাৎ একদিন স্টেট্সম্যানে একটা বিজ্ঞাপন নজরে পড়ল। কোন এক ইংরেজ মিঃ উড নিজের পুরো লাইব্রেরি বেচে দেশে ফিরতে চায়। লাইব্রেরির সঙ্গে পিয়ানোটা ফাউ। অন্যান্য সব জিনিস তিনি আগেই বেচে দিয়েছেন। তাঁর শর্ত একটাই—এ দুটি জিনিস তিনি দু'জায়গায় বেচবেন না। যে তাঁর সমস্ত বইগুলি কিনবে, তাকেই তিনি পিয়ানোটাও দিয়ে যাবেন। ব্যস, একটা চিঠি ঝেড়ে দিলাম।" কাকা তাঁর গেলাসের তলানীটুকুতে মন দিলেন। তারপর হেসে বললেন—"পিয়ানোটা একেবারে ব্রান্ড নিউ ছিল। কিন্তু বইগুলোর যা দশা হয়েছিল ..." একটু থেমে

গাছের ঝরা পাতা দেখিয়ে—"ঠিক এই পাতার দশা। কলকাতা থেকে আনতে আনতে শীতের শেষে নেড়া গাছের মতো। অধিকাংশ বইয়েরই স ... ব পাতা ঝুর ঝুর করে পড়ে গেল।" কাকা হা-হা করে হেসে উঠলেন।

কায়া হাঁ করে বৈঠকি মেজাজের কাকাকে দেখছিল। জলের জাগ, বোতল আর গেলাস—এই তিনটি জিনিসের মাঝে তিনি অত্যুৎসাহে হাত নেড়ে নেড়ে কথা বলছেন। হাত কখনও উপরে উঠছে, কখনও নীচে নামছে। কায়ার মনে হচ্ছে এ যেন কাকার হাত নয়—একটা ঘাস-ফড়িং, তিড়িং-তিড়িং করে লাফালাফি করছে। কাকার গল্প আর প্রাণখোলা হাসিতে গ্যালারীটাও মুখর হয়ে উঠেছে।

কায়ার মনে এক অদম্য ইচ্ছার উদয় হলো। তার ইচ্ছে হলো কাকার উষ্ণ সান্নিধ্যে আসার। প্রকৃতিও অনুকূল। বাইরে আবার কুয়াশা পড়তে শুরু করেছে। সমস্ত দিনের ক্লান্তি তার শরীরে ছেয়ে আছে। কাকাও একলা। তিনিও বোধকরি সান্নিধ্য পিয়াসী। তাঁর গল্প করার ধরনই তার সাক্ষী। কায়া জানে না যে কি করে সে কাকার সঙ্গে তার দূরত্ব ঘোচাবে; কি কথায় সে কাকার বিশ্বাসভাজন হতে পারবে। তবুও সে কথা শুরু করে—

—"কাকা, তুমি কোয়ার্টারে গিয়েছিলে, তাই না?"

কাকা কায়ার দিকে চেয়ে রইলেন। নড়েও বসলেন না, গলার স্বরও তুললেন না। অত্যন্ত সহজভাবে বললেন—"ও, তুই আমায় দেখেছিস বুঝি?"

—"হ্যাঁ, যখন তুমি সিঁড়ি দিয়ে নামছিলে, তখন।"

কাকা অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। কায়ার দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেন ভাবলেন। এবার আর গেলাস ঠোঁটের কাছে তুললেন না।

—"তুই ওকে দেখেছিস? আলাপ হয়েছে?"

—"হ্যাঁ।" —কায়ার বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল। মিথ্যে কথা বলে অবধি মরমে মরে যাচ্ছিল সে। এখন সবকিছু খোলাখুলি বলা-কওয়াতে সে অনেক হাল্কা বোধ করে।

—"তুই কত বড় হয়ে গেছিসরে, কায়া!" —কাকা উঠে দাঁড়ালেন। গ্যালারীর রেলিঙে ভর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন। বাইরে বলতে অবশ্য এখন আর কিচ্ছু নেই। পাহাড়, আলো, গাছ—সব একটা সাদা চাদরের আস্তরণে চাপা পড়ে গিয়েছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। বিরু উপরে এসে বিস্ময়ের সঙ্গে একবার কায়ার দিকে, আর একবার তার বাপের দিকে তাকালে। কিন্তু কোন কথা না বলে সে নিজের ঘরের ভিতর ঢুকে দোর দিলে।

খেয়েদেয়ে কায়া তার ঘরে এলো। ভেবেছিল শুলেই ঘুমে নেতিয়ে পড়বে। ... পুরো

বাড়িটা এখন নিঃঝুম। বিরু আগেই তার ঘরে গিয়ে ঢুকেছে, কাকা উপরে চলে গিয়েছেন, পাহাড়ি তার কোয়ার্টারে ফিরে গেছে।

বিরু বোধহয় এখনও ঘুমোয়নি। তার ঘর থেকে পীতাভ আলোর রেখা বাইরে লাইব্রেরির দরজা পর্যন্ত ছিটকে এসেছে। সে পিয়ানোতে সন্ধ্যায় দেওয়া লেসন প্র্যাকটিস করছে। পিয়ানোর মিঠে সুর কায়ার ঘর থেকেও শোনা যাচ্ছে। এই মিঠে সুরে কায়ার শরীরে রক্তের স্রোত চঞ্চল হয়ে ওঠে। ... 'আমার এক এক সময় কি হয়? কি এক অদ্ভুত অস্বস্তি, উদ্দাম অস্থিরতা আমায় পেয়ে বসে! পরক্ষণেই তা মিলিয়ে গিয়ে পেঁয়াজের খোসার মতো সুখের একটা হাল্কা আস্তরণে আমার সমস্ত শরীর ছেয়ে যায়। খোসা সরতে সময় লাগে না—ভিতরের সমস্ত আবেগ বাধা-বন্ধন ঠেলে উপরে উঠে আসতে চায়। গলার কাছে একটা কান্নার দলা আটকে থাকে—সেটা বেরও হয় না আবার মিলিয়েও যেতে চায় না। এ এক বিচিত্র ত্রিশঙ্কুর মতো অবস্থা!'

'আমি বড় হয়ে গেছি, অ-নে-ক বড়!' কায়া চোখ বন্ধ করল। চোখের সামনে বিরুর অবয়ব ভেসে উঠল। সে তার শুকিয়ে আসা ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করে বলতে লাগল—'বিরু...বিরু...বিরু...'। এক সুখানুভূতির শিহরণ তার মেরুদণ্ড বেয়ে নামতে লাগল। মনে হলো, ঠিক যেন তার ডাক শুনতে পেয়েছে। অবশ্য বিরু যদি এই মুহূর্তে তার ডাক শুনে কায়ার ঘরে চলে আসে, তাহলে তার অস্বস্তির আর অন্ত থাকবে না। মুখ দিয়ে টুঁ শব্দটিও বেরুবে না। লেপের তলায় সে মুখ লুকোবে। বিরুর ঘরের পিয়ানোর সুরটা যেন পাহাড়ি এলাকার বিরাট বড় একটা সাইনবোর্ড—যা কোন দিশা-নির্দেশ দেয় না, শুধু কাছে টানে। কায়ার মতো অতি সাধারণ মেয়েও তার তলায় আশ্রয় নিয়ে বসে থাকতেই ভালোবাসে। কায়া অবাক হয়ে ভাবে তার তো আগে কখনও, এ ধরনের আবেগ-প্রবণতা নিজের বাড়িতে থাকাকালীন দেখা দেয়নি! এ কী ভীষণ এক উন্মত্ততা! এই সোনালী সম্মোহক জালের বন্ধনে সে ধীরে ধীরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। এই শহরে এসে সে এই জালের নানান্ পরিচয় পেয়েছে—পাহাড়ে, গির্জায়, পাহাড়ি গাছপালায়, ফুলে-পাতায়, নথধারিণী নারীর গোপন ইঙ্গিতে! কিন্তু সর্বাধিক সম্মোহক জালের যে বন্ধন কায়াকে কুরে কুরে খাচ্ছে, যা ঘুমের সময়েও এক বেদনাবিধুর স্তব্ধতায়, রাত্রের অসীম নীল শূন্যতায় তার শয্যার পাশে বারবার এসে দাঁড়াচ্ছে তা হলো —কাঠের আঙটায় ঝোলানো পেরেকে ক্ষত-বিক্ষত সেই মানবদেহ!

একে কোথায় দেখেছি?

চার

দিন শেষ হয়ে আসছে। সূর্য নজরে পড়ছে না। শুধু একটা হলদে আলোর আভাস সমগ্র শহরটাকে ঢেকে রেখেছে—আলো আঁধারির মধ্যে হাল্কা হাওয়ায় শহরটা যেন ভাসছে। চারদিকে একটা হিমেল ভাব। হিমে ঘাস-পাতা অবশ হয়ে নুয়ে পড়েছে। ঠাণ্ডা ময়দানে ফ্যাকাশে ও জলীয় ভাব। ধূসর সাদা রঙের জোঁক পাথরের সঙ্গে লেগে রয়েছে—সাদা, থকথকে—কেমন একটা গা ঘিন্ ঘিন্ করা ভাব। দূর থেকে দেখলে পরে মনে হয় ঠিক যেন পাথরের উপর কোন কুষ্ঠ রুগীর ক্ষতের পুঁজ লেগে রয়েছে।

এই সময়টা দিয়ে চিমনির ধোঁয়ার আর বিরাম নেই। সাপের মতো এঁকেবেঁকে হেলেদুলে উপরে উঠছে, পর্যটক পাখির দল ধোঁয়ায় ভয় পেয়ে ঝোপঝাড়ে লুকোবার জায়গা পায় না। কায়া তাদের অবিশ্রান্ত সন্ত্রস্ত ডাক শুনতে পায়।

বিরু তাকে পাখিদের বিষয়ে নানা কথা বলে। একটা পাখি দেখিয়ে সে ফিসফিস করে বলল—"এই পাখিটা না, কাশ্মীর থেকে এসেছে।"

—"উরিব্বাস! এতদূর থেকে?"

—"এরা রাস্তায় বিশ্রাম নিতে নিতে আসে।" বিরু জবাব দেয়।

পাখিটা দেখেতে ভারি সুন্দর। তার ল্যাজটা ঠিক এরোপ্লেনের মতো লম্বা ও দৃঢ়। পাখনায় নানা রঙের মেলা। হীরের মতো জ্বলজ্বলে চোখে ভীত-ত্রস্ত চাউনি। একটা দেবদারু গাছের উপর পাখিটা বসে ছিল।

—"পাখিটা প্রতি বছর এখানে আসে।" বিরু আবার বলে।

—"তুমি পাখিটাকে চিনে রেখেছ বুঝি?"

—"বাঃ, কেন চিনবো না? পাখিটা সবসময় এখানেই বসে থাকে যে!"

নির্জন দুপুরে বসে তারা পক্ষীচর্চা করছিল। বাড়ির নীচেই একটা টেনিস-কোর্ট আছে। অবিশ্যি টেনিস খেলতে এখন আর কেউ আসে না। এর চারদিকে দেবদারু, ওক ও পপলার গাছ দাঁড়িয়ে। দেবদারু ও ওকের মাথায় এখনও কিছু পাতা অবশিষ্ট রয়েছে। পপলার গাছটা একেবারেই নেড়া মাথা। তার নীচে পাতার ডাঁই পড়ে আছে। সেটা দিনকে দিন বেড়ে ঘন হয়ে উঠছে।

কাশ্মীরি পাখিটা সারাদিন এক সুরে, একলাই চেঁচিয়ে যায়। তারপর সন্ধ্যা হতে

না হতেই নীচের ঝোপে গিয়ে মুখ লুকোয়।

বিরু কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলে। কায়ার কেন জানিনা মনে হয় এ-সবে বিরুর বিশেষ আগ্রহ নেই। সে শুধু তার মনরক্ষার জন্যই প্রত্যেকদিন দুপুরে তাকে সঙ্গদান করে। কায়ার সাথে সাথে ঘুরলেও বিরু কেমন যেন একা একা থাকে বলে মনে হয়। কোনদিনও সে নিজে থেকে কোন কথা বলে না। কাকা, কিংবা সেই মহিলাটি বা নিজের বিষয়ে কিছু বলে না বা বলেনি—অন্তত কায়ার তো মনে পড়ে না। কিন্তু সে লক্ষ করেছে যে বাইরে বেরুলেই বাড়ির ভিতরের বিরু কেমন বদলে বাইরের বিরু হয়ে যায়—উন্মুক্ত আকাশের মতোই খোলা-মেলা। কথা বলতে বলতে শান্ত বিরু এক এক সময় উত্তেজিত হয়ে ওঠে। কায়াকে এটা-সেটা, নানান্ কথা বলে ও বোঝায়। ও যেন গাইডের রোলে অভিনয় করে—সমস্ত বাড়ির খুঁটিনাটির চাবিকাঠি যেন তার কাছেই মজুত রয়েছে। তার শান্ত চোখ, বাইরের খোলা আকাশের নীচে এসে চঞ্চল হয়ে ওঠে। এ যেন প্রচণ্ড জ্বরের দাবদাহের পরে পথ্য পেয়ে নির্জীব শরীরের সজীব হয়ে ওঠার মতো। কায়া তো এক এক সময় ভেবেই বসে যে বাড়ির বিরু ও বাইরের বিরু—দুটি ভিন্ন ছেলে। বাড়ির বিরু অন্তর্মুখী ও সে বিরু নিজের ঘরে থাকতেই ভালোবাসে। দিনরাত পিয়ানোয় সুর প্র্যাকটিস করে। কাকা এবং বাড়ির অন্যান্য বাসিন্দাদের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। আর বাইরের বিরু? সে এক বহির্মুখী, চঞ্চল কিন্তু সংযত, মুক্ত মানুষ। সে অসীম ধৈর্য সহকারে কায়াকে এটা-ওটা দেখায়। দ্রষ্টব্য বস্তু বলতে জোঁক, পাথরের তলার কেঁচো, পর্যটক, প্রবাসী পাখি ইত্যাদি। এসব দ্রষ্টব্য বস্তু তার বাড়ির শহরেও রয়েছে। কিন্তু সে সম্বন্ধে কায়া এতদিন সচেতন ছিল না। এক এক সময় বিরুকে লামার মতো হাসতেও দেখা যায়। তবে সে হাসি কায়ার অনভিজ্ঞতায় লামার মতো উপহাসের নির্মম হাসি নয়, আবার সবজান্তার অহঙ্কারের হাসিও নয়। সে শুধু নিছক হাসির জন্যই হাসি—নির্মল, সাবলীল ও উন্মুক্ত। কিন্তু সে হাসির সঙ্গে কোথায় যেন একটি নিরাশার হাল্কা সুর মিশে রয়েছে। এই নৈরাশ্যটুকুই যেন দুটি বিরুর সংযোগ-সেতু। এখানে এসে দুই সত্তা আবার এক হয়ে যায়। কায়া এই দুই বিরুর মাঝে দোদুল্যমান হয়ে ঘোরে। এক বিরুর কাছে এলে অপর বিরুকে তার অপরিচিত বলে মনে হয়। আবার এই অপরিচিত বিরুর সঙ্গে পরিচয়ের বেড়া ডিঙিয়ে সে যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠে, তখন আগের বিরু যেন অনেক দূরে সব বেড়া ভেঙে পালিয়ে যায়। টেনিস কোর্টের চারদিকে জাল দিয়ে ঘেরা রয়েছে। তারা রোজই বাড়ি ফিরে যাবার আগে সেটা একবার করে ছুঁয়ে দেখে। সেদিন বিরু কিন্তু টেনিস কোর্টের জালটা ছোঁয়ার পরেও বাড়ি ফেরার নাম করলে না। সে এগিয়ে যেতে লাগল। সামনেই একটা নীচু ছাদের প্যাভেলিয়ন আছে। সবুজ রঙের প্যাভেলিয়ন। ভিতরে ভাঙা-চোরা বেঞ্চ, তার উপরে শুকনো ঘাস ও পুরোনো পচা

পাতার রাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

—"ওরা সকলে এখানেই বসে থাকত।" বিরু বলে।

—"কারা? এই বাজে নির্জন ভাঙাচোরা জায়গায় কে বসত?"

—"ইংরেজদের বাচ্চারা আর তাদের রক্ষণাবেক্ষণকারী গভর্নেসরা। বড়রা টেনিস খেলত আর বাচ্চারা সেই খেলা প্যাভেলিয়নে বসে বসে দেখত।

কায়া বাইরেটা দেখতে দেখতে প্যাভেলিয়নের ভিতরে এসে ঢোকে। বাতাসে একটা কদর্য, উগ্র গন্ধ। পাখির বাসায় প্যাভেলিয়নটা ছেয়ে গেছে। মাটিতে ভেড়া-ছাগলের নাদি। ... এখানে অতীতের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

অনেক পুরানো আমলের ইংরেজদের ঘরদোর। নিঃসঙ্গ, নির্জন, খালি টেনিস কোর্ট। তার কিনারায় চুনের দাগ এখনও নজরে পড়ে। কোর্টের উপরে চারধারে লাগানো শূন্য তার বাতাসে কেঁপে কেঁপে উঠছে। কারা থাকতো এখানে? কোথায় চলে গেল তারা?

প্যাভেলিয়ন থেকে বাইরে বেরোলেই উপরে কাকার বাসা দেখা যায়। নীচে উৎরাইয়ের রাস্তা। পাকদণ্ডীর দু'দিকে ওক ও দেবদারু গাছ—যার পিছন থেকে কোয়ার্টারের হলদে ছাদ উঁকি মারছে।

দেবদারু গাছের উপরে কাশ্মিরী পাখিটা অবিরাম চেঁচিয়ে চলেছে।

—"তুমি কি এখানে খানিকক্ষণ বসতে চাও?" বিরু জিজ্ঞেস করে।

—"না না, এখানে আর নয়" কায়া তাড়াতাড়ি বলে ওঠে। প্যাভেলিয়নের বোঁটকা গন্ধে তার বমি পাচ্ছে। সে এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে চায়। টেনিস কোর্টের ঠিক বাইরে উৎরাই—সেখানে গাছের ঘন অরণ্য ও ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে চাতালের মতো বিরাটাকার পাথর পড়ে রয়েছে। এখানে পাখির কলতান নেই, শুধু ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা কনসার্ট শোনা যাচ্ছে।

—"দেখ, সেদিন আমরা, ওই যে, ওদিকে গেছিলাম!"

বিরু দাঁড়িয়ে পড়লে। কায়া বিরুর অঙ্গুলি সঙ্কেত অনুসরণ করে পাহাড়ের দিকে তাকালে। পাহাড়ের মাঝে দূ...রে গির্জার ছাদ দেখা যাচ্ছে।

—"দেখেছ, গির্জাটা কত্তো উপরে?" বিরু বললে।

কায়ার যেন বিশ্বাস হচ্ছে না যে এত উঁচুতে তারা উঠেছিল। দূর থেকে মনে হচ্ছে গির্জার বাইরে টাঙানো ক্রস্‌-টা মেঘের আওটায় ঝুলছে। যেন কোন বিরাটকায় পাখি উড়তে উড়তে হঠাৎ দিগভ্রষ্ট হয়ে মেঘের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। হলদে অবসন্ন অপরাহ্ণের আলোয় ক্রস্‌টা ঝকঝক করছে।

কায়া একটা পাথরের উপর বসে পড়লে।

দুজনেই নিঃশব্দে বসে। মাঝখানে একটা পাথরের ব্যবধান। বিরু উদাসীন চোখে উল্টোদিকে চেয়ে আছে—যেখানে আলোর সীমা ছাড়িয়ে, ছায়াছন্ন জঙ্গলে

ঝিঁঝিঁ পোকার একটানা অবিশ্রান্ত ডাক শোনা যাচ্ছে। ঝিঁঝিঁদের এই কলতানে কায়া তার হারানো সুর খুঁজে পেয়ে আবার তা হারিয়ে ফেলে। একটু পরেই আবার দূর, অতি দূর থেকে সে তার সুরের ছন্দের সূত্র ফিরে পায়। কায়া ঠায় পাথরের উপর বসে থাকে।

—"তুমি কেমন করে কথাটা জানলে, বিরু?" কায়া জিজ্ঞেস করলে।

—"কোন কথাটা?"

—"ওই যে, ওখানে বাচ্চারা বসে বসে খেলা দেখত আর বড়রা খেলত?"

—"ছবিতে দেখেছি।" বিরু মৃদু হাসলে—"এই বাড়িটার উপরে লেখা একটা বই আছে আমাদের লাইব্রেরিতে। বইটার নাম 'Faulksland, And the passing time' তাতেই প্যাভেলিয়নটার ছবি আছে। বাচ্চারা তাদের গভর্নেসদের সঙ্গে বসে আছে। বড়রা সব খেলছে ..."

বিরু পাথরের পিছন দিকটায় চলে এলো। পাথরের কাছে গাছের ডাল ঝুলছে। গাছের ডালের মধ্যে থেকে বিরুর মাথার আধখানা দেখা যাচ্ছে।

—"কিছু বললে, কায়া?"

—"হ্যাঁ। বলছিলাম কি এবার উঠলে হয় না!"

—"কিন্তু এখনও বাইরে যথেষ্ট আলো রয়েছে যে!" বিরু বলে।

কোর্টের তার নড়ছে। গাছের ডালও তারের সঙ্গে সঙ্গে নড়ছে। শূন্য তার ও গাছের ডালের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে একটি টেনিস কোর্ট আর প্যাভেলিয়ন। প্যাভেলিয়নের মধ্যে রয়েছে কয়েকটি বেঞ্চ, কিছু খড়কুটো আর পাখির বাসা।

শীতল দুপুরের আলোয় বসে বসে কায়া প্রকৃতির আনন্দ উপভোগ করে। আজকাল থেকে থেকে কায়ার মনে এক বিচিত্র অনুভূতির, গায়ে এক অভূতপূর্ব পুলকের উদয় হয়। ... আগে তো কখনও এমন হয়নি? এ কেমন অনুভূতি? সে স্থানুবৎ বসে রইল। নিজের বুকের ধুকধুকানিও যেন সে শুনতে পায়। বিরুর নিঃশ্বাসের উষ্ণ সঙ্গ পেয়ে সে-ও তার বঞ্চিত উপেক্ষিত নিঃসঙ্গ মনের অর্গল হাট করে খুলে দিয়েছে। এ কি নেশা? এ কিসের অনুভূতি? এই কি প্রেম?

—"তোমার এখানে থাকতে কি ভালো লাগছে না?" বিরু খুব ধীরে বলে।

—"না বিরু। এখন আর তত খারাপ লাগে না।"

—"তাহলে এখন আর তুমি পালিয়ে যাবার কথা ভাবছ না তো?"

—"কে বললে আমি পালিয়ে যাব? আমি তো রাস্তাই চিনি না!"

—"রাস্তা জানা থাকলে পালাতে?"

—"না বিরু। ও তো আমি এমনিই মিছিমিছি বলেছিলাম। আমি কেন খামোখা পালাতে যাব?" কায়া মাথা তুলে দেখলে বিরুর দৃষ্টি টেনিস তারে নিবদ্ধ। অনেক উঁচু পাহাড়ের উপর থেকে একটা কালো ছায়া নীচে নেমে আসছে—পাখিরা সব

দল বেঁধে নীচে নামছে ... সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো প্রায়।

—"কায়া, কখনও কোয়ার্টারে গিয়েছ কি?"

—"কোন কোয়ার্টারের কথা বলছ?"

—"যেখানে পাহাড়ি থাকে?"

—"না তো, সেখানে তো কখনো যাইনি!" কায়া মিথ্যে কথা বলে।

—"বাবা এ বিষয়ে তোমায় কখনও কিচ্ছু বলেন নি?"

—"কোন বিষয়ে?"

বিরুর মুখে মেঘ ঘনিয়ে এলো। আবার আগের মতো একটা নিরাশ, মুষড়ে পড়া ভাব তার মুখে ফুটে উঠল। কায়া বুঝতে পারছে যে এবার বন্ধ ঘরের বিরু খোলামেলা মনের বিরুকে ছেয়ে ফেলছে। বাইরের বিরু আবার ধীরে ধীরে দূরে সরে যাচ্ছে। ...

—"নাঃ কিছুনা, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম।" ... বিরু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। সে আবার খোলা তারের দিকে চাইলে। সেখানে সন্ধ্যার ছায়ান্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।

—"এবারে বাড়ি যাবে নাকি? আমার মাস্টারেরও আসার সময় হলো।

কায়া কিন্তু উঠলে না। তার মনটা আবার বিষাদে ভরে গেল। বিরু এবং তার মধ্যে এখন একটি মিথ্যের দেওয়াল মাথা চাড়া দিয়ে উঠে তাদের যেন আলাদা করে দিলে।

তৃষ্ণার্ত কায়ার সামনে যেন আশায়-বিশ্বাসে ভরা একটি পূর্ণকলস ধরে রাখা রয়েছে। সেটিকে সে বারবার ধরবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সাফল্যের চৌকাঠ পর্যন্ত এসে সে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। কে যেন তার হাত ধরে তাকে টেনে নিচ্ছে। তার অন্তরের অন্তস্তলে ধিক্কার উঠছে। কেউ তাকে তীব্র ভর্ৎসনা করে যেন বলছে —'ছি ছি কায়া, এ তুই কি করলি? আনন্দের রসে ভরা টইটম্বুর পেয়ালা তুই নিজের হাতে এভাবে আছড়ে ভাঙলি? —স্বার্থপর, তুই অত্যন্ত স্বার্থপর মেয়ে'। কায়া প্রাণপণে নিজেকে এই দ্বন্দ্ব থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করে। তার ইচ্ছে করে যে বিরুকে একবার স্পর্শ করে বলে ওঠে—'না-না, মিথ্যে, সব মিথ্যে, আমি তোমার কাছে আবারও মিথ্যে কথা বলেছি'। কিন্তু তার হাত ওঠে না। মনে হয় বিরুর যেন হাত-পা কিছুই নেই—সে নিরাবয়ব। তার মনের ইচ্ছা মনেই গুমরে গুমরে, কেঁদে কেঁদে ফেরে! শুকনো মরুভূমির উপর প্রখর তপনতাপের মতো তার ইচ্ছার দাবদাহ শুধু দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে।

এই ইচ্ছার আগুন কি সে গিনীর চোখেও দেখেছিল তার শেষ সময়ে? না-না, গিনীর চোখে আগুন ছিল না ... ছিল এমন একটি ইচ্ছা ... আচ্ছা এই ইচ্ছাকেই কি আত্মা বলে? গিনীর রক্তরঞ্জিত দেহের উপরে চামড়ার কলারে লেগে থাকা রক্তে মাখো মাখো ... সেই কি আত্মা?

—"একটা কথা বলব?"

—"কি কথা, কায়া?"

—"আচ্ছা, ওই বইটার—কি যেন নাম বললে?"

—"কোন বইটা বলতো?"

—"যাতে ছবি রয়েছে যে বড়রা খেলছে আর বাচ্চারা দেখছে?"

বিরু কিছুক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর আস্তে বললে—

—"ফক্সল্যান্ড এন্ড দ্য পাসিং টাইম।"

—"পাসিং টাইম' কথাটা কেন লিখেছে?"

বিরু কোনও উত্তর দিলে না। সে হাঁটতে শুরু করেছে। দ্রুত হেঁটে সে টেনিস-কোর্টের দিকেই যাচ্ছে। কায়ার কথাটা বোধকরি তার কানে যায়নি।

দেবদারু গাছটার উপরে বসে কাশ্মীরের প্রবাসী পাখিটা করুণ স্বরে চেঁচিয়েই যাচ্ছে।

ঠিক এরকমই আর একটি মর্মন্তুদ আর্তনাদ তার মনে পড়ে যায়। সে শুধুমাত্র সে একাই শুনতে পায়।

রাতে খাওয়াদাওয়ার পর কাকা অনেকক্ষণ লাইব্রেরিতে সময় কাটান। বিরুর ঘর থেকে পিয়ানোর টুং-টাং ভেসে আসে। তারপর তারও ঘর নিঃঝুম হয়ে যায়।

এরপর কায়া একা—সম্পূর্ণ একা। সে ঘুমের চতুর্দোলায় চড়ে বেড়ায়—আধো ঘুমে, আধো জাগরণে। তারপর আবার সেই চিৎকার! কায়া ধড়মড়িয়ে উঠে বসে।

কাকা তিনতলায় নিজের ঘরে যাবার আগে তার ঘরে উঁকি দিয়ে যান। লাইব্রেরির আলোও অবশেষে নিভে যায়। কায়া ঘরের ভিতর থেকে ঘুমের ভান করে বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাঁর সব কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করে। .... কাকা ওভারকোট গায়ে চাপান। এরপর তাঁর ছড়িটি সঙ্গে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধীর পদক্ষেপে নেমে যান। তাঁর পায়ের মৃদু শব্দ অনেকক্ষণ ধরে শোনা যায়। .... এরপর বেশ কিছুক্ষণ সব চুপচাপ। লাইব্রেরি ঘরে এখন অন্ধকার। বিরুর ঘরও তদ্রূপ। গ্যালারীর খাঁ খাঁ করা শূন্য চেয়ার-টেবিলে বাতাস খেলা করে বেড়ায়। এই সময় সে চুপিচুপি উঠে পড়ে। তারপর সেও টুক করে বেরিয়ে পড়ে। কাকার পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেও উৎরাই বেয়ে নামতে থাকে। একরাশ জমে থাকা শুকনো পাতা, দণ্ডায়মান প্রহরীর মতো দেবদারুর শীৎকার, মাথার উপর উন্মুক্ত আকাশের নীচে কায়া যেন ঘুমের ঘোরে হাঁটতে থাকে। একটি সুমিষ্ট খিল খিল হাসিতে তার ঘোর কেটে যায়।

—"তুই এসে পড়েছিস?"

'তুই' শুনে কায়ার শরীরের সমস্ত স্নায়ুতন্ত্রী যেন বাজনার মতো রিমঝিম করে

বেজে ওঠে। ধীরে সে সিঁড়ি বেয়ে উঠে তাঁর ঘরের শিকল নাড়া দেয়। রহস্যময়ী নারীটি যেন তারই প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে—শিকল নাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে দরজা খুলে দেয়। কিন্তু তার মুখে অপার বিস্ময়! অবাক হয়ে তার কমলালেবুর কোয়ার মতো রসালো ঠোঁট দুটি একটু ফাঁক করে সে বলে—"তুই এসেছিস?" তার সাদা দাঁতগুলি ঝকঝক করে ওঠে। তার বিস্ময় দেখে মনে হয় সে যেন কায়াকে এই প্রথম, নূতন দেখছে। কায়াকে দেখে তার আনন্দ হয়, আশ্বস্ত বোধ করে। কিন্তু এর সঙ্গে একটি ভীতিও তাকে চেপে ধরে। তাই অত্যুৎসাহে কায়ার হাত চেপে ধরলেও, পরক্ষণেই তা ছেড়ে দিয়ে নিজের হাত-পা কোথায় লুকাবে ভেবে পায় না। তার বিব্রত ভাব কায়ার ভালো লাগে। তার পায়ে ঝকঝকে রুপোর মল, 'মেহেন্দী'-রঞ্জিত কুসুমরাঙা হাত দেখে কায়ার মা কালীর প্রতিমার কথা মনে পড়ে যায়। যদিচ তার চেহারার সঙ্গে মা কালীর মূর্তির কোনই মিল নেই। তার মুখ গোলাকার ও বিস্তৃত—কিন্তু অদ্ভুত পীতাভ। সারাদিন ঘরে বসে থাকলে কি মুখে এমন হলদেটে ভাব আসে? কায়া জানে না। আঁচলের একপ্রান্ত ক্লিপ দিয়ে চুলের সঙ্গে আটকানো। মাথা তুললে আঁচলও উপরে ওঠে। মাথা নীচু করলে আঁচল আবার নেমে আসে। সে আবার বলে—"তুই তাহলে সত্যি এসে পড়েছিস?" দুই চোখ ভরে সে কায়াকে নিরীক্ষণ করতে থাকে।

কায়া এই নারীর প্রতি এক বিচিত্র আকর্ষণ অনুভব করে। সন্ধ্যারাতে যখন বিরু তার মাস্টারমশাইকে পৌঁছতে যায়, কাকা মল রোডে বেড়াতে যান, কায়া তখন সম্পূর্ণ একলা। শীতের দীর্ঘ অন্ধকারে তার একা একা ভালো লাগে না। সর্বত্র বাতি নিভে গেলেও কোয়ার্টারে আলো জ্বলে। তখন আর সে থাকতে পারে না। আলোর টানে কাচপোকার মতোই সে ওই কোয়ার্টার আর কোয়ার্টারে অবস্থিত সেই নারীটির টানে সেখানে চলে যায়।

সেদিন সন্ধ্যায় সেই নারীর চোখ আনন্দে চকচক করছিল। কায়াকে দেখে সে তাকে ভিতরে টেনে নিয়ে গেল। কায়ার হাত টেনে নিয়ে সে নিজের ঠোঁটের উপর রাখলে। উত্তেজনার চোটে তার ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছিল। কায়ার হাতে তার গরম নিঃশ্বাসের ছোঁয়া লাগছে।

—"কারুক্কে বলবি না তো?" বাচ্চাদের মতো চোখ মটকে সে বললে। তার স্বরে আনন্দের উত্তেজনা।

কায়া মাথা নেড়ে না বললে। কিন্তু কি কথা? তার যে দম বন্ধ হয়ে আসছে!

—"বিরুকেও না ..."

—"না না!"

—"জানিস, সাহেব কাল রাতে আমায় কি বলেছেন? আমায় বললেন যে আমি চাইলে তোকে নিয়ে বাইরে বেড়াতে যেতে পারি। যাবি তো আমার সঙ্গে বেড়াতে?"

—"একলা একলা?" কায়া সন্দিহান!

—"একলা আর কোথায় রে? তুই আমার সঙ্গে যাবি, আমি তোর সঙ্গে যাব —ব্যস!" সে হাসতে লাগলে।

—"কোথায় বেড়াতে যাওয়া হবে?"

—"কেন, ওই ঝর্ণাটার ধারে? আমি একবার গিয়েছি ওখানে। পথ চেনা আছে আমার।"

—"ঝর্ণা দেখবার পর আপনি আর কোথাও বেরোননি?" কায়ার স্বরে বিস্ময়।

—"নাঃ, এই শহরে আর কোথাও নয় ..." মহিলাটি চোখ বন্ধ করে বললে। তার গলার স্বর বুজে এলো। সমস্ত মুখে হলদেটে ভাবটা ছড়িয়ে পড়ল। সে আবার বলতে লাগলে—"নিজের গ্রামে থাকতে তো দিনরাত টো টো করে ঘুরেছি। এখানে আসার পর সাহেব কড়া হুকুম দিলেন যে বাইরে কোথাও যেতে পারবে না। বাইরের সব কাজকম্ম ছেলেই করে। আমি শুধু রান্নাবাড়া নিয়ে থাকি ...। অবশ্য আমার এই-ই ভালো। ইতিপূর্বে আমি কক্ষনো এত আরামে থাকিনি।" —এই মহিলাটি কি তার মনের বিষাদ লুকোতে নিজেই নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছে? সে নীচুস্বরে কথা বলে চলে —ছোট ছোট কথা ...! যেন ভাষা একটি পাহাড়ি নালা— বিরাট বড়! আর সে সেই বিশাল নালাটি এড়াতে ছোট ছোট কথার নুড়িপাথরের উপর সাবধানে পা ফেলে চলছে।

—"আপনার বাড়ি কি এ অঞ্চলে নয়?"

—"এখানে কোথায়? সে তো অ-নে-ক দূরে!" তার নথ কেঁপে উঠল।

—"নারকণ্ডার নাম শুনেছিস? সবচেয়ে উপরে ... সেখানে লরিতে চেপে যেতে হয়। সাহেবের সঙ্গে যখন এসেছিলাম, তখন তো মাথা ঘুরুনীর চোটে তিনদিন মাথাই তুলতে পারিনি।" কায়া মাথা তুলে তার দিকে তাকিয়ে বললে—"কাকাই আপনাকে এখানে এনেছিলেন?" নিজের গলার স্বর তার কানে বেসুরো ঠেকলে।

—"আর কে আনবে? আমি কি একা আসতে পারি এতদূর? আমার সঙ্গে এই ছোঁড়াটাও ছি । সারা রাস্তা এটা কাঁদতে কাঁদতে এসেছে আর আমি বমি করতে করতে। জীবনে প্রথম লরিতে চাপলাম কিনা, তাই।"

—"এতদূর থেকে, নিজের বাড়ি ঘর ছেড়ে আপনি এখানে কেন এলেন?"

মহিলাটির মুখে অন্ধকার নেমে এলো—ঠিক পাহাড়ের অন্ধকারের মতো— নিশ্চুপ, শান্ত।

—"কোথাও আর যাবার জায়গা ছিল না রে—তোর কাকাই নিয়ে এলেন।"

এই প্রথম সে সাহেব না বলে 'তোর কাকা' বললেন! কায়ার কানে কথাটা খট্ করে বেজে উঠল। তার পা দুটি লাল লহঙ্গার বাইরে বেরিয়ে আছে, দুহাতে মেহেন্দীর লালিমা, কমলালেবুর কোয়ার মতো আধখোলা ঠোঁট—কায়া চেয়ে চেয়ে দেখতে

লাগলে। হঠাৎ কায়া উপলব্ধি করলে যে যা হয়েছে বা হচ্ছে—সেটাই তো স্বাভাবিক। এই নারীর কাকার সঙ্গে এখানে আসা, এই ঘরের চার দেওয়ালের পরিধিতে থাকা, রাতের বেলায় চুপি চুপি কাকার সিঁড়ি দিয়ে নামা—এর যেন আর অন্য কোন বিকল্প নেই বা থাকতে পারে না। কায়ার এখানে আসার অনেক আগেই এটা ঘটেছে। তার ফিরে যাবার পরেও থাকবে—এ এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয়।

—"এ্যই, এখানে আয়।" —মহিলাটি দরজার পর্দা সরালে—"দেখতে পাচ্ছিস?" কায়া তার কাছ ঘেঁসে দাঁড়ালে। দুটি পাহাড় গায়ে গায়ে দাঁড়িয়ে সন্ধ্যার পড়ন্ত রোদ্দুরে ঝিমোচ্ছে। পাহাড়ের নীচে সন্ধ্যার ছায়া ঘনিয়ে এসেছে।

—"এই যে পাহাড়টা দেখছিস—এরও পিছনে নারকণ্ডা। মানে এই পাহাড়ের পিছনে যে পাহাড়, তারও পিছনে গেলে তবেই নারকণ্ডায় পৌঁছনো যায়।"

—"আপনি এত দূর থেকে এখানে এসেছেন?" কায়ার স্বরে বিস্ময়!

—"মেঘের আড়ালে স-ব ঢাকা পড়ে গেছে—দেখা যাচ্ছে না।" মহিলাটি বোজা স্বরে স্বগতোক্তি করলে। গলার স্বরটাও যেন পাহাড়ের সঙ্গে সঙ্গে ঝিমোচ্ছে!

—"বাড়ির কথা মনে পড়ে না?"

—"নাঃ, বাড়িতে আর কে আছে? কার কথাই বা মনে পড়বে?" ... তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে স্বপ্নালু স্বরে বললে—"কিন্তু কখনও কখনও বাতাস বইলে, আপেল গাছটার কথা মনে পড়ে যায়। ঝড় উঠলে কেমন টপাটপ আপেলগুলো নীচে ঝরে পড়ত ...।"

তার উড়নিটা বুক থেকে খসে পড়ে নীচে নেমে এসেছে, মাথার ক্লিপটা আলগা হয়ে ঝুলছে। সেলাইয়ের মেশিনে যেমন সেলাই হয়ে যাবার পরেও আশে-পাশে সুতোর টুকরোগুলো ছড়িয়ে থাকে, নারীটির চোখেও সেইরকমই লাল সুতোর মতো সূক্ষ্ম লাল শিরা ছড়িয়ে রয়েছে।

সে এবার দরজা ছেড়ে বিছানায় এসে বসলে—অলস, শ্লথ শরীর। সে আড়মোড়া ভেঙে একটা লম্বা হাই তুললে। লহঙ্গার মধ্যে থেকে তার ফর্সা দুটি পা বেরিয়ে আছে। কায়া মুগ্ধ চোখে সেদিকে চেয়ে রইলে।

—"আ গেল যা, মেয়েটা আমার দিকে কেবলই চেয়ে চেয়ে দেখে! কি দেখিস লা এত?" সে হেসে কায়াকে নিজের কাছটিতে টেনে নিলে। তার স্পর্শে কায়ার শরীরে শিহরণের ঢেউ খেলে যায়। ... এ কিসের শিহরণ? কেনই বা এমন হলো? কায়া বুঝতে পারে না। এ বন্ধন থেকে সে মুক্তও হতে পারে না।

—"হ্যাঁরে, তোর কাকা কি কখনও তোকে কিচ্ছু বলেননি নাকি রে?"

—"কি বলবেন?"

—"এই ... আমার বিষয়ে ...?"

—"না তো ...।" কায়া ছোট্ট করে জবাব দিলে।

—"আর তার ছেলে?" তার মুখে অর্থপূর্ণ হাসি।

—"কে বিরু? ... ও তো কিছুই জানেনা।" কায়া ভয়ে ভয়ে তার দিকে তাকালে।

—"আরে ও সব জানে। সে মনে করে আমি তার বাপকে ভেড়া বানিয়ে রেখেছি—আমি মায়াবিনী, জাদুকরী! .... আচ্ছা বলতো দেখি, আমাকে দেখে কি মনে হয় যে আমি বশীকরণ মন্ত্র জানি?" তার স্বরে হাসির সঙ্গে কান্না মেশে।

—"বিরু কি কখনও এখানে এসেছে?"

—"আমার কাছে?" তার গলার স্বর রুক্ষ হয়ে ওঠে। —"সে কেন আসতে যাবে লা? তার বাপ আসে সেই-ই কি যথেষ্ট নয়?"

এই নারীর স্বরে এমন এক সম্মোহনী শক্তি রয়েছে, যা কায়াকে মুগ্ধ করে, বশীভূত করে। আবার এক এক সময় তাকে সেটা কাঁপিয়েও দিয়ে যায়। তখন তার উঠে পালিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু যেতে গিয়ে সে আরও কাঠ হয়ে, জবু-থবু হয়ে বসে থাকে। এই রহস্যময়ী নারী উদাসীন চোখে পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে থাকে। তার কথা বলার সাথে সাথে তার নাকের নোলক দুলে ওঠে—বিকেলের পড়ন্ত রোদে তা ঝকমক করে ওঠে। তার আধখোলা ঠোঁটের কোণে একটি বাঁকা হাসি লেগে থাকে। সে হাসিতে এক এক সময় বিদ্রূপ ঝলসে ওঠে। .... এই হিমশীতল বরফ ঝরা রাতে, দূরে এক ছোট্ট কুঁড়ের মধ্যে এই নিঃসঙ্গ একাকিনী, উদাসিনী, আপনভোলা পাহাড়িনী রমণী চুপচাপ এক কোণে বসে রয়েছে। একি বাস্তব না শুধুই স্বপ্ন ... যে স্বপ্ন কেবল পাখনা মেলে ফক্সল্যান্ডের উপর দিয়ে মায়াবী ছোঁয়া ছুঁইয়ে দিয়ে উড়ে যায়? কায়া ভাবে আর ভেবে ভয়, মোহ, শঙ্কায় ও আতঙ্কে বারবার কেঁপে ওঠে—একদৃষ্টে সে এই রহস্যময়ী নারীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

—"এবার বাড়ি যা কায়া, অন্ধকার হয়ে এলো।"

—"হ্যাঁ, এই যে যাই।" কায়া উঠে দাঁড়ালে। সে দরজার দিকে আসতে না আসতেই আবার ডাক—"এ্যই, শুনে যা, ইদিকে আয়!" কায়া তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালে।

—"ইদিকপানে আয়!" কায়া এই অমোঘ আদেশ লঙ্ঘন করতে পারলে না। সে ধবধবে বিছানার দিকে এগোলে, যেখানে সে বসে রয়েছে। সে তার কাঁধ ধরে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে বলে—"তুই খু-উ-ব ভালো মেয়ে রে কায়া!"

কায়া চেয়ে থাকে। সে তার কথায় যতি দিলে। তারপর আবার বলে চলে—"তুই এলে আমার বড় ভালো লাগে রে। আমি মনে বড় বল পাই।" তার স্বরে এখন একটা ভীতির ছোঁয়া। সে যেন অন্ধকারে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছে।

—"আমার দিকে তাকা দিকি?"

কায়া তার দিকে তাকায়।

—"বল্ দিকি, আমায় দেখে কি মায়াবিনী-জাদুকরী বলে মনে হয় না?"

কায়া কোন উত্তর দিলে না। ম্লান গোধূলির আলোকে ওরা দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে রইলে—অনেকক্ষণ!

বাইরে খট্ খট্ শব্দ হলো। সে চমকে উঠে কায়ার কাঁধ ছেড়ে দিয়ে ছিটকে বিছানার দিকে চলে গেল। কে সিঁড়ি দিয়ে ধড়ফড় করে উঠে আসছে।

—"উঃ, আপনি এখানে বসে? আর আমি আপনাকে খুঁজে খুঁজে হয়রান!" পাহাড়ি হাঁপাচ্ছিল। সে একবার কায়ার দিকে, আর একবার তার মায়ের দিকে দেখছিল। বেশ বোঝা যাচ্ছে যে বাড়ি থেকে সে কোয়ার্টার অব্দি দৌড়ে দৌড়ে এসেছে।

—"কেন খুঁজছিলে আমাকে?"

—"একটা লোক এসেছে। চেহারাটা পাহাড়ি লামাদের মতো। আমি প্রথমে ভেবেছিলাম ভিক্ষা চাইতে এসেছে বুঝি। কিন্তু সে তো আপনার কথা বলছে।"

—"আমার কথা?" কায়া অবাক হয়।

—"হ্যাঁ, আপনার নাম করছে। তার মাথার দু'দিকে দুটো লম্বা বেণী ঝুলছে, পায়ে পট্টি বাঁধা। হাঁটার সময় পায়ের মল ঝম্‌ঝম্ করে বাজে।" —কায়ার বুঝতে বাকি রইলো না কে এসেছে। শেষটুকু ভালো করে শোনারও তার তর সইলো না। পাহাড়িকে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে কায়া ঊর্দ্ধশ্বাসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে দৌড় দেয়। নথধারিণী নারীর দিকে একবার সে ফিরেও তাকালে না।

... উঃ, এক নিঃশ্বাসে সে দৌড়ে নেমে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে চারদিকের গাছপালা যেন গোলাকারে ঘুরছে।

মঙ্গতু বাড়ির নীচে সিঁড়ির উপর বসেছিল। কায়াকে দেখে সে দু'হাত বাড়িয়ে দিলে। কায়া তার প্রসারিত দুই বাহুর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তার বুকের মধ্যে ভীরু কপোতীর মতো সে থরথর করে কাঁপছিল। মঙ্গতু সস্নেহে তার ধুলোয় ভর্তি নোংরা মাথার মধ্যে হাত বোলাতে বোলাতে বলে—"ব্যস, ব্যস—আর না— আর না!" কায়ার মুখে কথা নেই, থেকে থেকে চাপা ফোঁপানিতে তার শরীর কেঁপে কেঁপে উঠছে। কায়ার মাথায় বুলিয়ে দেওয়া মঙ্গতুর স্নেহসিক্ত হাতেও রাজ্যের ক্লান্তি জমে রয়েছে।

—"ইস, কি নোংরা! তুই স্নান করিস না? দেখ্ তো মাথায় কত ময়লা জমে রয়েছে?" কে বললে কায়া স্নান করে না? কায়া এখন মঙ্গতুর গায়ের গন্ধের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। এই শরীরের আবেষ্টনীর মধ্যে তাদের বাড়ির, তাদের রান্নাঘরের, তার নিজের খামখেয়ালী জগতের গন্ধ লেগে আছে। এই গন্ধ মঙ্গতু বহু

দূর হতে তার কাছে বয়ে নিয়ে এসেছে, এই গন্ধে সে অবগাহন করেছে। কায়া এবার নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করে—"বাড়ির সব ভালো তো?"

—"হ্যাঁ। ... বাবুরও চিঠি এসেছে।" সে ধীরে ধীরে, থেমে থেমে, চিবিয়ে চিবিয়ে এক-একটা শব্দ উচ্চারণ করে। কায়া যেন তার এক একটি কথা গেলে। তার বদ্ধ ধারণা যে এটি ভূমিকা মাত্র। এই কথার পিছনে আরও কথা আছে— সে কথায় আছে আশ্বাস ও বিশ্বাস—তারই সূত্র ধরে সে কল্পনার জাল বুনে বাকি কটা দিন এখানে কাটিয়ে দিতে পারে।

—"মা ঠাকরুণের কাছে চিঠি এসেছে। তিনি লিখেছেন যে দিল্লী থেকে একদিনের জন্য তিনি মীরাটে গিয়েছিলেন। লামার সঙ্গেও দেখা হয়েছে। সে তোর কথা জিজ্ঞেস করছিল।"

দিল্লী ... মীরাট ... লামা ... আঃ! কতদিন পরে এই নামটা আবার শোনা গেল। "লামা" নামটা সেই কোন যুগে কত কাছে ছিল—তারপর সেটা দূরে সরতে সরতে হঠাৎ একদিন হারিয়ে গেল। এখন এই নামটাকে ঠিক পরিচিতের মতো লাগছে না ... মনে হচ্ছে যেন এই পাহাড়ের আওতায় নামটা গুমরে গুমরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ... কোন এক অশরীরী প্রেতলোক থেকে হঠাৎ উঠে কায়ার সামনে আবার এসে দাঁড়িয়েছে।

—"আমি ছোট সাহেবের সঙ্গে দেখা করেছি। তিনি আমাকে তোর ঘরটা দেখালেন।" মঙ্গতু বলে চলে—"তুই এখানে একা একটা ঘরে থাকিস?"

কায়া মাথা নেড়ে সায় দিলে।

—"এত বড় বাড়িতে, একা একটা ঘরে—তোর ভয় করে না?"

—"না মঙ্গতু ...", কায়া উত্তর দেয়।

—"যাহোক্, এবার বাবু বোধহয় শিগগিরই ফিরে আসবেন।" মঙ্গতু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে।

— "চিঠিতে আর কি লিখেছেন বাবু?" কায়ার ঠোঁট কেঁপে উঠল, শরীরটা ভার ভার ঠেকলে। মাথাটা যেন একেবারে খালি হয়ে গেছে। সে শূন্য চোখে মঙ্গতুর দিকে চেয়ে রইলে।

—"আর কি লিখবেন? চলেই আসছেন যখন! আর মা'ই বা কতদিন একা একা কাটাবেন?"

—"কেন পিসি তো আছেন?"

—"আরে, আমি বলিনি বুঝি? তিনি তো কবেই চলে গেছেন। যেদিন তোকে পৌঁছে দিয়ে গেলেন, তার তিনদিন পরেই তিনি ফিরে গেছেন। বাতের শরীর তো! এখানকার শীত তাঁর সইবে কি করে?" —মঙ্গতুর স্বরে চাপা উল্লাস! ভাবটা এমন যেন শহরের পল্‌কা-স্বাস্থ্যের মানুষ আবার পাহাড়ের শীত সহ্য করতে পারে নাকি?

এ তাদের কম্ম নয়।

তার মানে মা এখন সম্পূর্ণ একা রয়েছেন? আহা, বেচারী! বসে-বসে আর কিই বা কাজ? বারান্দায় বসে 'moving hills' দেখা আর ঘরগুলোতে বাতাসের শব্দ শোনা!

—"ছুট্টু কোথায় শোয় এখন?"

—"মায়ের ঘরে। তোমাদের ঘরে এখন তালা দেওয়া ..." মঙ্গতু কথা শেষ করে না — ব্যথিত চোখে তাকিয়ে থাকে। কায়া পিছন ফিরে বসেছিল। তার পিছন দিকে আকাশে সূর্য ডুবে গেছে। নীচে পাহাড়ের মাথায় অন্ধকার ছেয়ে গেছে। কিন্তু আকাশের পূব মুখে এখনও একটু আলোর রেশ রয়ে গেছে—ঠিক পারদের মতো একটা সাদা উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছে। ... মঙ্গতু সেদিকপানে চেয়ে আছে।

আলো-আঁধারে পুরো শহরটা এখন এক মায়াবী স্বপ্নপুরীর মতো দেখাচ্ছে।

—"ওখানে বরফ পড়তে শুরু করেছে?" কায়া জিজ্ঞেস করলে।

—"তুই যেমনকার তেমনই পাগলী রয়ে গেলি। ওখানে বরফ পড়লে এধারে শুকনো খটখটে থাকবে। বুঝলি হাঁদা মেয়ে?" তার মুখ দিয়ে একটা 'উঃ' শব্দ বেরোয়। তার হাড়গুলি মটমট করে বেজে ওঠে। মঙ্গতু কায়ার দিকে তাকিয়ে থাকে।

—"তোর এখানে থাকতে ভালো লাগছে? কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

—"না মঙ্গতু ... এখানে কোন অসুবিধা বা কষ্ট নেই ... আমি খু-ব ভালো আছি ..." একটু চুপ করে থেকে নিজেকে সংযত রেখে কায়া আবার বললে—"মা'কে বোলো যে আমার বাড়ির জন্য একেবারেই মন কেমন করে না।" মঙ্গতু তার দিকে অবিশ্বাসের চোখে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলে—"আচ্ছা! অবশ্য তোর কাকাও ঠিক এ-কথাই বলছিলেন।"

—"কি বলছিলেন কাকা?" —কায়া হঠাৎ দমে যায়।

মঙ্গতু বলে যায়—"তিনি বলছিলেন যে তুই খুব শান্ত মেয়ে, অত্যন্ত নিরীহ স্বভাবের। সারাদিন চুপচাপ কাটিয়ে দিস। এই বাড়িতে তোর উপস্থিতি একেবারেই টের পাওয়া যায় না। মা-ঠাকরুণকে বললে অবশ্য তিনি মোটেই একথা বিশ্বাস করবেন না; আরে বাবা, এই সেদিন পর্যন্তও তো মেমসাহেব তোমার জ্বালাতনে অস্থির হয়ে ক্ষেপে যেতেন।"

—"কে মিস্ জোসুয়া তো?"

—"মেমসাহেব এখন ভালো করে হাঁটতেও পারেন না। শুধু খবরের কাগজ বের করার জন্যে তিনি একবার বাইরে বেরোন, ব্যস।"

—"মঙ্গতু, সত্যি সত্যিই কি ওখানে জ্বলজ্বলে চোখটা দেখা যায়?"

—"কোথায়?" মঙ্গতু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে।

—"ওই যে? লেটার বক্সটার ... মানে যখন ওটা খালি থাকে।"

—"দুৎ, কি যে তুই বলিস না কায়া — কোন মাথামুণ্ডু নেই।"

মঙ্গতু এবার নিজের গোল টুপিটা মাথা থেকে খুললে, তারপর সেটাকে উল্টে-পাল্টে, হাঁটুর উপর ঝেড়ে-ঝুড়ে কি যেন খুঁজতে লাগলে। সে একটি বহু পুরোনো, খাকি রঙের ওভারকোট পরে এসেছিল। পায়ের উপর পট্টিটা বেশ মোটা লাগছে। তার মানে সে অনেক কাপড় ব্যান্ডেজের মতো করে পায়ে জড়িয়ে রেখেছে। তার পা দেখে মনে হচ্ছে সে যেন কোন যুদ্ধ-ফেরত এক বৃদ্ধ, আহত সেপাই। তার পায়ে জুতোর পরিবর্তে চটের টুকরো বাঁধা—তাতে রাজ্যের ধুলো। মঙ্গতুর পা দেখে কায়ার নিজের ছোটবেলাকার খেলার টেডিবিয়রের কথা মনে পড়ে যায়।

মঙ্গতু নিজের কাঁধ থেকে ঝোলা নামিয়ে তার লালচে, খরখরে হাতে ধীরে ধীরে ঝোলার মুখটা খুলতে লাগলে। ঝোলার মধ্যে থেকে সে দুটি কৌটো বের করলে—একটা বড় আর একটা ছোট।

—"এইযে, এই বড় কৌটোয় নিমকি আছে, সঙ্গে আচারও আছে। আর এই ছোট কৌটোয়—মেমসাহেব তোমার জন্য কেক তৈরি করে পাঠিয়েছেন। যদি বাসি হয়, তাহলে খেয়ো না—ফেলে দিও ... আচ্ছা, এবার চলি।"

—"বারে এখনই কেন যাবে? রাতে এখানে থাকবে না বুঝি?" কায়া ঠোঁট ফোলায়।

—"আর বাড়িতে কি হবে? মা ঠাকরুণ কি একা থাকবেন রাত্তিরে?"

সে উঠে দাঁড়ালে। বিকেলের আলো এখনও মরে যায়নি। বাড়ির দেওয়ালের একটা কোণে রোদ্দুর যাই-যাই করেও ঝুলে রয়েছে। ছাদের উপর আকাশের একধারে ছোট্ট আপেলের ফালির মতো চাঁদ ভয়ে ভয়ে উঠছে। রাত নামার আগেই উঠছে বলে চাঁদটা যেন ভয়ে ও সঙ্কোচে ম্লান হয়ে রয়েছে। মঙ্গতু ফের ঝোলা কাঁধে তুলে নিয়ে যেতে উদ্যত হলো। সে বিড়বিড় করে কিছু একটা বললে—সেটা তার মায়ের বিষয়ে না বাবুর আসার ব্যাপারে অথবা তার নিজের ক্লান্তি ও পায়ের ব্যথার ব্যাখ্যান—কায়া বুঝতে পারলে না।

শুধু কৌটো দু'টি নিজের বুকের কাছে আঁকড়ে ধরে সে দাঁড়িয়ে রইলে।

—"মা'কে কি কিছু বলতে হবে?" মঙ্গতু কায়ার দিকে ফিরে একটু দাঁড়ালে।

না-না-কিচ্ছুনা, কিচ্ছু বলতে হবে না—কায়া জোরে জোরে মাথা ঝাঁকালো। .... মঙ্গতু চলে গেল। কায়ার সর্বাঙ্গ যেন অবশ হয়ে যাচ্ছে। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে, শূন্য চোখে সে মঙ্গতুর যাওয়া দেখতে লাগলে। তার শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি যেন একসাথে একজোট হয়ে হরতালে নেমেছে। তার ইন্দ্রিয়গুলির সজাগ প্রহরীরূপে শুধু তার বুকের ধুকপুকানি মহোদ্যমে কাজ করে যাচ্ছে। কায়ার দেহের সকল ইন্দ্রিয়ের অবস্থিতি এখন কেবল তার চোখে জমা হয়ে রয়েছে—সে চোখ এখন সামনের রাস্তায়!

... রাস্তাটা আকারে লুডোর 'স্নেকএ্যান্ড ল্যাডারের' মতন। সেটা এঁকেবেকে দূরে চলে গিয়েছে। কোনটা উপরে গিয়ে জঙ্গলে মুখ লুকিয়েছে, আবার কোনটা হঠাৎ তরতর করে নীচে নেমে গেছে। মঙ্গতু সেই রাস্তা দিয়ে নেমে যাচ্ছে—কায়া মন দিয়ে তাকে দেখছে। ... ওই তো মঙ্গতু নেমে যাচ্ছে! তার দেহটা ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে .... আস্তে আস্তে ছোট্ট দেহটাও দূরে সরে যাচ্ছে ... সেটা এখন একটা আকারহীন কালো বিন্দুতে এসে দাঁড়িয়েছে। কায়া মঙ্গতুর দেহটার অদৃশ্য হওয়া দেখতে চায় না। ঠিক একটি পাকা শিকারীর মতোই তার চোখ মঙ্গতুকে দূর থেকে নিরীক্ষণ করে চলেছে। বিন্দুটি অদৃশ্য হবার উপক্রম হতেই, কায়া ঝটিতি কৌটো দুটিকে সিঁড়ির উপর রেখে একদৌড়ে উৎরাইয়ের দিকে চলে গেল। ঘন জঙ্গলের ফাঁকে ফাঁকে, যেখানে এখনও রবিকরের করুণ দৃষ্টি এসে পড়েছে, পাকদণ্ডীর উপর মঙ্গতুকে আর একবার দেখা গেল। উপরে উঠছে মঙ্গতু ... এবার মোড়ের মাথায় ... এবার ... নাঃ মঙ্গতু আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। কায়া এবার দৌড়ে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারের নীচের দিকে তর্‌তর্‌ করে নামতে লাগল। ঝোপঝাড়ের কাঁটা তার পায়ে ফুটছে, কাঁটা গাছে তার ফ্রক আটকে যাচ্ছে। ভ্রূক্ষেপ না করে জামা ও পা কাঁটার কবল থেকে যথাসম্ভব রক্ষা করতে করতে কায়া আরও নীচে নেমে গেল। ... ওই তো, মঙ্গতুকে আবার দেখা যাচ্ছে! ওই তো পাকদণ্ডীর শেষ মাথাটা ... মঙ্গতু হন্‌ হন্‌ করে হেঁটে চলেছে ... কায়া একদৃষ্টে দেখে যাচ্ছে। যাঃ, আবার মঙ্গতু একটা কালো বিন্দু হয়ে গেল ... ওই যে গাছের আড়ালে তাকে দেখা যাচ্ছে ... এবার শুধু মঙ্গতুর বাদামী রঙের ওভারকোট পরা পিঠটা দেখতে পাচ্ছে সে। এখন ঠিক একটা বিরাট পাখির মতো দেখাচ্ছে। ভারী দেহে উড়তে না পেরে ডানা ছড়িয়ে পাখিটা দুলকি চালে হেঁটে চলেছে। এবারে পাকদণ্ডী পার হয়ে সে 'ফক্সল্যান্ড' লেখা ওক গাছটার কাছে পৌঁছলো ... এবার ... এবার আর কিচ্ছু নেই। কায়া কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে ... তারপর চিৎকার করে মঙ্গতুকে ডাকতে লাগলে ... হঠাৎ তার নিজের গলার স্বর নিজের কানেই বেসুরোভাবে বেজে ওঠে ... সে চুপ করে যায়। তার নিজের গলার স্বরেই যেন চতুর্দিকে একটা ভীতির আবেষ্টনী জড়িয়ে রয়েছে।

ধীরে ধীরে হতক্লান্ত কায়া বাড়ির দিকে পা বাড়ায়। সিঁড়ির উপরে রাখা কৌটো দুটো পড়ন্ত বিকেলের আলোয় চকচক করছে।

সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে নিজের ঘরে আসার পর কায়া বুঝলে তার মাথা ঘুরছে। সে বিছানার উপর বসে পড়লে। সামনের দেওয়ালটা ঘুরছে। আস্তে আস্তে তার মাথা ঘোরা কমলো। ভিতরের যন্ত্রণারও অবসান হলো। এক বিচিত্র অনুভূতিতে

তার মনটা ছেয়ে গেল। হঠাৎ সে উপলব্ধি করলে, যে সময় বয়ে যাচ্ছে। অন্য কেউ একথা বুঝতে পারে না—কেননা সকলেই নিজের নিজের ঘরে একা, নিঃসঙ্গ হয়ে বসে আছে। বিরু তার পিয়ানোর সামনে, কাকা লাইব্রেরিতে, নথধারিণী নিজের কুঁড়েতে। এরা কেউ জানে না সময় কি করে বয়ে যায়। মনের সকল উদ্দামতা, সব চাঞ্চল্য স্তব্ধ হয়ে গেলে বাইরের সময় তার নিজস্ব গতিতে বয়ে চলে। এ ঘড়ির কাঁটার সময় নয়—কায়ার বয়সী মেয়েদের কাছে ঘড়ির সময়ের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। এ সময় অন্য আর এক সময়—যার তুলনা উলের গোলার সঙ্গে করা চলে। দু'টি বোনার কাঁটার মধ্যে উলের গোলা যেমন বোনার সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে লাফিয়ে একের পর এক পরত খুলতে খুলতে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে, ঠিক সেই রকম করে কায়া তার নিজের মনের ভিতরে সময়ের বয়ে চলাটা উপলব্ধি করতে পারে। মঙ্গতুকে পিছু ডাকতে যে চিৎকার সে করেছিল সে চিৎকার বৃথা যায়নি। তার সেই চিৎকারের মধ্যে যেন সে তার অন্তরের সমস্ত দুঃখ, ক্লান্তি, হতাশা ও গ্লানি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে বাইরে বের করে দিতে সক্ষম হয়েছে। এক দিন যেন এই সমস্ত অনুভূতিগুলি পিরামিডের মতো জমে ছিল। আজ এতদিন পরে, তার চিৎকারের এক ঝটকায় সেই পিরামিডের মমির মড়া চামড়াগুলো যেন খুলে খুলে বেরিয়ে আসতে লাগল। তার অন্তরের দাবদাহ বহির্মুখী স্রোতস্বিনীর মতো গলে গলে বইতে লাগল। কায়া সেই নিঃসঙ্গ বিকালে তার বিছানায় বসে বসে তার অন্তঃসলিলা প্রবাহ দেখতে লাগল। এই প্রবাহ বাইরে থেকে দেখা যায় না —শুধু অনুভূতির ভিতরেই তার নানা রদবদলের মধ্যে ঠাঁই। উঃ, তার মনের ভিতরে ক্লেদের মস্ত বড় একটি ঢিপি কতদিন অনড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শুধু একটিমাত্র ঝটকা ... যে কোন ঘটনার একটা ধাক্কা খেয়ে ফাটল ধরলেই—ঝুরঝুর করে সব ঝরে পড়ে, ভিতরের উষ্ণ লাভাস্রোত বইতে শুরু করে। আজ কায়ারও মনের মধ্যেকার শুকনো জমাট বাঁধা পিণ্ড ধ্বসে পড়ে উষ্ণ লাভার স্রোত বইতে শুরু করেছে। এই লাভার স্রোতে আজ তার ঘৃণা, ক্রোধ, অভিমান, কটু-কষায় ইচ্ছা, মোহ ও ভালোবাসা—স-ব যেন একত্র হয়ে বইতে শুরু করেছে। এ একদিনে জমা হয়নি—অনেক আগে থেকে, তার জন্মেরও পূর্ব হতে সঞ্চিত ছিল। সে যেন এই উপাদানেই গঠিত হয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছে, তার জন্মমুহূর্ত থেকে আজ পর্যন্ত সে এগুলি বয়ে বয়ে বেড়াচ্ছে। শীতের এই রিক্ত নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায়, তার একলা ঘরের বিছানার একান্তে বসে মঙ্গতুর দিয়ে যাওয়া কৌটো দুটি ধরে সে এই মুহূর্তে তার চূড়ান্ত পরিণাম দেখেছে।

কায়া অস্থির হয়ে বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালে। তার অস্বস্তি হচ্ছে। বাইরে বেরুলে মনটা একটু শান্ত হবে। কিন্তু বাইরে মিশ্‌কালো অন্ধকার। গত বছর বরফ পড়ার সময়ে সে আর ছুটু মিলে মিস্ জোসুয়ার সাথে গেটের সামনে বরফ

পরিষ্কার করত। যে সব লোক শীতের সময় বাড়ি ছেড়ে নীচে শহরের দিকে পালাত, তাদের বাড়ির সামনে বরফের ডাঁই জমা হতে হতে একদিন তা চোখের আড়ালে চলে যেত। মনে হতো যেন বাড়িগুলি মরে গিয়েছে। এমন অনুভূতি কি সকলেরই হয়? কায়া জানে না। একদিনের জন্যেও বরফ না সরালে প্রচুর বরফ জমে যেত—বাড়িগুলি বরফের আড়ালে চাপা পড়ে গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যেন চিরদিনের তরে মিলিয়ে যেত। তখন তার বুকের মধ্যে ব্যাকুলতার আর্তি উঠত — সে বরফে ঢাকা বাড়ির দেওয়াল ছুঁয়ে চলে আসত।

হঠাৎ বাড়ির চারদিকের বাতাস একটু কেঁপে উঠল। কায়া তাড়াতাড়ি জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগলে। দূরে পাহাড়ের গায়ে সরীসৃপের মতো কোন জিনিস সাপের মতো পেঁচিয়ে, এঁকে বেঁকে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারেও সেটা চকচক করছে। কখনও সেটা উপরে উঠছে, কখনও নীচে নামছে, তারপর অদৃশ্য হয়ে পাহাড়ের অন্যদিকে আত্মপ্রকাশ করছে। অন্ধকারে একটা আলোর ঝিলিক খেলে গেল—ওঃহো! সিমলা-কালকার ট্রেন—তার প্রাত্যহিক সান্ধ্যসাথী, রোজই এই সময়ে যায়! এক এক সময় পাহাড়টা যেন পুরো ট্রেনটাকে গিলে ফেলে। আবার তা বাইরে বেরিয়ে এলে কায়া তার সঙ্গে নিকট-সান্নিধ্য অনুভব করে। ঠিক সিনেমার স্লাইডের মতো একের পর এক ছোট কামরা তার চোখের সামনে দিয়ে বেরিয়ে যায় বাতাসে ঘড় ঘড় শব্দ তুলে। কায়া ভ্যাবাচাকা খেয়ে মাথাটা আবার ভিতরে ঢুকিয়ে নেয়। এরপর আবার যখন সে মাথা বের করে তখন আবার যে কে সেই—পাহাড় আগেকার মতোই শান্ত ও স্তব্ধ! আঁধারও স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। শুধু অতি দূর হতে রেলের চাকার ঘড় ঘড় শব্দ তখনও শোনা যাচ্ছে। মস্ত বড় একটি জোনাকি পোকা যেন কালকার দিকে উড়ে চলে গেল।

কায়া তার মাথাটা জানলার কাঠের ফ্রেমের ওপরে রেখে হু হু করে কেঁদে উঠলে। সে কেন কাঁদছে, তা সে নিজেই জানে না। এ অশ্রুর কোন আদি বা অন্ত নেই। এ অশ্রু মোছবারও প্রয়োজন হয় না—আপনিই সে ধারাপ্রবাহ শুকিয়ে যায়। পিছনে তার কোন চিহ্নও অবশিষ্ট থাকে না। ... হঠাৎ কে যেন ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলে। অন্ধকারে সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে।

—"তুমি ... তুমি এখানে?"

—"হ্যাঁ, বাইরে থেকে দেখলাম যে তুমি জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছ।" ... কায়া সোজা হয়ে বসলে। আধখানা চাঁদের আলো লামার মুখের উপরে এসে পড়েছে। সে ঠিক ঘরের ভিতরে ঢোকেনি—ঘর ও লাইব্রেরির মাঝামাঝি আবছা ধোঁয়াশার মধ্যে দাঁড়িয়ে।

—"অন্ধকারে বসে বসে কি করছিলে?"

—"কিচ্ছুনা, রেলগাড়ি দেখছিলাম।"

সে কাছে এসে দাঁড়ালে। কায়া যেন লামা ও তার মধ্যেকার ব্যবধানের জায়গাটুকুতে কোন কিছুর প্রবল আলোড়ন হচ্ছে বলে বোধ করলে। কিসের স্পন্দন এটা! এই কি আত্মা? একটা তীব্র সুখের যন্ত্রণায় সে ছটফট করতে থাকে। সেই অপার্থিব সুখ যেন লামার চরণ স্পর্শ করে তার অশ্রুসিক্ত গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। তার দুটি ছোট্ট ছোট্ট বুকেও সে তার স্পর্শ পায়। সেখানে এখনও কোন অব্যক্ত যন্ত্রণা রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। ঠিক আগের মতোই তার এই অনুভূতি, যখন সে তাদের খোলা বারান্দায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে মা কালীর সাধনায় তার বুক দুটোকে খামচে খামচে প্রায় রক্তাক্ত করে ফেলত ... এক নেশাগ্রস্ত উন্মাদিনীর মতো কাঁপতে কাঁপতে ...

—"লামা?"

—'কি হলো কায়া? এই যে ... আমি এখানে!"

—"তুমি ... তুমি কি এটাকে কিছুতেই রোধ করতে পার না?"

কায়া এগিয়ে গিয়ে তার হাত ধরলে আর সেও তার কাছটিতে সরে এলো।

—"দেখো, দেখো, এই যে, এখানে! তুমি পার না একে রোধ করতে লামা?"

লামা কায়ার দৃষ্টি অনুসরণ করে মেঝের দিকে তাকালে ... একি! লামা কই? কোথাও তো কিছুই নেই! সব স্থির ... কোথাও কোন চাঞ্চল্য নেই। শুধু চাঁদের হলদে আলোটা চৌকোনা হয়ে ঘরের মেঝের উপর এসে পড়েছে।

কায়া অপলক চোখে চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে রইলে। ঘরে কেউ নেই। সে যে কখন নিজেরই অজান্তে জানলা ছেড়ে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে তা সে নিজেই জানে না।

●

পাঁচ

— "'বাবাকে' কোথাও দেখেছ কি?"

— "কে? কাকে?"

— "বিরু বাবুকে?" হন্তদন্ত হয়ে উপরে উঠে আসা পাহাড়ি প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেছে। সে যেন তার প্রশ্নের সমাধান কায়ার কাছে চাইছে — তার দৃষ্টিকে জরিপ করে।

— "কেন, সে তার ঘরে নেই?"

— "তার মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে সেই যে বেরিয়েছে, আর তার দেখা নেই।" — পাহাড়ি যেতে উদ্যত হয়। ... পাহাড়ির অনেক কাজ। কায়ার কোন কথা শোনার মতো ফুরসত তার নেই। সে তার কোয়ার্টারের দিকে হন্তদন্ত হয়ে দৌড় দেয়।

কায়া বাইরে বেরিয়ে এলো। শীতে সমস্ত শরীর কুঁকড়ে উঠছে। সত্যিই তো, রাত অনেক হলো। এখনও বিরু ফিরলে না; কোথায় যেতে পারে সে? এ তো বড় চিন্তার বিষয়!

আজকাল বিরু কায়ার থেকে দূরে দূরে সরে থাকে। আগের মতো তার ব্যবহারে আর সৌহার্দ্যপূর্ণ উষ্ণতা নেই। অনেক রাত অব্দি তার ঘরে আলো জ্বলে। একবার কায়া সাহস সঞ্চয় করে বিরুর ঘর অব্দি গিয়েও তার ঘরে কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে চুপচাপ ফিরে এসেছিল। তার ঘরের নৈঃশব্দ্য কায়াকে দূরে ঠেলে দিয়েছিল। তার ঘরের দরজায় নক্ করতে কায়ার হাত ওঠেনি।

এখন বাইরের বারান্দাও শূন্য। বরফ পড়ার সময় হয়ে গেছে। যে কোনদিন তুষারপাত হতে পারে। বারান্দার সব চেয়ার টেবিল ঘরে নিয়ে আসা হয়েছে। আকাশে অবশ্য এখনও পর্যন্ত তুষারপাতের কোন লক্ষণ দেখা যায়নি। আকাশ এখনও ঘন নীলিমায় নীল! ডিসেম্বরের প্রথমেও বাতাস এত পরিষ্কার ও স্বচ্ছ যে মনে হয় বাতাসের দস্তার আবরণের মধ্যে দিয়ে আকাশ উঁকি মারছে। পাহাড়ের উপর নীল আকাশ এ সময় নীরেট ঠাণ্ডা নীল পাথর বলে মনে হয় দূর থেকে। তার উপর পেঁজা তুলোর মতো হাল্কা মেঘের আনাগোনা!

কায়া অনেকক্ষণ ধরে পাহাড়ের উপর মেঘের আনাগোনা দেখতে লাগল। নাঃ, এই মেঘে বরফ পড়ে না। কায়া মেঘ চেনে।

কাকার সঙ্গে কায়া খেতে বসে। বিরুর চেয়ার খালি। পাহাড়ি তার কাজ করে যাচ্ছে। রুটি পরিবেশন করেই আবার নীচে রুটি আনতে দৌড়চ্ছে। পাহাড়ির মনের চাপা উত্তেজনা কায়া টের পাচ্ছে। কাকা কিন্তু চুপচাপ, নির্বিকার চিত্তে খেয়ে চলেছেন।

— "বিরু এখনও পর্যন্ত এলো না!" কায়া তার কাকার দিকে তাকিয়ে বললে।

কাকা খেতে খেতে ঘাড় নাড়েন — "বিরু হয়ত আজ দেরি করে ফিরবে। কোন কোন সময় সে তার মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে রাতে থেকে যায়।"

— "কোথায় থাকেন তিনি?"

— "সঞ্জৌলীতে — এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়।"

— "শুনেছি, সেখানে নাকি বিরাট বড় 'সেমিট্রি' আছে?"

— "সেমিট্রি?" কাকার চোখে কৌতুক। কায়ার দিকে কিছুক্ষণ তিনি চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন — "জায়গাটা তুমি কখনো দেখেছ?"

— "ন্-না ..." কায়া অপ্রস্তুত হয়। মিস্ জোসুয়ার কথাটা সে কি করেই বা কাকাকে বলে?

— "হ্যাঁ, ওখানকার সেমিট্রিটা অনেক পুরানো।" কাকা বলেন। — "এই 'সেমিট্রি'-টা ইংরেজের আমলের। তখন সিমলায় তারা হিল স্টেশন গড়ে তুলেছিল।" কাকা উঁচু হয়ে কায়ার মাথার পিছনদিকে আঙ্গাটির আঁচ দেখলেন। তারপর একটু চুপ করে আবার বললেন — "এখানেও কবরস্থান আছে — তুমি দেখেছ?"

— কাকা হাসছেন।

— "এই বাড়িতে?" কায়া আঁতকে ওঠে। তার শরীরে ঠাণ্ডা শিহরণ খেলে যায়।

— "না, ঠিক বাড়ির মধ্যে নয়, তবে ..." কাকার মুখের মৃদু হাসিটা বহাল থাকে। যদিও তাঁর চোখ দুটি অস্বাভাবিক ঠাণ্ডা আর শান্ত। কাকার মনের ও মুখের ভাব কখনই চোখে ফুটে ওঠে না।

— "তুই টেনিস কোর্ট-টা দেখেছিস?" কাকা একটু সহজ হবার চেষ্টা করেন।

— "হ্যাঁ, একবার বিরুর সঙ্গে গিয়েছিলাম।" কায়া বলে।

— "ওই টেনিস কোর্ট থেকে একটু নীচে নামলেই ... লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপ নজরে পড়বে — সেখানেই মাটির নীচে দুটো কবর রয়েছে। এখন অবিশ্যি তার কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। আগে ওই দুটি কবরের জন্যেই এই বাড়িটা কেউ ভাড়া নিতে চাইত না।"

— "দুটো কবর?"

কায়ার ভয়ার্ত চোখে এখন কৌতূহল! মাছের বঁড়শি গেলার মতো ও একটা কথাতেই আটকে থাকে।

— "একটা কবর এ বাড়ির কর্তার, আর একটা তার পেয়ারের কুকুরের।"

— "কিন্তু এমন কেন?"

— "কিসের কেন?" কাকা তাকে পাল্টা প্রশ্ন করেন।

আসলে কায়া যেটা জানতে চায়, কথায় সে তা প্রকাশ করতে পারছে না। বাড়ির মালিক ও তার প্রভুভক্ত কুকুরটার সম্বন্ধে তার অসীম কৌতূহল। কিন্তু সে কোন ভাষা খুঁজে পায় না। এক বিচিত্র অনুভূতিতে তার মনটা অসাড় হয়ে ওঠে।

— "আর তুমি ... তুমি ... অনায়াসে এই বাড়িটা ভাড়া নিয়ে নিলে?"

— "আহা, বেচারীরা কবরের মধ্যে শুয়ে — তারা আমার কি করবে? আর এই বাড়িটায় এক মস্ত সুবিধা এই যে এটা শহর থেকে অনেক উঁচুতে। ভূতেদের কথা বলতে পারি না, কিন্তু এখানে মশা-মাছির উপদ্রব নেই।"

কিন্তু ... কায়ার শঙ্কা যায় না। এ বাড়িতেই তো কাকিমা মারা গিয়েছেন! পিসির কথাগুলি কায়ার মনে পড়লো। যে ঘরে কাকিমা থাকতেন, তাঁর বাক্স-প্যাঁটরা রাখা আছে — সে ঘরেই তো সে রাত্রে শোয়। ভয় করে না!

কাকা কক্ষণো ভুলেও কিন্তু কাকিমার কথা বলেন না। পাহাড়ি বাসন-কোসন নিতে এসে একটু অবাক হয়ে তাদের দু'জনের দিকে তাকায়। তারা মুখোমুখি হয়ে চুপচাপ বসে আছে — যেন দুটি অপরিচিত লোক। শুধু কাঠকয়লার নিভন্ত আগুন থেকে মাঝে মাঝে চট্ চট্ করে শব্দ শোনা যাচ্ছে। ... সমস্ত বিশ্বচরাচর নিশ্চুপ।

পাহাড়ি এঁটো বাসন নিয়ে ফিরে গেলে কাকা সামনের দিকে একটু ঝুঁকে কাঁপা গলায় ডাকলেন — "কায়া ...! ... তুই কোয়ার্টারে প্রায় রোজ যাস্। তাই না?"

এমা, কাকা জানতে পেরেছেন যে সে কোয়ার্টারে যায়। নিশ্চয়ই সেই মহিলাটি কাকাকে সব বলে দিয়েছেন। ছি-ছি, কাকা কি ভাবছেন!

— "আমি ... আমার শুনে খুব ভালো লাগছে যে তুমি তার কাছে নিয়মিত যাও।"

কাকার চেহারা বেশ হৃষ্টপুষ্ট, লম্বা-চওড়া, আকর্ষণীয়। মাথার চুলে এখনও পাক ধরেনি, মুখের চামড়াও টানটান রয়েছে এখনও পর্যন্ত। কিন্তু এই মুহূর্তে কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে তার মনে হলো তাঁর মুখে বলিরেখা পড়তে শুরু করেছে। কাকা বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

— "কাকা উনি কি এ বাড়িতে কক্ষণো আসেন না?"

— "এখানে? এই বাড়িতে?"

কাকা ম্লান হাসি হাসেন। সে বিস্ময়ে কাকার দিকে চেয়ে থাকে। তাঁর মুখটা এখন হুবহু বিরুর মতো দেখাচ্ছে। ঠিক সেরকমই নিরাশ, গম্ভীর অথচ ম্রিয়মান শান্ত মুখ। বিরুর মুখের ভাষা কায়া পড়তে পারে না। তার মুখের ভাব ভঙ্গিতে কোন দুঃখ, বেদনা অথবা কোন অভাব-অভিযোগ প্রকাশ পায় না। এই সমস্ত পার্থিব

অনুভূতি ছাড়িয়ে তার মুখের উপর কিসের যে একটা হতাশ্বাস ফুটে ওঠে, কায়া তা বুঝতে পারে না। তার মনের কাছাকাছিও সে পৌঁছতে পারে না।

কাকা এক দৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে আছেন। বললেন — "জানিস কায়া, এক এক সময় ভুলে যাই যে তুই একদিন নিজের বাড়ি ফিরে যাবি। মনে হয় যেন চিরকাল ধরে তুই এখানে রয়েছিস, এখানেই থাকবি।"

কাকার কথা যেন মিঠে সুরের মতো কায়ার — "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিলো গো আকুল করিল ... প্রাণ!" সত্যিই তো, তার নিজেরও কি একথা এখন আর মনে পড়ে? প্রথম প্রথম এখানে এসে সে দিন গুনতো — একদিন, দু'দিন ... আর কটা দিন বাকি আছে। কিন্তু কবে যে তার অজান্তে এই অভ্যাসটি চলে গিয়েছে তা সে নিজেই জানে না। তার এখন নিজেকেই যেন কেমন অচেনা ঠেকলে, ভয় করতে লাগল। তার মনের মধ্যে সময়ে সময়ে এক তীব্র ব্যাকুলতা দেখা দেয়, মনে হয় যেন দুটি অদৃশ্য হাত তাকে পিছন থেকে টেনে ধরেছে, দু'হাত দিয়ে তার চোখ টিপে ধরেছে — সে জানে না এ কার বা কাদের হাত। কিন্তু আশা ও আশঙ্কায় তার বুকটা দুরদুর করে ওঠে। ... এ কার হাত তাকে ধরে টানে? কাকার, না বিরুর নাকি সেই নথধারিণীর? ... অথবা এরা কেউ নয় — এ তার মনের ভ্রম মাত্র?

একটা চট্-চট্ শব্দে কায়ার ধ্যান ভঙ্গ হয়। আঙ্গাটি থেকে একটা কয়লা খটাস্ করে সামনে ছিটকে পড়েছে। কাকা চেয়ার ছেড়ে উঠে আবার সেটিকে যথাস্থানে ফিরিয়ে দিয়ে চেয়ারে না বসে কান খাড়া করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

— "এই কায়া, কিছু শুনতে পাচ্ছিস?" তাঁকে উত্তেজিত দেখায়।

কায়া ভাবছিল বোধহয় বিরু ফিরে এসেছে। কিন্তু নাঃ, গ্যালারী বা সিঁড়িতে তো কোন পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না! তবে কিসের আওয়াজের কথা কাকা বললেন?

— "ওই যে, শোন্ শোন্ ... ঝর্ণার জলের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক এক সময় এখান থেকে শোনা যায়।" কাকার স্বরে বালকোচিত উল্লাস। ওঃ, এটি বোধকরি সেই ঝর্ণা, যার কথা ওই নথধারিণী বলছিলেন।

— "চল্ বাইরে যাই। সেখান থেকে শব্দটা পরিষ্কার শোনা যায়।" কাকার স্বরে এক অদ্ভুত উন্মাদনার উত্তেজনা — যেন এটা না শুনলে তাঁর সমস্ত জীবনটাই বৃথা হয়ে যাবে। কায়া শুনেছে যে পাহাড়ের কোলে যারা একা একা বাস করে, তাদের মধ্যে এই উন্মাদনা দেখা যায়। মিস্ জোসুয়ার মধ্যেও ভাবের এমন উচ্ছ্বাস সে অনেকবার দেখেছে।

— "আয়, এদিকে আয়। ... না, দাঁড়া ... নে এটা ভালো করে জড়িয়ে নে।" কাকা নিজের শালটা খুলে কায়ার গায়ে আপাদমস্তক জড়িয়ে দিলেন। বাইরে শুধু

তার মুখটা বেরিয়ে রয়েছে — চোখ দুটো পিট্ পিট্ করছে। কাকা হো হো করে হেসে উঠলেন — "তোকে ঠিক 'কু-ক্লুক্স-ক্লান' (kul-klux-klan) বলে মনে হচ্ছে।" কাকা কায়াকে প্রায় টানতে টানতে বাইরে গ্যালারীর 'ডেকের' ছাদে নিয়ে এলেন — যার তিনি একচ্ছত্র কাপ্তান।

দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে একঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া হাড়ের মধ্যে এসে বিঁধলে। হাওয়ায় পর্দা নড়ে উঠল — তার ছায়া দূরে গাছের গায়ে গিয়ে পড়ল। ... আবহাওয়া একেবারে ঝকঝকে সীসার মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার। চাঁদের এখন পূর্ণকলা চলছে। পাহাড়ের গায়ে হলদে চাঁদের আলো পড়াতে মনে হচ্ছে কে যেন মিটমিটে একটি লণ্ঠন পাহাড়ের গায়ে ঝুলিয়ে দিয়েছে। গাছের গায়ে গায়ে ধূসর ছায়া! গাছের মাথা ধূসর ছায়ার মধ্যে থেকে উঁকি দিচ্ছে।

কাকা পাঁচিলের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। অন্যমনস্ক কায়ার কাঁধে হাত দিতেই সে চমকে ওঠে। — "শুনতে পাচ্ছিস?" কাকা ফিসফিস করে বলেন। কায়া চোখ বুজে শোনার চেষ্টা করে। আপাদমস্তক শালে জড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও সে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপছে। ... হ্যাঁ, একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে। কিন্তু ভালো করে বোঝা যাচ্ছে না। রাতের স্তব্ধতা ভেদ করে একটা অস্পষ্ট ঝর্ ঝর্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। এই শব্দ এক সুরে, এক লয়ে ভেসে ভেসে আসছে। জঙ্গলের কিনারায় কিনারায় তার মর্মধ্বনি এসে বার বার ধাক্কা খেয়ে পাক খাচ্ছে।

— "কী অদ্ভুত পরিবেশ কায়া, যে তোকে বলে বোঝাতে পারব না। আমি প্রায় প্রত্যেকদিন রাতে এখানে এসে বসি। কিন্তু এখানকার প্রকৃতি অদ্ভুত পরিবর্তনশীল। তুই এখন এর একটাই দিক দেখছিস। গরমকালে এই পাহাড়, জঙ্গল, গাছপালা আরও ছড়িয়ে যায়। তখন এদের নিঃশ্বাসও যেন চর্মকর্ণে শোনা যায়। এখন এই শীতের সময় প্রকৃতিও স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে — উঃ, এই অবস্থা একেবারেই অসহ্য!" — কাকা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন।

কাকা কিছুক্ষণ কান পেতে ঝর্ণার শব্দ শোনার চেষ্টা করলেন। তারপর কায়ার দিকে আনমনে তাকালেন। কিন্তু তাঁর নজর কায়ার দিকে নেই, কোথাও নেই। তিনি যেন আত্মসমাহিত হয়ে রয়েছেন। হাল্কা হলুদ চাঁদের আলোয় তিনিও উদাস হয়ে অন্য কোন লোকে হারিয়ে গেছেন। একটু পরে ধীরস্বরে তিনি বলে চলেন — "আমি যখন আর্মিতে ছিলাম, তখন ছুটি-ছাটার দিনে শিকারে বেরুতাম। এখনও যেন চোখের সামনে দেখতে পাই, সেই জন্তুগুলিকে! কোন জন্তুর খুব কাছাকাছি পৌঁছলেই সেও তার সহজাত অনুভূতিতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এক্কেবারে চুপটি করে নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে — যেন দৌড় ঝাঁপে আর কাজ নেই, শুধু আমাদের আসার অপেক্ষা! ... শীতের এই সময়টাও যেন ঠিক সেই জন্তুদের মতো আমাদের আসার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। চারদিক থেমে আছে — ঘাস-পাতা-গাছ —

কোথাও এতটুকু স্পন্দন নেই — সব থমথমে। ঠিক এই সময় ঝর্ণার ঝর্ ঝর্ শব্দ শোনা যায়। এই শব্দ কখনও শুনেছিস, কায়া?"

কাকা বিড়বিড় করে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছেন। কায়ার ঝিমুনি আসতে শুরু করেছে। এক একবার মনে হচ্ছে যেন স্বপ্নের মধ্যে কাকার কথা ভেসে আসছে। টুকরো টুকরো হয়ে, মেঘের ভেলায় ভাসতে ভাসতে। নীচের টেনিস গ্রাউন্ডের তারটা চকচক করছে, চারদিকে দেবদারু, ওক এবং আরও নানাবিধ পাহাড়ি গাছের অরণ্যের উপরে হাল্কা কুয়াশার চাদরের আবরণ, নীচে লম্বা ছুঁচলো ঘাস উদ্ধতভাবে মাথা তুলে আছে। চাঁদের আলোয় সেগুলোকে ঠিক রুপোর তার বলে মনে হচ্ছে। আচ্ছা, এখানেই, এত নির্জন ও শান্ত জায়গাতেই কি সেই দুটি প্রাণী, একজন মানুষ ও অপরটি তার প্রভুভক্ত কুকুর কবরের নীচে নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাচ্ছে? হঠাৎ কায়া বাতাসের দোলায় দোদুল্যমান ঘাসের আড়ালে তাদের পরিচয় খুঁজে পায়। কাকার হাসিতে যে একটা হতাশার ভাব ফুটে ওঠে, তার সমাধান বোধকরি এই ঘাসের আড়ালে রয়েছে — হাত বাড়ালেই তা ধরা দেবে। এতদিন ধরে এই রহস্য তাকে আলেয়ার টানের মতো ছুটিয়ে নিয়ে ফিরেছে। ধরা দিয়েও ধরা দেয়নি। — দূর থেকে দূরে সরে গিয়েছে। পাঁচিলের ওপার থেকে যখন তারা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে, তখনও তারা অদৃশ্য মন্ত্রবলে কোথায় যেন উধাও হয়ে গেছে। আবার তারা ধরা দিয়েছে ঘাসের ডগায়, গাছের পাতার শিরায় ও দূর পাহাড়ের কুয়াশাচ্ছন্ন চূড়ায় — তারা সকলে মিলে কায়ার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে — 'আয় — আয় — আয়'। ... আর ... আর ঠিক এইসময়ই কায়া দেখলে নীচে উৎরাইয়ের শুকনো পাতা মাড়িয়ে মস্ মস্ করতে করতে একটি ছায়ামূর্তি নেমে আসছে। তার বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে ওঠে — 'বিরু ... বিরু ... বিরু ...!" সে ধীরে উচ্চারণ করে।

— "কি বলছিস রে কায়া? ... কে এসেছে? কে অপেক্ষা করে আছে?" কাকা বলে উঠলেন।

নাঃ, কেউ না, কেউ আসেনি। শুকনো পাতায় খরখর শব্দ তুলে বিরু হেঁটে আসবে — এ যেন একেবারেই সম্ভব নয়। হয়ত বা শিয়াল কিংবা অন্য কোন জন্তু পাতা মাড়িয়ে দৌড়ে চলে গেল। জঙ্গলে তো নানান্ ধরনের জন্তু রয়েছে।

কাকা সেদিন রাতে আর কোয়ার্টারে গেলেন না — লাইব্রেরিতে বোতল আর গেলাস নিয়ে বসে রইলেন। নিজের ঘর থেকে কায়া তাঁকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলে। কাকার মুখমণ্ডলে যে একটি উজ্জ্বলতা সে কিছুক্ষণ আগে দেখেছিল — সেটি যেন হঠাৎ মুছে গেছে। এখন কাকাকে এক বৃদ্ধ, অথর্ব, হতাশ ও ক্লান্ত পথিক

বলে মনে হচ্ছে। কাকা একটু পরেই আবার উঠে দাঁড়ালেন। ধীর পদক্ষেপে কায়ার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন — "তুই ঘুমিয়ে পড়েছিস না কি?"

— "না কাকা!" কায়া খাটের উপর উঠে বসলে, কাকা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে।

— "আমি উপরে চললাম। বিরু এলে দরজা খুলে দিস।"

খট্‌খট্‌ করে কাকা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলেন। বাড়ির মধ্যেই অবস্থিত এই সিঁড়িটা কায়ার কাছে একটি কৌতূহলের বস্তু। এ যেন বাড়ির মধ্যেই আর একটি ছোট্ট বাড়ির প্রবেশ পথ। এটা বেয়ে উঠলেই আর একটি বাড়ি। এই দুটি বাড়ির যোগাযোগের সেতু হলো এই সিঁড়িটা — যা বাইরে থেকে দেখা বা বোঝা যায় না।

একটু পরেই পুরো বাড়ি নিঃঝুম হয়ে গেল। এখন কোথাও কোন শব্দ নেই — শুধু হাওয়ার সোঁ সোঁ আর শিয়ালের চিৎকার। এক এক সময় ছাদের উপর চাপা খট্‌খট্‌ শব্দ হয়। তার মনে পড়ল এখানে 'ফ্লাইংফক্স' বা বড় বড় বাদুড় রয়েছে। রাত হলেই ব্যাটারা গাছ থেকে লাফিয়ে নেমে ছাদে চলে আসে — সারা রাত সেখানে হুল্লোড় করে। আবার সকাল হতে না হতেই গাছে ফিরে যায়। তাদের তাণ্ডবনৃত্যের চোটে কোন কোন সময় ঘুম ভেঙে যায়। এদের দেখলে ভয়ে প্রাণ উড়ে যায়। কিন্তু রাতে লেপের তলায় ঘুমের মধ্যে এদের দুমদাম শব্দও তার মৃদু বলে মনে হয়। তার মনে হয় সে যেমন ওদের হুটোপাটির শব্দ শুনতে পাচ্ছে, তারাও ঠাণ্ডায় কাঁপতে কাঁপতে তার নিঃশ্বাসের চাপা শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

কিন্তু নাঃ, এ তো ঠিক ফ্লাইং-ফক্সের চাপা দুম-দাম শব্দ নয়! তবে এটা কি? কায়া ধড়মড় করে উঠে বসে — চোখটা লেগে গিয়েছিল। এখন বোঝা গেল — কেউ দরজায় কড়া নেড়ে যাচ্ছে — খুব আস্তে আস্তে। সে উঠে ঘরের বাতি জ্বালালে। লাইব্রেরির আলো জ্বলছে, কয়লার আগুন অবশ্য নিভে গিয়েছে। খাবার জায়গাটা পেরিয়ে সিঁড়ির কাছাকাছি সে এলো — 'attention please - Steps ahead' কথাটা আবছা চাঁদের আলোতেও বেশ পড়া যাচ্ছে।

কায়া দরজা খুলে দেখে বিরু দাঁড়িয়ে।

— "আমি প্রায় আধঘণ্টা ধরে ..." বিরু কথা অসম্পূর্ণ রেখেই চুপ করে যায়। কায়ার মুখে হয়ত এমন কোন ভাব ফুটে উঠেছিল যা দেখে সে আর কোন কথা বললে না — শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে রইলে।

— "তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?"

কায়া দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল। বিরু ভিতরে এসে ঢুকল। নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে সে চারদিকে একবার তাকাল — পুরো বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে, কেবল লাইব্রেরিতে আলো জ্বলছে।

— "বাবা ফিরেছেন?" বিরু জিজ্ঞেস করে।

— "কোত্থেকে?"

বিরু কথা না বলে তার দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে।

— "উনি উপরে, নিজের ঘরে ..." কায়া বলে।

— "আচ্ছা? বাবা বাড়িতে ... এই সময়?" বিরু আশ্চর্য হয়ে সিঁড়ির দিকে তাকায়।

সিঁড়ি অন্ধকার, কাকার ঘরের দরজা বন্ধ।

— "তুমি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?" বিরু আবার জিজ্ঞেস করে।

— "না তো! তা তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?" কায়া জিজ্ঞেস করে।

বিরুর মুখ-চোখ ঠাণ্ডায় লাল হয়ে গেছে। ব্রাউন সোয়েটারটার এখানে সেখানে খড়কুটো লেগে রয়েছে। প্যান্টের নীচের দিকটা গোটানো, তার তলায় উলের মোজায় কাদা ও মাটি লেগে রয়েছে।

— "উঃ কায়া, আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।"

— "চল বিরু, তোমায় ঘরে পৌঁছে দিই গে।" কায়া বিরুর হাত ধরলে। তার হাতের আঙুলগুলো গরমে আর ঘামে ভিজে রয়েছে।

— "থাক্, আমি নিজেই যেতে পারব।" হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে নিজের ঘরে চলে যায়। কিন্তু ভিতরে না ঢুকে সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে প'ড়ে আবার পিছন ফিরে দেখলে।

— "তুমি কি এখন ঘুমোতে যাবে?"

— "কেন, কোন দরকার আছে?"

— "না মানে — শরীরটা ... কেমন যেন লাগছে। কখনও গরম লাগছে, কখনও শীত করছে।"

— "একটু দাঁড়াও, আমি দরজা খুলে দিচ্ছি।" কায়া দরজা খুলে, ভিতরে ঢুকে আলো জ্বাললে। বিরু ভিতরে ঢুকেই সটান বিছানায় শুয়ে পড়লে।

— "একি, কাপড় ছাড়লে না? এভাবেই শোবে?"

বিরু চোখ বুজে, আড়াআড়ি ভাবে বিছানায় শুয়ে ছিল। তার পা দুটো বিছানার বাইরে ঝুলছে। বালিশের উপর তার রুক্ষ চুল ছড়িয়ে পড়েছে, হাত দুটি বালিশের উপর অলসভাবে ছড়ানো। মাথাটা সে এক এক সময় এদিক-ওদিক নাড়ছে।

— "কায়া, এবার তুমি যাও ... একটু পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়ব।"

— "ঠিক আছে, যাব'খন।" কায়া জবাব দেয়।

ঘরটা ঠাণ্ডা হয়ে আছে। পাহাড়ি সন্ধ্যার সময় ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। আগুন নিভে ছাইয়ের গাদা উপরে উঠে এসেছে। ছাইয়ের ফাঁক দিয়ে কয়েকটি কয়লা উঁকি মারছে। কায়া চিমটি দিয়ে কয়লা খুঁচিয়ে দিলে পর আবার আগুন গন্ গন্ করে জ্বলে উঠল। কায়া দু'পা পিছিয়ে এলো। এবার বোধহয়

আগুন আরও কিছুক্ষণ জ্বলবে। আগুনটা খুঁচিয়ে দিয়ে আবার জ্বালানো — এই কৌশলটা সে পাহাড়ির কাছে শিখেছে। নীচের কয়লা খুঁচিয়ে উপরে তুলে দু'চারটে জ্বলন্ত কয়লা ঠেলে ঠুলে পাশে সরিয়ে দিলেই দিব্যি আগুন জ্বলে ওঠে। ... আগুন ভালো করে জ্বলে উঠতে সে পিছন ফিরেই থতমত খেয়ে গেল। বিরুর উদোম পিঠটা দেখা যাচ্ছে। সে কাপড় বদলাচ্ছে। আগুনের আভায় বিরুর খোলা পিঠটা ধবধবে ফর্সা দেখাচ্ছে। পিঠের মাঝখানে শিরদাঁড়ার উপর হাল্কা লোমের আভাস। কায়া লজ্জা পেয়ে চোখ ফিরিয়ে আবার আগুন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে লাগলে।

— "কায়া!" ... কায়ার হাত থেমে গেল।

— "আমি এবারে যাচ্ছি।" সে বলে।

— "আর একটু পরে গেলে চলে না?"

কায়া আবার পিছন ফিরে দেখলে বিরু লেপের তলায় শুয়ে। তার চোখ দুটি ভিজে ভিজে। কিন্তু লাল টকটক করছে। তোয়ালে দেখিয়ে সে কায়াকে বলে — "সর্দি লেগেছে ... সব রুমাল ভিজে গিয়েছে।"

কায়া কী করবে বুঝতে পারছে না। 'যাব কি যাব না' — এই দ্বিধায় তার পা সেখানেই পাথরের মতো জমে থাকে। আর নজর অন্যত্র।

— "এখানে এসে বসো।" বিরু পা গুটিয়ে নিয়ে কায়াকে বসবার জায়গা করে দেয়। ঘরে আর কোন বসার জায়গা নেই। স্টুলের উপর একটা বোনা মোজা ও আর একটা আধবোনা মোজা, বোনার কাঁটা ও উলের গোলা পড়ে রয়েছে। পিয়ানোর ঢাকনা বন্ধ। ঢাকনার উপর খাতা রাখা রয়েছে।

— "আমার গরম লাগছে, না সত্যি-সত্যিই গরম?"

— "গরম!" কায়া অবাক হয়ে বিরুর দিকে তাকায়। বিরুর কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম!

— "কোথায় গিয়েছিলে বিরু?"

— "কোত্থাও না।" বিরু জবাব দেয়।

— "তুমি বলতে চাও না?"

বিরু বালিশের উপর ভর দিয়ে মাথা তুলে বললে — "আমি গির্জায় গিয়েছিলাম।"

— "এত রাতে?"

— "আমি ওখানে লুকিয়ে বসে বসে যারা আসে তাদের দেখি।"

— "কে আসে ওখানে?" কায়া অবাক হয়। ওই ধ্বংসাবশেষে কে যাবে? কার এত মাথা খারাপ হয়েছে?

— "আশপাশের লোকেরা কাঠ চুরি করতে! দেখনি গির্জার অর্ধেক কাঠ চুরি হয়ে গিয়েছে?" বিরু বলে।

— "তুমি ওখানে কি কর বসে বসে?" বিরুর চোখ জ্বরে ঘোলাটে দেখাচ্ছে। সে কক্ষণো এতকথা একসঙ্গে বলে না। কায়ার মনে হলো সে প্রলাপ বকছে।

— "তুমি ওই আলসেটা দেখেছ? আমি সেখানে দাঁড়িয়ে থাকি।"

— "আলসের উপর?" কায়া চোখ কপালে তোলে — "তোমার ভয় করে না বিরু?"

— "উঁহু! আমি তো কাঠচোরদের ভয় দেখাই।" বিরু হাসলে। কায়া একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে থাকে। তার নিজেরই কেমন ভয় ভয় করছে।

— "তা তুমি ওদের কেমন করে ভয় দেখাও?" কায়া নিজের ভয় তাড়াবার চেষ্টা করে।

— "ওরা না, সত্যি সত্যি ভয় পেয়ে যায়। আমি গম্ভীর গলায় থেমে থেমে বলি — 'আমি যীশু ... আমি স-ব দেখতে পাচ্ছি' ... শুনেই ওরা সব কাঠ-টাঠ ফেলে চোঁ চাঁ দৌড় দেয়।"

বিরু জ্বরের ঘোরে অনর্গল বকে চলে — কোন কমা, সেমিকোলন বা দাঁড়ি না দিয়ে। তার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন এখানে নেই ... তার ঘর ছেড়ে অনেক দূরে চলে গিয়েছে। বড় বড় চোখ দুটো চকচক করছে — সেই চোখে নিশির ডাকের মতো একটি বিচিত্র উদাসীনতার ভাবশূন্য ছায়া নেমেছে।

বিরুকে কে অমনভাবে ডাকে?

ওই গির্জা তাকে ডাকে। গির্জাঘরের দুটো কাঠের তক্তায়, কাঠের ফ্রেমের মধ্যে সেই ঝুলন্ত, অর্ধনগ্ন পেরেকে ক্ষতবিক্ষত শরীর বিরুকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু সে একলা বসে সেখানে কি করে?

চিমনির মধ্যে থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরুনোর শব্দ হচ্ছে। কেউ যেন হেঁপো রুগীর মতো চিমনির ভিতরে বসে বসে খুক্ খক্ করে কাশছে।

বিরু কনুইয়ে ভর দিয়ে উঠে পিয়ানোর উপর থেকে একটা ছোট্ট লাল নোট বুক তুলে নিয়ে নিজের বালিশের তলায় রেখে আবার ধপ করে শুয়ে পড়লে।

— "কি এটা বিরু?" কায়া কৌতূহল সহকারে জিজ্ঞেস করে।

— "এটা ডায়রি — আমি রোজ এতে লিখি কিনা!"

— "কি লেখ, রোজ রোজ?"

— "নিজের বিষয়ে লিখি। বাবা বলে দিয়েছেন নিজের বিষয়ে রোজ লিখতে — ঠিক খবরের কাগজের রিপোর্টের মতন।"

— "তুমি একথাটা এতদিনে তো একবারও আমায় বলনি?"

— "তুমিই কি আমাকে সব কথা বল?" বিরুর গলার স্বর কেঁপে উঠল, স্বরে তার অভিযোগ ফুটে উঠেছে।

— "সব বলতে কি?" কায়া কৌতুকপূর্ণ চোখে তার দিকে তাকায়।

— "তুমি রোজ বিকেল বেলায় কোথায় যাও শুনি?"

কায়ার গলা ও ঠোঁট শুকিয়ে যায়। সে নার্ভাস বোধ করে। চোখ আঙ্গাটির ধোঁয়ায় জ্বালা করে ওঠে।

— "তুমি আমাকে কোথাও যেতে দেখেছ?"

— "আমি সব জানি।" বিরু কথাটা বলেই তার চোখ কায়ার মুখের উপর থেকে সরিয়ে নেয়। ও কি ভয় পেয়ে গেছে? সত্যের মুখোমুখি হতে তার ভয়? অনেক সময় সত্যকে জেনেও আমরা তার মুখোমুখি হতে ভয় পাই। মনে হয় যেটা ধামাচাপা আছে, সেটা ধামাচাপা দেওয়াই থাক। যেন ঢাকা বন্ধ থাকলেই সেটা আপনা-আপনিই মিথ্যায় পর্যবসিত হয়ে একদিন গ্যাস বেলুনের মতো ফুরিয়ে গিয়ে তার সমস্ত চিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে।

— "তুমি কি জানো যে আমি কোথায় যাই?" — কায়া ভিতরে ভিতরে ঘাবড়ে গেলেও বাইরে সেটা প্রকাশ করে না। বরঞ্চ সে বিরুকে প্রশ্নের মাধ্যমে তার নার্ভাসনেস ঢাকতে চায়। কিন্তু বিরু চুপচাপ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে।

— "তুমি ওখানে কোনদিনও যাওনি বিরু?" — কায়া সাহসে ভর করে সেই সত্যের আবরণ উন্মোচনে তৎপর হয়। বিরু এই রহস্যের ভেদ করতে না চাইলেই বা! কায়া তো তার মনের শঙ্কার দোরে ঘা দিতে পারে!

— "না, কোনদিনও না।" বিরু অসহিষ্ণু হয়ে মাথা নাড়লে। — "ওটা বিচ্ছিরি জায়গা!"

— "কিন্তু ... তোমার বাবা তো যান সেখানে!" — কায়া যেন নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে। বিরুর আবেগ নিয়ে সে ছিনিমিনি খেলতে চাইছে।

বিরু কায়ার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকালে। সে নিজেকে একটা আবেষ্টনীর মধ্যে বেঁধে রাখতে চাইছে — সে যেন এই চক্রব্যূহের মধ্যে লুকিয়ে আত্মরক্ষা করতে চায়, কোনমতেই এই গণ্ডী ছেড়ে সে বেরুবে না।

— "আমি জানি বাবা যান। একদিন বাবাও তাঁর ভুল বুঝতে পারবেন ...।" তার স্বরে এক অদ্ভুত দৃঢ়তা। সে যেন এ বিষয়ে অনেক আগেই সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে — এর আর নড়চড় নেই। কেউই তাকে তার অটল সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়াতে পারবে না।

এই মুহূর্তে কায়ার অদম্য ইচ্ছা হলো যে বিরুর কাছে গিয়ে তার হতাশ, জ্বরতপ্ত মুখখানা নিজের দু'হাতে টেনে নিয়ে সান্ত্বনা দেয়। কিন্তু তাকে সে কি বলবে? বিরুর সঙ্গে তার এমন এক ব্যবধান গড়ে উঠেছে যে তার নাগাল পাওয়া শুধু মুশকিলই নয়, একেবারে অসম্ভব। বিছানার উপর শুয়ে থাকা বিরুকে দেখে কায়ার কালীমন্দিরের মা কালীর প্রতিমার সঙ্গে তুলনা করতে ইচ্ছে করল। বিরুকে এখন ঠিক সেই রকম মূর্তিবৎ দেখাচ্ছে — জ্বরতপ্ত, হতাশ, অসহায়, অশরীরী, স্তব্ধ ও পাষাণবৎ!

কায়ার হাত তারই অজান্তে, বিরুর লেপের উপর এসে পড়লে। বিরু ঘুমিয়ে পড়েছে। বিরুর সরু বুকটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে। বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে কাশির ঘড় ঘড় শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কায়া আস্তে করে উঠে দাঁড়ালে। দাঁড়াতেই বিরু চোখ মেলে চাইলে।

— "তোমার ঘুম এসে গিয়েছে। আলোটা বন্ধ করে দিই?"

— "তুমি যাচ্ছ?" বিরুর চোখ কায়ার মুখের উপর। ঘামেতে তার চুল কপালের সঙ্গে লেপ্টে রয়েছে। একটু আগে তার মুখের উপর জ্বরের যে লালিমা ছিল, তা মিলিয়ে গিয়ে তার মুখ এখন অসম্ভব হলদেটে দেখাচ্ছে।

— "এখন আর তোমার গরম লাগছে না তো?" কায়া জিজ্ঞেস করে।

বিরু মুচকি হাসলে। তার হাসিটাও রুগ্ন!

— "না, এখন শীত করছে। কায়া, তুমি যেখানে বসে আছ, সেখানে একটা কম্বল রয়েছে ..."

কায়া কম্বলটা খুলে বিরুর মাথা থেকে পা পর্যন্ত ভালো করে ঢেকে দেয়। বিরু কৃতজ্ঞ চোখে তার দিকে তাকালে।

— "এবার তুমি যাও, আমি ভালো বোধ করছি।" — সে চোখ বুজলে। কায়া কিন্তু নড়লে না। বিরুর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল।

— "বিরু?"

বিরু চোখ মেললে, কায়া দাঁড়িয়ে আছে।

— "আজ রাত্তিরে তুমি নীচের থেকে উপরে উঠে এসেছিলে, কেমন কিনা?"

— "নীচের কোথা থেকে?"

— "টেনিস কোর্টের নীচে, যেখানে উৎরাই আরম্ভ হয়?"

— "না তো! কিন্তু এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছ?"

কায়া দাঁড়িয়েই রইলে। তার মেরুদণ্ডে একটা ঠাণ্ডা শিহরণ বয়ে গেল।

— "না, এমনিই জিজ্ঞেস করছিলাম ..." কায়া বলে।

এবার কায়া ঘরের আলো বন্ধ করে, দরজাটা টেনে দিয়ে নিজের ঘরের দিকে পা বাড়ায়।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে সে অনেক রাত পর্যন্ত টিনের চালে বাদুড়দের হুটোপাটি শুনতে লাগলে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার চোখে ঘুম নেমে এলো। চোখ বুজতেই তার চোখের উপর বিরুর দুটি চোখ ভেসে উঠল — সে চোখ জলের মধ্যে ভাসছে। ঘুমের ঘোরে সে বারবার বিরুকেই দেখতে পেলে — তার নগ্ন, ধবধবে পিঠ — মাছের মতো উপুড় হয়ে আছে। নগ্ন পিঠ ... কায়া নীচু হয়ে যেই তাতে হাত দিতে

যায়, কে যেন তার হাতটা এক ঝটকায় সরিয়ে দিলে — 'কায়া, এই কায়া, এই পেত্নী!' ... আরে, এ যে ছুটুর গলা! বাতাসে ছুটু হাত নেড়ে নেড়ে তাকে ডাকছে। তার হাতের মধ্যে কালো পাখনার একটি ছোট্ট প্রাণী রয়েছে — সেটা ওড়ার জন্যে ছটফট করছে। 'শোন্ ছুটু, এভাবে হাতের মুঠো বন্ধ করে রাখিসনে ভাই ... খোল ..., খুলে ফ্যাল হাতের মুঠোটা ...।' সে এগিয়ে গিয়ে জোর করে ছুটুর হাতের মুঠিটা খুলে দেয়। ছোট্ট জীবটি খোলা মুঠি থেকে বেরিয়ে আকাশে উড়ে গেল। কি এটা? এটা তো কোন পাখি নয়? বাদুড়ও নয়? তবে কি এ? হঠাৎ কায়া চমকে উঠে দেখে দুটি পাখনা মেলে গিনী উড়ে যাচ্ছে ... আরও ... আরও উপরে ... তার পাখনা দুটো ঝলমল করছে ... পাখির মতো চিঁ চিঁ করে ডাকতে ডাকতে গিনী অদৃশ্য হয়ে গেল।

কায়া ঘুমের মধ্যে পাশ ফিরে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লে। ম্লান চাঁদের আলো জানলা দিয়ে এসে কায়ার পাণ্ডুর মুখের উপর এসে পড়েছে — তাকে ভীষণ ক্লান্ত ও অসহায় দেখাচ্ছে।

ছয়

কায়া ফ্রকটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে নিল। অবতলের নীচে ঝোপঝাড়, তারপর টেনিস কোর্ট, তার নীচে আবার গহ্বর ও ঝোপ! এই কাঁটার ঝোপে তার ফ্রক বারবার আটকে যাচ্ছে। সামনে পাহাড়ি ডালিমের লাল জঙ্গল। দূর থেকে মনে হচ্ছে জঙ্গলে যেন আগুন লেগেছে—লাল লাল, পাকা ডালিমে জঙ্গল ছেয়ে গেছে। এই লাল জঙ্গলের আগুনে আর একটি শিখা আগুনের মতো ঝলসে উঠল—একটি লাল রঙের লহঙ্গা! মেহেন্দী রঞ্জিত টুকটুকে রাঙা পা। পায়ের মল ঝন্ ঝন্ করে বাজছে ... সে শব্দ সামনে থেকে উঠে আসছে। নূপুরের শব্দ লক্ষ্য করে কায়া দৌড়ে সেখানে পৌঁছয়।

আজ অসম্ভব শীত। নীচের থেকে কুয়াশা ধোঁয়ার মতো উপরে উঠে আসছে। তারা দুজনে নীচে নামছে। নথধারিণীর পায়ে একবার বিছুটিপাতার রস লেগে গেল। সে উঃ উঃ করে বসে পড়লে। ... ভিজে ঘাসের উপর শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। মাথার উপর খোলা আকাশে মেঘ, নীচে কুয়াশা। এর মাঝে একরত্তি রোদের ফালি! গাছেরাও যেন কাঙালের মতো সেই রোদটুকু চেটে চেটে খাচ্ছে।

কিন্তু আশ্চর্য জীবনীশক্তি এই মহিলাটির। তার হাঁটার বিরাম নেই। চঞ্চলা কিশোরীর মতো সে দুরন্ত-দ্রুত ছন্দে নেমে যাচ্ছে। তার সঙ্গে কায়াকেও সমানে তাল দিতে হচ্ছে। সে ছুটছে! ছুটতে ছুটতে তার কাছে এসে পৌঁছলে পর সে তার কাজলকালো চোখে কটাক্ষ তুলে বললে—"ব্যস? এর মধ্যেই হাঁপিয়ে পড়লি?" সে নিজেও হাঁপাচ্ছে। একে শীত, তায় বরফের মতো কনকনে হাওয়া। এই হাওয়ায় ওরা নাকের জলে চোখের জলে হচ্ছে।

—"আমি এখানে মাত্র একবারই এসেছিলাম। যদিও ঠিক মনে নেই। কিন্তু বোধ হচ্ছে আর বেশি দূর নেই ... প্রায় এসে পড়েছি।" নথধারিণী বলে।

এবার একটু নীচে নামতেই সে কায়ার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিয়ে বলে—"একবার উপরে চেয়ে দ্যাখ—ওই যে আমাদের বাড়ি।"

কায়া উপরের দিকে তাকিয়েই বিস্ময়াভিভূত হয়ে গেল। কি অপূর্ব ধোঁয়াশা! মনে হচ্ছে যেন কেউ এটিকে ফ্রেমে বাঁধিয়ে বাড়ির ঝুলবারান্দার সঙ্গে টাঙিয়ে দিয়েছে। বারান্দাটা খালি, তার উপরেই কাকার ঘর। নীচের তলায় ডানদিকে বিরুর

ঘরের জানলা। এই জানলার পিছনে বিরুর শয্যা ... সে বোধকরি এখনও শুয়ে আছে—তার পাশে উলের গোলা ও বোনার কাঁটা পড়ে। এরপর পিয়ানো। তার 'পরে লাল নোটবুক। বিরুটা রোজ রোজ এতে কি যে সব ছাইপাঁশ লেখে!

হঠাৎ তার মনে হলো সে একা এই জঙ্গলেই বা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করছে? ইচ্ছা করল উপরে, বাড়িতে এক দৌড়ে পালিয়ে যায়। সেই সময় নীচের থেকে নির্দেশ এলো—"বেশিক্ষণ উপরে দেখিসনি কায়া, এরপর কিন্তু মাথা ঘুরবে।"

—"সত্যি? মাথা ঘুরবে?"

—"দেখবি, মনে হবে পুরো দুনিয়াটা গোল গোল করে ঘুরছে।"

আকাশ? হ্যাঁ, আকাশটা ঘুরছে, গাছের উপর মেঘের দলও ঘুরছে—আর ওই যে দূরে বিরুর ঘরের জানলা!

সেই রাতের পর আর তার বিরুর সঙ্গে দেখা হয়নি। বিরু তার ঘর থেকে বেরোয়ইনি। পিয়ানোর শব্দও এখন আর শোনা যায় না। একজন অপরিচিত ডাক্তার তার ঘরে যাওয়া-আসা করেন, কাকার সঙ্গে সলা-পরামর্শ করেন। কাকা একা একা শূন্য ঘরগুলোতে চক্কর দেন। রাতদিন কেবল এ-ঘর আর ও-ঘর করেন। কাকা ডাক্তারের সঙ্গে বাইরে এলেই কায়া তার নিজের ঘরে পালিয়ে যায়।

কায়া কেন ঘরে বসে থাকবে? তার তো বেরুতে কোন বাধা নেই? এই কথাটাই সেদিন নথধারিণী তাকে বলেছিল।

—"তুই বাড়ির মধ্যে বোকার মতো খালি খালি ঘুরে বেড়াস; আমার সঙ্গে যেতে পারিস না?"

—"কোথায় যাব?" কায়া আকাশ থেকে পড়লে।

—"বাঃ, কথা হয়েছিল না যে আমরা যাব? ফিরে যাবার আগে ঝর্ণাটা দেখবি না?"

ফিরে যাবার আগে? হ্যাঁ, তাও তো বটে—সে চিরটা কাল তো আর এখানে পড়ে থাকবে না! সুতরাং সে সমস্ত দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখবে। সে তো চুপচাপ, খালি বসেই রয়েছে, তার তো বেরুতে কোন বাধা নেই?

মহিলাটি খিলখিল করে হাসছে। হাত দিয়ে সে কায়ার চুল এলোমেলো করে দিল—"এ্যই, কি দেখছিস? যাবি না নাকি?"

নথধারিণী আবার এগিয়ে এগিয়ে হাঁটতে লাগলে। বিরু তাকে 'জাদুকরী' আখ্যা দিয়েছে। —"এ্যই কি দেখছিস? যাবি না নাকি?" সে নাকি যা বলে তাই হয়। তার নজর যার উপর পড়বে, তাই-ই নষ্ট হয়ে যাবে। এমনকি গাছপালা, ঝোপঝাড় এবং অনন্ত আকাশও নাকি তার বিষদৃষ্টি থেকে বাঁচতে পারে না। কাকাও নয়! কথাটা মনে হতেই কায়া শিউরে ওঠে। সে তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে হাঁটতে থাকে। অবতলের উপর খরখরে ছুঁচলো সাদা পাথর মাথা তুলে রয়েছে। কায়ার

জুতো বারবার তাতে আটকে যাচ্ছে। পায়ের গোড়ালির কাছটায় জ্বালা জ্বালা করছে— কখনও ঠাণ্ডায়, কখনও গরমে। গাছের মাথায় এখনও কুয়াশা জমে আছে। কিন্তু রাস্তার উপরে, পাথরের 'পরে, ঘাসের ধারে, দেবদারুর ঝরা পাতার 'পরে ছোট ছোট আংটির মতো রোদের ছোট্ট ছোট্ট গোল আভা ছড়িয়ে রয়েছে।

—"একটু দাঁড়িয়ে যা! কিছু শুনতে পাচ্ছিস?" সে কায়ার হাত ধরলে। না তো, কই—কোন শব্দ তো নেই? হ্যাঁ, গাছের ডালের শুকনো খরখরে শব্দ একটা শোনা যাচ্ছে বটে। কোন পাখি বোধকরি ডাল ছেড়ে উড়ে গেল। —তারই খরখরানির আওয়াজ। এ ছাড়া ... কই ... কিছু নেই তো? সেই নির্জনতা, শুধু একটানা ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাকে অঞ্চলটা ছেয়ে আছে।

—"এই নালাটা ... ব্যস, এসে গিয়েছি প্রায় ... আর মোটে দু'পা।"

—"কোথায়?" কায়া জিজ্ঞেস করে।

—"কিসের কোথায়? বলি, তোকে কি আর কেউ এসব দেখাতে নিয়ে আসবে রে? কিচ্ছু শুনতে পাচ্ছিস না বোকা মেয়ে?"

এবার কায়া কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলে। হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে গুড় গুড় করে মন্দ্রস্বরে একটা শব্দ শোনা যাচ্ছে বটে—যেন অনেক দূরে কোন অন্ধকার গুহায় ভারী মেঘের চাপা গর্জন হচ্ছে। কিন্তু কায়ার মনোযোগ অন্য দিকে সরে যায় — একটা মনমাতানো গন্ধে! কোত্থেকে আসছে এ গন্ধ? একি জঙ্গলের বা মাটির গন্ধ? ... না, এ গন্ধ ওই নারীর শরীর থেকে বেরুচ্ছে। কায়ার স্নায়ুতে স্নায়ুতে এ গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে—সে অস্থির বোধ করে ওঠে।

—"কি হলো রে?" সে কায়ার হাত ধরে।

—"কিছু না। এগুবে না?"

—"তুই তো কাঁপছিস রে? কি হয়েছে বল্‌না?"

—"বাবাঃ কি শীত!" কায়া হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সামনে এগুতে থাকে।

... নির্জন অরণ্যে এই নারীর সঙ্গে সে কি করতে এসেছে? .... কিছু দূর পর্যন্ত সে একা একাই এগিয়ে গেল। জঙ্গলের মধ্যে একাকিত্বটা অবশ্য তত গায়ে লাগে না। মনে হয় কেউ যেন দুটি চোখ মেলে তাকে অবিরাম নিরীক্ষণ করে চলেছে। সেই অদৃশ্য চোখ দুটি যেন ঝোপের মধ্যে, ঘন জঙ্গলের আড়ালে থেকে তাকে দেখে চলেছে। এই গহন অরণ্যের আভাস সে বিরুর চোখেও কখনও কখনও পেয়েছে। এখানে যেন চতুর্দিকে অদৃশ্য চোখের ছড়াছড়ি। নীরবে, নিঃশব্দে তারা তাকে অহরহ নিরীক্ষণ করে চলেছে।

হঠাৎ তারা দাঁড়িয়ে পড়ল। এক জায়গায় এসে রাস্তা দুভাগ হয়ে দু'দিকে চলে, গিয়েছে। মাঝখানে একটা পুরানো, জরাজীর্ণ বোর্ডে আবছা লেখা পড়া যাচ্ছে— To the falls. কে জানে বাবা, কোন রাস্তাটা ফল্‌সের দিকে গিয়েছে।

—"নীচে নাম্। তুই দাঁড়িয়ে পড়ছিস কেন বার বার?" নথধারিণী তার কাছে এসে বলে। ... তার ঠোঁটদুটি আধখোলা হয়ে রয়েছে। উপরের ঠোঁটের কাছে একটা ছোট্ট কালো বিন্দু—বিউটি স্পট! কী সুন্দরী এই নারী! —কায়া এই প্রথম উপলব্ধি করলে। বাড়ির চৌহদ্দির মধ্যে বসে থাকা পাণ্ডুর বর্ণের এই নারী বাইরে বেরিয়ে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে। সে যেন এক উচ্ছলা, চঞ্চলা বালিকা। কায়ার ফ্রক ঝোপের কাঁটাগাছে আটকে গেলে সে হেসেই কুটিপাটি হয়। —"পাগলি কোথাকার! এভাবে চলতে চলতে তো তোর পুরো ফ্রকটাই ছিঁড়ে কুটিকুটি হয়ে যাবে।" কাঁটা গাছের ফাঁদ থেকে কায়াকে ছাড়িয়ে নিয়ে সে তার পা পরীক্ষা করে দেখে—কোথাও কাঁটা আটকে আছে কিনা! এরপর তার চোখ ধীরে ধীরে কায়ার শরীরের উর্দ্ধাংশে ওঠে —তার ছোট্ট দুটি চাপা স্তনের উপর! সে পাথরের উপর একটি ডালিম ফল আছড়ে ভেঙে ফেললে। ডালিমের লালচে পাকা রস তার আঙুল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। —"দেখ্, দেখছিস? আমার হাত দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে?" —তার মেহেন্দী রঞ্জিত হাতে ডালিমের রস বাস্তবিকই রক্তের মতো দেখাচ্ছে। এই কৃত্রিম রক্ত দেখে কায়ার শরীরের রক্তও উত্তাল হয়ে ওঠে। এই রক্ত প্রবাহ যেন বাঁধ ভাঙা বন্যার মতো তার শরীরের সমস্ত আগল খুলে বেরিয়ে আসতে চায়।

বাতাসে 'To the falls' লেখা তক্তাখানা নড়ছে। সামনেই ছোট্ট সাঁকো। গাছের গুঁড়ির এই সাঁকোটার নীচেই জলের একটি সরু ধারা বয়ে চলেছে। সাদা ছুঁচলো পাথরের উপর তা আছড়ে আছড়ে পড়ছে। এটাকে দেখে তো ঝর্ণা বলে মনে হয় না। এ তো স্রেফ একটি পাহাড়ি নালা!

—"একটু দাঁড়া ..." পিছন থেকে সে বললে। —"হাতটা ধুয়ে আসি। দেখ্না কেমন চটচট করছে।" কায়া ছুঁলেনা, খালি মহিলাটির দিকে তাকালে—"আর এগুবে না?"

—"ব্যস? এইটুকুতেই হাঁপিয়ে গেলি?" এবার আর সে হাসলে না। কায়ার দিকে একটু তাকিয়েই তর্ তর্ করে নীচে নামতে লাগলে।

মনে হচ্ছে মাথার উপরে নীল আকাশের ছাদ যেন নড়ছে। আলিঙ্গনাবদ্ধ বড় বড় গাছগুলির ডালপালা একটু বাতাস লাগলেই তফাতে সরে যাচ্ছে। তার মধ্যে দিয়ে নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। বাতাস বন্ধ হলেই আবার তারা নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে পড়ছে।

মহিলাটি সাঁকোর নীচে নেমে গেল। কায়া একটা বড়, চওড়া পাথরের উপর বসে পড়লে। চতুর্দিকে দেবদারু ও পাইন গাছের ছুঁচলো পাতা ছড়িয়ে রয়েছে। বাতাস এখন বন্ধ। এখন নালায় ওই সরু ধারাপ্রবাহ ছাড়া আর সব অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে। চারদিক নিঃশব্দ ও নিস্তব্ধ। ... একটু পরে ছপ ছপ করে একটা শব্দ শোনা গেল। মহিলাটি তার হাত-পা প্রক্ষালন করছে, তার ছপছপ শব্দে অদৃশ্য জঙ্গলের

নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ হলো না, বরঞ্চ তা আরও গহীন হয়ে উঠল।

—"এ্যই, তুই হাত মুখ ধুবি না?" নথধারিণী হাত মুখ ধুয়ে উপরে উঠে এসেছে।

—"নাঃ ..." কায়া মাথা নাড়লে। আসলে নালার ধারে গেলেই তার মাথা ঘোরে। ছোট-বড় যে কোন জলপ্রপাতের ধারে যেতেই তার ভয়।

মহিলাটি শুকনো পাইন পাতার উপরে শুয়ে পড়লে। শুয়ে শুয়ে কনুইয়ে ভর দিয়ে সে কায়াকে দেখতে লাগলে।

—"কিরে, ঘুমোচ্ছিস না কি?"

—"না তো!" কায়া আনমনে পাহাড়ের উপর মেঘের আনাগোনা দেখছে।

—"তুই তো রাতেও ঘুমোস না রে! খোলা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি করিস রাতের বেলায় বল্ দিকি?"

কায়ার চোখ প্রায় বুজে এলো। সে তখনও নিরলসভাবে মেঘের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার আধবোজা চোখেও যেন ছোট্ট সাদা মেঘের ছায়া!

—"ওরে, আমিও যখন প্রথম প্রথম এখানে এসেছিলুম, আমারও ঘুম আসত না রে। সমস্ত রাত জেগে থেকে জঙ্গলের সোঁ সোঁ নিঃশ্বাস শুনতুম।"

কায়া চোখ নীচে নামালে। এর স্বরের মধ্যে কেমন একটি মায়াবী ছায়ার আভাস পাওয়া যায়, যদিও তাতে কোমলতার লেশমাত্র নেই।

—"তোর মনে কি কখনও করুণার উদ্রেক হয় রে, কায়া?"

—"কেন? কিসের করুণা?"

—"এই আমার উপর করুণা আর কি!" সে ম্লান হাসল। ... "নাঃ, আমার উপর তোর করুণা আসতে যাবে কোন দুঃখে? ... তোর তো বোধহয় দুঃখ হয় তোর কাকার জন্যে, করুণা আসে বিরুটার উপর!"

তার স্বরে অবজ্ঞা, ঘৃণা ও বিরক্তি একসঙ্গে উপচে পড়ল। কায়া পাথর থেকে নেমে তার কাছে এসে বসলে।

—"কায়া, তুই কি কখনো মরা মানুষ দেখেছিস ভাই?"

—"মরা মানুষ?"

কায়া আবার অন্য মনস্ক হয়ে পড়ে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে গিনীর ছটফট করা দেহ, মায়ের উলঙ্গ দেহের দুই জানুর মধ্যবর্তী একটা থলথলে মাংসপিণ্ড ... না, তারা তো মরেনি ... তারা মরা মানুষও নয় ... কায়া বিচলিত বোধ করে ... সে চারদিকে দেখতে লাগলে ... সূর্যের ধোঁয়াচ্ছন্ন আলো, নালা দিয়ে গড় গড় করে জলের ধারা বইছে—পাথরের উপর তা আছড়ে আছড়ে পড়ছে, আর এই রহস্যময়ী নারী—নীচে শুকনো পাতার উপরে শুয়ে আছে। তার উড়নিটা খসে পড়েছে, পরিপুষ্ট ভরন্ত বুকটা ওঠানামা করছে।

—"দেখিসনি, না? আমিও আগে কোনদিন দেখিনি রে ..." সে খুব আস্তে বললে। —"আমার ভাতার মরলে পর আমি প্রথম মরা মানুষ দেখি।"

—"তোমার স্বামীর মৃতদেহ ...?"

নারী মাথা তুললে। তার নাকের নথটা কাঁপছে। ঠোঁট দুটো ফাঁক করা। কপালে কুঞ্চনের হাল্কা রেখা।

—"আমার মনে এখন আর কোন দয়া-মায়া নেই রে!"

—"সে কে?"

—"তাকে পোড়াতে শ্মশানে নিয়ে গেলে সে রাতে আমায় স্নান করতে হয়েছিল। তখনই আমি এই দাগগুলি দেখতে পাই। সে আমার জন্যে এগুলি তার চিহ্ন হিসাবে রেখে গিয়েছে। দেখবি কায়া? সেই দাগগুলো এখনও জ্বলজ্বল করছে।"

সে তার হলদে কামিজের বোতাম খুললে। তারপর সেটি তুলে নীচের গরম গেঞ্জিটাও তুলে ফেললে। তার উন্মুক্ত ফর্সা ধবধবে পিঠে এফোঁড়-ওফোঁড় দগদগে ঘায়ের দাগ। —"হাত দে, হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখ্!" সে কায়ার হাতটা টেনে নিয়ে নিজের পিঠের 'পরে রাখে। সে তার হাত মাঝে মাঝে নখ দিয়ে আঁচড়ায়, মুচড়ে মুচড়ে ডলতে থাকে। —"দেখ্ দেখ্, ভালো করে ছুঁয়ে দেখ্! ভাতার নেই, কিন্তু তার দেওয়া দাগ রয়ে গেছে।"

কায়া উত্তেজিত হয়ে ওঠে। তার মনে হয় যে তার হাতের নিষ্পেষণে সে ঝরে ঝরে, গলে গলে পড়ছে, টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সূর্যের পাণ্ডুরবর্ণের আলো গাছের ফাঁক দিয়ে কুয়াশা ও মেঘ ভেদ করে তার নগ্ন পিঠের উপর পড়েছে—রক্তরাঙা লাল টকটকে আলো! পড়ন্ত দুপুরের সূর্যের ক্লান্ত আলো। ... কায়া হাত টেনে নিলে। মহিলাটি এবার চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লে। তার এলো চুল ছড়িয়ে পড়েছে। নাকের নথ সূর্যের আলোয় চিকচিক করছে। লহঙ্গাটা হাঁটুর উপরে উঠে গিয়েছে। দুটি পা সে দুদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। পায়ের রুপোর মল কাদা আর মাটিতে মাখামাখা হয়ে গিয়েছে।

সে কায়ার গালে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে লাগলে।

—"কিরে, ভয় পেয়ে গেলি নাকি? ... পাগলি কোথাকার!" সে ফিসফিস করে উঠল। তারপর সে ম্লান হাসলে। তার চোখ এখন কায়ার মুখের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

—"তুই কিচ্ছু জানিস না। আচ্ছা, একটা কথা বলত? তোর ইয়ে ... রক্ত বেরোয়?"

কায়া বিস্ফারিত চোখে তার দিকে তাকায়—"কিসের রক্ত?"

—"নোংরা স্রাব। ডালিমের রসের মতো চটচটে।" ... সে নিঃশব্দে হাসে। দুই ঠোঁটের মাঝখানে তার সাদা দাঁত ঝকঝক করে ওঠে—"তুই কিচ্ছু জানিস না।

কিচ্ছু দেখিসনি—না মরা মানুষ, না নিজের স্রাব!" ... সে পা গুটিয়ে নিলে। তার পায়ের মল ঝনঝন করে বেজে উঠল। ঝোপের মধ্যে থেকে একটা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ শব্দ করে নালার উপর দিয়ে উড়তে লাগল।

—"তোদের বাড়ির চাকর এসেছিল, তাই না?"

—"কে? ও মঙ্গতু?" কায়া তার দিকে তাকালে।

—"আমি ভেবেছিলুম যে তোকে হয়ত নিতে এসেছে। তুই এবার বোধহয় চলে যাবি?" তার চোখে একটা ব্যথা নেমে আসে। কায়ারও মন খারাপ হয়ে যায়।

—"তুমিও তো তোমার বাড়িতে ফিরে যাবে, না? সে যেন তাকে প্রবোধ দিতে কথাটা বললে।

—"কার সঙ্গে যাব বল্?"

—"কেন কাকার সঙ্গে? তিনিই তো তোমাকে তোমার গাঁয়ের থেকে নিয়ে এসেছিলেন?"

—"তুই কি কিছুই জানিস না কায়া? না সব জেনেশুনেও ন্যাকামি করছিস? এখান থেকে আমার আর কোথাও যাবার উপায় নেই।"

—"কায়া!" সে আবার ব্যথিত স্বরে ডাকলে। ... কিছুক্ষণ সব চুপচাপ ... শুধু নালার জলের কলকল শব্দ। —"এখানে আয়।"

কায়া তার গা ঘেঁসে বসলে। তার গা থেকে একটা অদ্ভুত গন্ধ বেরুচ্ছে। তার সঙ্গে মিশেছে দেবদারু পাতার গন্ধ। রোদ ... কুয়াশা ... দেবদারুর গন্ধ সব মিলিয়ে কেমন এক রহস্যময় পরিবেশ।

—"তুই কি কারুকে চাস রে কায়া?"

—"তার মানে? কি চাইব?"

—"আহা, সে চাওয়া নয়। মানে তুই কি কারুকে মনে প্রাণে চাস? ভালোবাসিস?"

এবার সে হাত বাড়িয়ে কায়াকে নিজের বুকের উপরে টেনে নিলে। কায়া হুমড়ি খেয়ে তার বুকের উপর পড়ল। তার নীচে নাকের নথ, নথের উপর তার কপাল, কপালে চুলের ঝাপ্টা—কায়ার দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। সে বলে চলে— "জানিস, তোকে আমি প্রথম কবে দেখি?" তার চোখ চকচক করতে লাগল। সে দুই হাতে কায়ার মুখটা তুলে ধরলে—"তুই বিরুর সাথে উপরে গির্জার ধারে যাচ্ছিলি ... তখন আমার একবার মনে হলো যে তোকে আমি নিজের যথাসাধ্য শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে এই ছেলেটার সঙ্গে মিশতে রোধ করব ...।"

কায়া রুদ্ধশ্বাসে বললে—"বিরু! তুমি বিরুকে দেখতে পারোনা?"

—"আহা, দেখতে পারলেই কি সব হয়? ছেলেটা একটা রামপাগল। সে মনে করে, আমি বিদেয় হলেই বুঝি তার মা ফিরে আসবে। সে তো বুঝতেই চায়না যে

তার মা মরে গিয়েছেন—তিনি কোনদিনই আর ফিরে আসবেন না। যেমন আমার সোয়ামীও আর কখনও ফিরবে না—কেউই ফিরে আসে না।”

না, সত্যিই কেউ ফিরে আসে না। লামা, গিনী—কেউ না। গাছের পাতার সড়সড় শব্দে তার মন দূরে কোথাও উধাও হয়ে যায়। সে যখন ফিরে যাবে—তখন সেই বাড়িও থাকবে না আর লাল টিনের চালাটিও থাকবে না ... সব একে একে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

—“এ্যই কায়া ... কি ভাবছিস, শুনছিস?”

সে নিজের দেহের সঙ্গে কায়ার দেহে চাপা দেয় ... তার অস্থির নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে কায়া যেন জ্বলেপুড়ে খাক্ হয়ে যায়। জঙ্গলের মলিন পড়ন্ত বেলায় তার চোখ মুদে আসে ... আবার সে জেগে ওঠে। আর এই মুহূর্তে তার মনে হলো যে এই নারীর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সে মুক্ত মনে আবার নিজের চারদিকে খোলা আকাশ দেখতে পারে, মেঘের পারে সূর্যের প্রকাশ দেখতে পারে ... দেবদারুর জ্বলন্ত ছুঁচের মতো পাতা সে প্রত্যক্ষ করতে পারে। আর, আর ... ওই ছুঁচের ডগা থেকে যেন নথধারিণী কথিত সেই ‘পচা ও নোংরা’ রক্ত তার দেহে প্রবেশ করে তা রন্ধ্রে রন্ধ্রে বয়ে চলেছে, তার শরীরের এক একটি শিরাকে দুমড়ে-মুচড়ে দিয়ে যাচ্ছে ... আজ পর্যন্ত এটি যেন এক অদৃশ্য জালে আবদ্ধ হয়ে ছিল। এ কি সুখ? এ কেমন সুখ? ... উঃ ছেড়ে দাও আমাকে ... এ সুখ যে আর সয় না ... ছাড়ো, ছেড়ে দাও। কিন্তু কই, কেউই তো তাকে ধরে রাখেনি?

নথধারিণী অনেক আগেই তাকে তার বুক থেকে নামিয়ে দিয়েছে। সে নিজের লহঙ্গা থেকে খড়কুটো ঝেড়ে ফেলছিল। তারপর বিকট একটা হাই তুলে সে কায়াকে নাড়া দিয়ে ডাকলে—“এ্যই আর কতক্ষণ শুয়ে থাকবি? বাড়ি যাবি না? অন্ধকার হয়ে এলো যে!”

সাত

সেই রাতে বরফ পড়ল। শহরের পথঘাট কিন্তু শুকনো খটখটে! পরদিন সমস্ত পাহাড় বরফে ছেয়ে গেল—পাহাড়ে পাহাড়ে এখন একটি উজ্জ্বল রূপালী আভা। পাখির দল ভয় পেয়ে নীচে এসে স্থান নিল। নীচেও তারা ভরসা পেলে না। বাড়ি-ঘরদোর, ছাদ ও চিমনি দেখে ভয় পেয়ে তারা আবার উড়ে যেতে লাগল—কিছুদূর উড়েই আবার তারা বসে পড়ে—পাহাড়ের বরফ যেন তাদের নাস্তানাবুদ করে তুলেছে।

বিরুর পাখি তার নিজস্ব জায়গায়, গাছের উপর বসেছিল। এখন সূর্যকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তার সব রক্ত নিঃশেষ হয়ে গেছে—শুধু একটি পাণ্ডুর রঙের বলয় মাত্র রয়ে গেছে। তারই ম্লান আলো সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে পড়েছে। আকাশ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আকাশের বর্ণচ্ছটায় বরফের উজ্জ্বল রূপালী বর্ণ চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

এ-বছর শীতের এটি প্রথম তুষারপাত। শহরের চারদিকে তার ছোঁয়া লেগেছে! আগে দু'একটি বাড়িতে আগুন জ্বলতো। কিন্তু আজকের এই তুষারপাতের পর যেন সমস্ত শহরে আগুনের ছড়াছড়ি দেখা দিয়েছে। পুরো শহরটার চিমনিগুলি এখন সক্রিয় হয়ে উঠেছে। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় শহরটা ছেয়ে গেছে। দূর থেকে দেখে মনে হচ্ছে—সাদা মেঘ, সাদা বরফ ও সাদা সর্পিল ধোঁয়ার মধ্যে শহরটা যেন আগুনের তাতে লাল হয়ে কাঁপতে কাঁপতে জ্বলছে।

গ্যালারীর এক কোণে প্লেন গাছের শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে। স্তূপীকৃত পাতাগুলির দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হচ্ছে। দিনের বেলায় পাতাগুলি চুপচাপ পড়ে থাকে। কিন্তু সন্ধে হতে না হতেই যেন তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে। দুরন্ত হাওয়ায় পাতাগুলি তখন ঘূর্ণীর মতো বাতাসে ঘুরতে থাকে। পাতার সরসর শব্দে পাহাড়ের মূষিক বাসিন্দারা মহোল্লাসে গর্ত ছেড়ে তাদের দিকে ধাবমান হয়। পাতার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেই তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে যেন লজ্জায় মুখ ঢাকতে আবার গর্তে ফিরে যায়! নৃত্যরত পত্রাবলীর উল্লাস দেখে কে বলবে যে এরা কেবলই শুকনো ঝরা পাতা?

কায়া একা বসে বসে হাওয়া ও পাতার খেলা দেখে। কিন্তু বিরুকে দেখা যায়

না। সেই রাতে তার সেই যে জ্বর হলো, সে জ্বর এখনও ছাড়েনি। সেই ডাক্তারটি ও কাকা বিরুর ঘরে যাতায়াত করেন। কায়া শুধু চেয়ে চেয়ে দেখে। বাইরে যত খুশি ঘোরোনা কেন, বিরুর ঘরে যাওয়া কিন্তু একেবারে নিষেধ। বিরুকে দেখবার জন্যে কায়ার মনটা আঁকুপাঁকু করে ওঠে। এক একবার সে ভাবে—যে জায়গাগুলিতে সে বিরুর সঙ্গে গিয়েছিল, সেখানে গেলে হয়ত সে স্বস্তি পাবে। টেনিস কোর্ট, সবুজ ছাদের প্যাভেলিয়ন, সেই কুকুর আর তার প্রভুর কবর, কবরের উপর থেকে গজিয়ে ওঠা লম্বা লম্বা ঘাস আর গির্জাঘরটা—তার যাবার অনেক জায়গা রয়েছে।

একদিন দুপুরবেলায় চুপি চুপি সে গির্জাঘরে চলে গেল। বোকা মেয়েটা মনে মনে বোধহয় ভেবেছিল যে বিরুর দেখা পাবে সেখানে। ওই আলসের ধারে, মাকড়সার জালের ভিতরে অথবা কড়িকাঠের নীচে—গম্ভীর স্বরে যীশু সেজে লোকেদের ভয় দেখাচ্ছে বিরু। নাঃ, এখানে কেউই নেই। সে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না। এমন একটি লোকও নেই যাকে সে দেখে বা সে কায়াকে দেখে! এখানে অস্তিত্ব বলতে শুধু কালো কাঠের পুরানো মেঝের ফাটল দিয়ে গজিয়ে ওঠা ঘাস রয়েছে। —সে ঘাসও তুষারাঘাতে মৃত। আর রয়েছে চামচিকেদের আনাগোনা। "বিরু .... বিরু ..." কায়া আকুলস্বরে ডাকতে লাগলে। গির্জার বিশাল খালি ঘরে তার ডাক প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরতে লাগল। এই প্রতিধ্বনিই যেন এখানে তার একমাত্র বিশ্বস্ত সঙ্গী!

হঠাৎ কায়ার নজর সেই অর্ধনগ্ন, কাঁটা ক্ষতবিক্ষত ফর্সা পায়ের উপর পড়লে। পেরেকে ঝুলন্ত, কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত দেহের মাথাটা সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। গির্জা ঘরে একমাত্র এই জায়গাটুকুতেই সূর্যের রশ্মি এসে পড়েছে। ওই রক্তাক্ত পায়ের উপর, নিষ্প্রাণ ঝুলন্ত দেহের 'পরে সূর্যের অকৃপণ আলো। এ জায়গা সে আগেও দেখেছে। কিন্তু তখন বিরু সঙ্গে ছিল। গাইডের মতো করে সে বুঝিয়ে দিয়েছে যে মানুষটি কে ছিলেন, কে তাঁর এই দশা করেছিল, কাদের জন্য তিনি ক্রুশে প্রাণ দিয়েছিলেন।

কে জানে, কেমন মানুষ ছিলেন তিনি যে সক্কলের মঙ্গলের জন্য অশেষ কষ্ট সহ্য করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন।

টপ করে কিছু একটা নীচে পড়ল। কায়া ভয় পেয়ে পিছু হটে গেল। ও, এটা একটা ভাঙা পাখির বাসা ... বাতাসের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছে। খড়কুটো দিয়ে তৈরি এই বাসাটা। এতে গাছের একটি শুকনো ডাল ও কয়েকটি পাতাও আছে! কেমন যেন একটা গন্ধ বেরুচ্ছে। কোত্থেকে আসছে গন্ধটা? মিস্ জোসুয়ার ঘর থেকেও মাঝে মাঝে কেমন একটা গন্ধ বেরোয়। তাঁর ঘরে নানারকম জিনিসের নানান্ গন্ধ। বাসি কেক ও পাঁউরুটির একটা আলাদা চেনা গন্ধ রয়েছে। শুঁকলেই, না দেখেও,

বলে দেওয়া যায়—এ মিস্ জোসুয়ার ঘর। তাঁর ঘরের গন্ধ তার খুব চেনা। কায়া হাতে করে পাখির বাসাটা তুলে নিয়ে গির্জার বাইরে বেরুল। বাইরে খোলা জায়গায় সে এককোণে অতি সন্তর্পণে পাখির বাসাটা রেখে দিলে। হাওয়ার স্পর্শে বাসা থেকে ঘড়কুটোগুলো এক এক করে বেরিয়ে উড়ে যেতে লাগল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখির বাসাটার আর কিচ্ছু অবশিষ্ট রইল না—শুধুমাত্র গাছের ডালটা তার শেষচিহ্ন নিয়ে পড়ে রইল। কায়া চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলে। উঃ, এই শহরে কত হাওয়া! পাহাড় থেকে বরফের উপর দিয়ে এই হিমেল হাওয়া নীচে নেমে এসে মাতিয়ে দিয়ে যায়!

"আমি এবার নীচে নেমে যাব। আমার সঙ্গী হবে এই ফুলের দল—শীতেও এরা কেমন বেঁচে থাকে—মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে ... শহরের থেকে অনেক উপরে ... কিন্তু ... আমি তো এখানকার লোক নই ... আমায় তো আরও নেমে যেতে হবে ... একটু নামলেই কিছুদূর ব্যবধানের মধ্যেই ওই বাড়িটা—ফক্সল্যান্ড! কি অদ্ভুত নাম, না! সেই ইংরেজ ভদ্রলোক, যিনি 'ফক্সল্যান্ড এ্যান্ড দি পাসিং টাইম' বইটা লিখেছিলেন—এখন মাটির নীচে তাঁর ভক্ত কুকুরের সঙ্গে শুয়ে আছেন। একদিন রিজ থেকে এই বাড়ির চিমনিটা আমি দেখেছিলাম। তখন পিসি সঙ্গে ছিলেন। এখন পিসিই বা কোথায় আর আমিই বা কোথায়! পিসি শহরে আর আমি এই গির্জার ময়দানে! মধ্যিখানে কত্তোগুলো পাহাড়! আমার মনে হয় পাহাড়েরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স-ব দেখে। আমি যে এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সেটাও সামনের এই পাহাড়টা দেখছে। যখন আমি এখান থেকে চলে যাব আর এখানে থাকব না, তখনও পাহাড়টা এই গির্জাঘর, এই ময়দান, এই ফুলের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখবে। আমার অনুপস্থিতিটাও সে দেখবে। আচ্ছা, এমন কি হয় না, যে আমি এখানে না থেকেও, অন্য কোন জায়গা থেকে, কোন পাহাড়ের পিছন থেকে নিজেরই অনুপস্থিতিটুকু তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে পারি? এমন তো আগেও কতবার হয়েছে। আমি নিজের ঘরের মধ্যে শুয়ে থেকেও সটান চলে গিয়েছি মা ও ছুটুর কাছে। লামার কাছেও গিয়েছি। তখন মনে হয়েছে যে আমি একটি ধূলিকণা বিশেষ অথবা এক সর্পিল ধোঁয়া—যাকে কেউ রুখতে পারে না। আমি ঠিক একটি সুতোর রিলের মতোই এগুলোর মধ্যে নিজেকে সম্পূর্ণ গুটিয়ে নিই। নিজের বিছানায় শুয়ে সম্পূর্ণ অনড় থেকেও আমি চলমান হয়ে ঘুরি-ফিরি। কিন্তু এখন? ঠিক এই মুহূর্তে আমি কিছুই নই—ধূলিকণা, সুতো বা ধোঁয়া—কিচ্ছু নই! কুহেলিকাও নই ..... এখন এখানে বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ ও ভাঙা কড়িকাঠের মর্মরধ্বনি রয়েছে। আমি শেষবারের মতো মাথা ঘুরিয়ে যখন গির্জাটাকে আর একবার দেখলাম, তখন ব্যথায় বুকটা টনটন

করে উঠল। আমি এমন এক অমূল্য সম্পদ এখানে রেখে যাচ্ছি, যার কথা কখনই লামা বা ছুটুকে বলতে পারব না। এর জন্ম এখানেই, সে নিঃসঙ্গ ... এখানে মা বা বাবু অথবা একটি সুরক্ষিত গৃহকোণ—কোনটাই নেই, এমনকি বিরুও তাকে চেনে না, যদিও বিরুর সঙ্গেই এখানে এসে আমার প্রথম সে অভিজ্ঞতা হয় ... এই গির্জার স্যাঁতসেঁতে অন্ধকারে, তার দেওয়ালে, বাতাসের হা-হুতাশে আর এই ভাঙা-চোরা, আধপোড়া কাঠের ইমারতের দরজার চৌকাঠেই তার প্রথম সূচনা। এ এক বিচিত্র বন্ধন—যেন ফাঁসির মতো চেপে ধরে আছে—তাকে ধরা ছোঁওয়াও যায় না আবার বের করে ফেলে দেওয়াও যায় না। এ যেন বেদনা বা হতাশা নয়, আবার সুখও নয়—এসবের বাইরে এ এক বিচিত্র অনুভূতি ... যা শিরায়-মজ্জায় মিশে গেছে—হয়তো অনেক বছর পরে এই অনুভূতির কথা ভুলে যাব, সামনে এলেও তাকে চিনতে পারব না, এর অর্থ বুঝব না। এর মধ্যে কি বোঝার মতো সত্যিই কিছু আছে যা শিখে সুন্দরভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে পরিবেশন করা যায়? এর অস্তিত্ব রয়েছে শুধু পাহাড়ে পরিবেষ্টিত, ভাঙাচোরা এই ছাদের নীচে। একথা কেউ জানবে না। ধীরে ধীরে এটি শূন্যে মিলিয়ে যাবে। অনেকদিন পরে যখন এই গির্জাঘরের আর ধ্বংসাবশেষও থাকবে না, যখন লোকে এর গা থেকে কুরে কুরে শেষ সম্বল কাঠটুকুও নিয়ে তাদের পেটের আগুন নেভাতে জ্বালানির কাঠ করবে, সেদিন ... সেই মুহূর্তে একটি ছোট্ট স্মৃতি, ছোট্ট অনুভূতি চিরশূন্যে মিলিয়ে যাবে—এক শান্ত ক্লান্ত দুপুরে আমি বিরুর সঙ্গে এখানে এসেছিলাম।"

পাহাড়ের গায়ে গায়ে মেঘের আনাগোনা হতে লাগল আর কায়া নীচে নামতে লাগল। নীচে পাকা সড়ক পর্যন্ত পৌছতে না পৌছতেই অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। বাতাস উপরে উঠে আসছে। গেটের পাল্লাটা ক্যাঁচকোঁচ শব্দ তুলে নড়ছে। ওক গাছটার কাছে এসে কায়া থমকে দাঁড়ালে। একটি রিক্সা দাঁড়িয়ে ... তার কাছেই কয়েকজন লোক আগুন জ্বেলে হাত সেঁকছে। গেটের মধ্যে ঢুকে সে অবাক হয়ে ভাবতে লাগল যে এসময়ে কে আসতে পারে? বিস্ময়াহত দৃষ্টিতে সে একবার রিক্সা, একবার লোকগুলির দিকে ও একবার ধোঁয়ার দিকে তাকাতে লাগলে।

ওক গাছের মাথায় বাতাসের অস্থির মাতন। ফক্সল্যান্ড কথাটার আড়াই অক্ষর কখনও দেখা যাচ্ছে, কখনও বা পাতার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কায়া জোর কদমে পাকদণ্ডীর এবড়ো-খেবড়ো পথে হাঁটতে লাগলে। নীচের সমতল হতে, গহ্বরের শূন্যতা বেয়ে মেঘ উপরে উঠে আসছে ... ঘরের জানলায় অস্তরাগ রশ্মির ঝিলিক!

বাড়ির সামনে এসে বারান্দার দিকে তার নজর পড়ল। আধো আলো, আধো ছায়ায় বারান্দার এককোণে কেউ দাঁড়িয়ে রয়েছে। কায়ার বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। কিন্তু পা যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। সে দৌড়ে পালাতে গিয়েও যেন পালাতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলে। সে আর একবার বারান্দার দিকে তাকালে। ... কালো মেঘে পশ্চিমাকাশের পড়ন্ত রোদকে আড়াল করে দিয়েছে ... সে মেঘ উদ্‌গত অশ্রুর বাদলধারা হয়ে তার চোখের কোলে নেমে আসছে—সে ধারার সমান্তরাল কালো রেখায় পড়ন্ত উজ্জ্বল রোদ আড়াল হয়ে যাচ্ছে। কায়া এই ধারাকে বয়ে যেতে দিলে। চোখের জলে তার দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এলে সে আবার দৌড়ে ভিতরে পালাবার চেষ্টা করে—দরজার দিকে যেতে গিয়ে তার মনে হয় গলার মধ্যে কান্নার একটা দলা আটকে আছে। তার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সে থমকে দাঁড়ালে। অজান্তে সে তার দুই হাত উপরে তুলে দিলে ...

রেলিং-এর উপরে মেঘ ও রোদের আলোছায়ায় দাঁড়িয়ে তার আসা দেখছেন —কায়ার বাবু!

তৃতীয় খণ্ড

সান্ত্বনার সীমানা পেরিয়ে

এক

মনে হচ্ছে যেন কতযুগ পেরিয়ে গেছে। আমি কিন্তু আগের মতনই রয়ে গেছি। শীতের সময়, যখন কাকার বাড়ি ফক্সল্যান্ডে গিয়েছিলাম—এই ফক্সল্যান্ড আমাদের এই শহর থেকে অ-নে-ক উঁচুতে, তখন সকলেই আমাকে কায়া বলে ডাকতো। ... এখন দেখছি এখানে সব বদলে গেছে। আমি যখন ফিরে আসি, তখন সমস্ত শহর বরফে ঢেকে গিয়েছিল। লোকে বলে সে বছরে সবচেয়ে বেশি শীত পড়েছিল। বরফের ধাক্কায় অনেক বাড়ি ঘর ধসে পড়েছিল। আমাদেরটা অবশ্য যেমনকে-তেমনই রয়ে গেছে। অনেকদিন শহরে কাটিয়ে আবার আমি এই ছোট্ট পাহাড়ি স্টেশনটায় নামি—আমাদের বাড়িটা অবিকল আগের মতোই দেখতে লাগছিল—যেমনটি আমি ছেলেবেলা থেকে দেখে আসছি। —সেই লাল টিনের চালা, আগের মতোই খোলা ঝুলবারান্দা, সেই সিঁড়ি—যেটি সোজা মিস্ জোসুয়ার বাড়ির আওতায় গিয়ে শেষ হয়েছে। কিছুই তো বদলায়নি দেখছি!

না, একটু বদলেছে। এমন একটি স্মৃতি, যা বছরের পর বছর ধরে আমাদের সুখ-দুঃখের সাথী ছিল—সেটি লুপ্ত হয়ে গেছে। আমরা কেউ তাকে ধরে রাখতে পারিনি—খুবানীর সেই বিশাল গাছটি—যে ছিল আমাদের নিত্য সঙ্গী। একদিন রাতে আমি আমার ঘরে একলা বসে ছিলাম। সেদিন অসম্ভব শীত। হিমেল হাওয়া বইছে। এটি বরফ পড়ার পূর্বাভাস। সমস্ত শহরটা একটা পাতলা হলদে কুয়াশায় ঢেকে গিয়েছে। ... ঘর থেকে বসে বসে আমি প্রাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ করছি। ছুটু এখানে নেই। পিসির সঙ্গে মীরাটে গিয়েছে। হঠাৎ একটা কড়কড় মড়মড় শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। অবশ্য আমি এটিকে বিশেষ কোন গুরুত্ব দিইনি। পাহাড়ি এলাকায় ঝড়-বৃষ্টি-তুষারপাতের সময় নানারকম শব্দ শোনা যায়। কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই—হা হতোস্মি! খুবানীর গাছটা মঙ্গতুর কোয়ার্টারের ছাদের উপর ধরাশায়ী হয়ে পড়ে রয়েছে—তার ডালপালা, শাখা-প্রশাখা সমেত! শুধু গাছের কাণ্ডটা কঙ্কালের মতো স্ব-স্থানে দাঁড়িয়ে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু আশ্চর্যও লাগল। এত পুরানো ও মজবুত গাছটা, প্রতিবছর ধরে ঝড়ঝঞ্ঝা, শীত ও তুষারপাত সয়ে যে দাঁড়িয়ে ছিল, তা একরাতের ঝড়েই কাত হয়ে পড়ল? মা যখন ভালো ছিলেন, তখন এই খুবানী গাছটার তলাতেই বসে শীতের অলস দুপুর

কাটাতেন। আমি তখন খুব ছোট। আমার কান্নাকাটি করার ছুতোর অভাব ছিল না। মনে পড়ে, কোন কারণে ভয় পেয়ে আমি কাঁদতে কাঁদতে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে মায়ের কাছটিতে খুবানী গাছটার নীচে আসতাম। এখন আর আমার ভয় করে না। আমি বড় হয়ে গেছি। মায়ের দেহের আকার কিন্তু দিনে দিনে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাঁকে দেখে আমি মনে মনে চাপা স্বস্তি অনুভব করি যে আর আগের মতো সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে না, যা আমি এক রাতে নিছক কৌতূহলবশতই খোলা ঝুলবারান্দায় ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দেখে ফেলেছিলাম। মা কিন্তু এখন খুব চুপচাপ থাকেন। আমাকেও আর আগের মতো কাছে ডাকেন না। আমার তাতে কোন দুঃখ নেই। কিন্তু এক এক সময় যখন মা'র মাথায় ভূত চাপে, তখন আমার মরণ-দশা হয়। হঠাৎ করে মা আমায় কাছে ডেকে নিয়ে আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেন। তারপর আমায় টেনে-হিঁচড়ে বাথরুমে নিয়ে গিয়ে গরম জলে, একেবারে চুবিয়ে, ড'লে ড'লে স্নান করান। উঃ, সে এক অসহ্য যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি। মায়ের আর একটি ব্যবহারে আমার অবাক লাগে। তিনি বারবার আমায় জিজ্ঞেস করেন —'তোর কিছুই হয়-টয় না তো?'' আমি অবশ্য জোরে জোরে মাথা নেড়ে না বলি। কিন্তু বুঝতে পারি না, তিনি কি হওয়ার কথা বলছেন? কিন্তু জিজ্ঞেস করতে সাহস হয় না। মায়ের কথায় আমার ঝর্ণার ধারে সেই মহিলাটির কথা মনে পড়ে যায়। তিনিও আমাকে এরকমই একটা কথা বলেছিলেন। এক এক সময় মনে এক দুরাশা জাগে—'আহা, আমার যদি কিছু হয়-টয়, তা'লে বোধহয় আমায় কেউ আর হোস্টেলে পাঠাবে না।' আমি তাই সুযোগ পেলেই মা কালীর কাছে গেড়ে বসে প্রার্থনা করি—'হে-মা! আমার কিছু হচ্ছেনা কেন? যা হবার স্কুল খোলার আগেই হয়ে যাক্ না।' এখন কিন্তু আমি আর প্রার্থনা করার সময় নিজের কাপড়-চোপড় খুলে ফেলি না। আমার লজ্জা করে না বুঝি? আর এখন তো শীতের সময়; খোলা বারান্দায় বরফ জমে থাকে।

উঃ, আগে এমন এক একটি দিন গিয়েছে ... শীতের দিনগুলি কি বিচ্ছিরি হয়, না! লম্বা, একটানা, একঘেয়ে। সেই দিনের কথা এখনও মনে করলে মনে হয়, রাতও যেন একঘেয়ে সাদা ফ্যাটফ্যাটে ছিল। মনে পড়ে, অন্ধকারে আমি যখন মিস্ জোসুয়ার বাগানের ভিতর দিয়ে হাঁটতাম, তখন বরফে ঢাকা গাছের ডালপালার মধ্যে দিয়ে আকাশটাও সাদা দেখাত। ভয় পেয়ে নিজের ঘরে দৌড়ে পালিয়ে আসতাম। এক এক সময় ছুটুর বিছানাও খালি থাকত। গিনীর মুখে করে আনা জিনিসগুলি কিন্তু অটুট থাকত। হাওয়ায় লামার ঘরের দরজা তখনও খটখট করত—এখনও করে। আমি একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছুটির দিন গুণতে শুরু করে দিই ... আর কতদিন? আগে কখনও আমি এমন করিনি। ... থেকে থেকে একটি বিচিত্র অনুভূতি হয় মনের মাঝে—আমি বড় হয়ে উঠছি। আমি এখন আর কারও

উপর বিশ্বাস রাখি না; বিশেষত যেদিন বাবু আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠালেন ... মনে হয় 'বিশ্বাস' অক্ষরটাই যেন আমার অভিধান থেকে সেদিনই মুছে গিয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় যে আমি এখন এমন একটি বয়সে উত্তীর্ণ হয়েছি, যেখানে 'বিশ্বাস' কথাটাকেই বিশ্বাস করা যায় না, সর্বত্রই ছলনার ছড়াছড়ি —কোন কিছুর উপরেই আর আস্থা রাখা যায় না। মনের এই বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে আমি ছুটুর খালি বিছানাটাই আঁকড়ে ধরি, সেটাকে দুমড়ে-মুচড়ে একাকার করে ফেলি .. মনে হয় ছুটু যেন সেখানে শুয়ে আছে। বাতাসে গিনীর টুকিটাকি আনা জিনিস খরখর শব্দ তুলে তাদের উপস্থিতির কথা জানান দেয়। মঙ্গতুর ছাদের উপর ধরাশায়ী খুবানীর গাছও যেন আর্তনাদ করে ওঠে। আমার মনে বিস্ময়ের উদ্রেক হয়—ভেঙেচুরে, দুমড়ে-মুচড়ে, ধরাশায়ী হয়ে যাবার পরেও কি গাছ বেঁচে থাকে? কাতরায়?

একদিন মঙ্গতু এসে বললে—"তোমায় বাবু ডাকছেন, এক্ষুনি এসো।" বাবু তাঁর ঘরে আমায় ডেকে পাঠিয়েছেন? এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা। তিনি কখনই আমায় বা ছুটুকে ডেকে পাঠান না। ... আমি ঝটপট তৈরি হয়ে নিলাম। বাবুর সামনে কখনই আমি আটপৌরে বেশে বেরোই না। সেদিন সন্ধ্যায় ফক্সল্যান্ডে থাকাকালীন আমি গির্জা থেকে যখন ফিরছিলাম আর বাড়িতে বাবু বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন, তখনও আমি বেশভূষায় ফিটফাট ছিলাম। তাঁর কোন নির্দেশ ছাড়াই আমি সেদিন নিজের ঘরে এসে ফিরে যাবার জন্য জিনিসপত্র গুছিয়ে-গাছিয়ে প্রস্তুত হয়েছিলাম।

আজ, এতবছর পরেও আমি যখন রেলওয়ের ওয়েটিংরুমে বা প্ল্যাটফর্মে একা একা বসে থাকি, তখন হঠাৎ করে মনে হয়—এই বোধহয় বাবু এসে পড়বেন আর আমিও টুঁ শব্দটি না করে তাঁর সঙ্গে আমার স্যুটকেসটি নিয়ে পাড়ি দেব। তিনি কোথায় যাচ্ছেন বা যাবেন, হয়ত সে জায়গা আমার গন্তব্যস্থান নয়; এসব না ভেবেই আমি তাঁর সঙ্গ নেব।

...আমাকে দেখে বাবু একটু বিস্ময় বোধ করেন, হয়ত বা অপ্রস্তুতও!

—"কোথাও বেরুচ্ছিলে নাকি, কায়া?" আমাকে ফিটফাট দেখেই বোধকরি প্রশ্নটা করলেন। তিনি তো আর জানেন না যে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলেও আমি পোশাক বদলে তৈরি হয়ে আসি। তখন প্রায় সন্ধে হবো-হবো। বাইরের বরফের সাদা উজ্জ্বল আলো ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। বাবু একটু ইতস্তত করে অবশেষে মুখ খোলেন—'ইয়ে, আমি ফক্সল্যান্ডে গিয়েছিলাম। বাড়ির সক্কলে তোমার কথা জিজ্ঞেস করলে। তোমাকে সকলেই 'মিস' করছে!" এরপর ততোধিক ইতস্তত সহকারে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আসল কথাটা পাড়লেন—'ইয়ে, জানো তো, তোমার হোস্টেলটা তোমার কাকার বাড়ির খুবই কাঁছে। ছুটি-ছাটার দিনে বা কখনো-

সখনো এমনিই ইচ্ছে করলে তুমি বেশ সেখানে যেতে-টেতে পারবে।”

ও! এই তাহলে বাবুর মনের কথা! সেইজন্যেই এত গৌরচন্দ্রিকা! দুটি সান্ত্বনার বাক্য বলে তিনি দায়মুক্ত হলেন। আমি সবকিছু বুঝে-সমঝেও চুপটি করে বসে রইলাম। আমার আর কি? আমার মনের মধ্যে থেকে কবেই তিনটি জিনিস চিরতরে হারিয়ে গেছে—আশা, বিশ্বাস ও ভয়! আমি শুধু কাকার বাড়ি কেন, যে কোন জায়গায়ই যেতে পারি—আমার কোন তাড়া নেই, কারুর প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। কাকার বাড়িতে কিছুদিন থেকে আমি অনেক পরিপক্ক হয়ে এসেছি। কোন আশ্বাসেও আমি আর আশ্বস্ত হই না। ... ইচ্ছে করল এই কটি কথা আমি চেঁচিয়ে বাবুকে বলে দিই! মনে হলো বলি, যে 'ফক্সল্যান্ড' থেকে আমি অনেক নীচে নেমে এসেছি। আমার আর এখন মাথা ঘোরে না, পুরানো স্মৃতিকে আঁকড়ে ধরেও আর বসে থাকি না বা তা রোমন্থন করি না! আগের মতো অত চঞ্চলতাও আমার মধ্যে নেই, কোন বিষয়েই আর আমার কোন তাড়া বা আগ্রহ নেই। কিন্তু কেন জানি না, কথাগুলি আর বাবুকে বলা হয়ে উঠল না। তিনি ততক্ষণে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, পাহাড়ের উপর মনোযোগ সহকারে সূর্যাস্ত দেখছেন। সূর্যাস্তের রক্তবর্ণের ছটা পাহাড়ের বরফের উপর ছড়িয়ে পড়েছে—কেউ যেন তাতে সিঁদুর ঢেলে দিয়েছে। জানলা থেকে বাবু মুখ ফেরালেন। তাঁর দু'চোখের কোল ভিজে।

—“শোন, কায়া।” তিনি তাঁর হাত স্নেহভরে আমার মাথার উপরে রাখলেন। কিন্তু তক্ষুনি সে হাত তিনি তুলে নিলেন। স্নেহের আতিশয্য প্রকাশ হয়ে পড়াতে বোধকরি তিনি লজ্জা পেলেন। কথার খেই ধরে তিনি আবার বলে চলেন—“শোনো, তুমি এখানে একা একা দিন কাটাও, এটা তোমার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। হোস্টেলের মেয়েরা সব তোমার বয়সী, সেখানে তোমার ভালো লাগবে।” —বাবুর গলার স্বর মৃদু থেকে মৃদুতর হয়ে গেল। সেই কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সন্ধ্যায়, একা ঘরে বসে মনে হচ্ছিল বাবু যেন কোন চাপা অপরাধবোধ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে চাইছেন। তাঁর এত আস্তে কথা না বললেও চলতো—কেননা, সে ঘরে আমরা ছাড়া আর কোন তৃতীয় ব্যক্তি নেই। অন্তত ঠিক সেই মুহূর্তে আমার তাই-ই মনে হয়েছিল।

... কিন্তু এত বছর পরে, বিকেলের সেই দৃশ্যটি যখন আমি মনে করার চেষ্টা করি—আমার এসব কিছুই মনে পড়ে না—এমনকি বাবুর মুখটাও চোখের সামনে ভাসে না। বরঞ্চ আমার মনে পড়ে রাতের বেলা বিছানায় শুতে এসে আমার চোখের সামনে আমার অদেখা হোস্টেলটা ভেসে উঠেছিল—বাড়িটা সাদা ধবধবে, প্রতি বছর বরফ পড়বে, হোস্টেলের দেওয়ালে বরফ ভেঙে গিয়ে ছোট্ট একটা ফাটলও দেখা দেবে ... আর সেই ফাটলের মধ্যে দিয়ে আমি আবার এই চির পরিচিত জগতে ফিরে আসব—যেখানে মা আছেন, বিরু আছে, ছুটু রয়েছে ...

আমি সব্বাইকার সঙ্গে দেখা করে সেই ফাটল দিয়ে আবার হোস্টেলে ফিরে যাব, ফাটল আবার বন্ধ হয়ে যাবে। আবার পরের বছর বরফ পড়লে ঠিক এইভাবেই তাদের মাঝে ফিরে যাব ... যাওয়া-আসার পালা এভাবেই চলতে থাকবে। ... এটা ভাবতে-ভাবতে আমি ঘুমিয়ে পড়ার চেষ্টা করলাম। আমার মনের মধ্যে একটি আশা বারবার জেগে উঠেছে যে সকাল হতে না হতেই মা এসে যেন সস্নেহে আমায় ঘুম থেকে তুলে বলবেন—"কায়া, তুই কোথাও যাবিনে মা, যা শুনেছিস ও দেখেছিস—তা স্বপ্ন বৈ আর কিছুই না!"

কিন্তু ওই সাদা ধবধবে চাদর? সেও কি স্বপ্ন? চাদরগুলো যেমন সাদা, তেমনই ঠাণ্ডা। আজ যখন আমি সেদিনের বরফ পড়ার কথা মনে করি, তখন মিস্ জোসুয়ার চাদরের কথা মনে পড়ে যায়। মিস্ জোসুয়া ও তাঁর চাদরের মধ্যে কোনই যোগাযোগ নেই। আসলে আমার এক স্মৃতির সঙ্গে আরেক স্মৃতি এত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে যে একটাকে টান মেরে তুললে, অন্যগুলিও পটাপট ম্যাজিকের সুতোর মতো একের পর এক উঠে আসে। ওই চাদরগুলি বরফের মতো ধবধবে সাদা, একেবারে আনকোরা নতুন!

এই চাদর যে কবে কেনা হয়েছে, তা আর কারুর মনে নেই। সকলের মুখে এক কথা তখন—"মিস্ জোসুয়াকে আমাদেরই তো দেখতে হবে।" বিশেষত মঙ্গতুর মুখে কথাটা বারবার শোনা যায়। সে বলে এবং তাঁর দেখাশোনাও করে। ... মিস্ জোসুয়া একেবারেই শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছেন। মঙ্গতু প্রতিদিন নীচে তাঁর ঘরে গিয়ে আগুন জ্বেলে দিয়ে আসে। আর আমাকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখলে তো কোন কথাই নেই। মা কেবল তাড়া দেন—"ওরে, এখানে বসে না থেকে নীচে চলে যা না ... সে বেচারী একা পড়ে রয়েছে।" আমি আশ্চর্য হয়ে ভাবি। এই কয়েকদিনের অসুস্থতায় মিস্ জোসুয়া সকলের কাছে স্রেফ 'তিনি', 'উনি' আর 'সে' হয়ে উঠেছেন। তাঁর নামটা কি সকলে ভুলে গিয়েছে? নাকি তিনি এখন শুধু অন্ধকার ঘরে শরীর সর্বস্ব হয়ে পড়ে রয়েছেন বলে তাঁর অস্তিত্বই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে? ভেবে অবাক হতে হয় যে মিস্ জোসুয়া তো চিরকালই একা থেকেছেন। তবে আজ হঠাৎ কেন তাঁর 'একা' হওয়া নিয়ে, 'একা বেচারী'র দেখাশোনা করা নিয়ে কেন সবাই উদ্বেগে মুখর? কই, এতদিন তো তাঁর কথা কারুর মনে পড়েনি?

মিস্ জোসুয়া কোনদিনই বাড়ির বাইরে বেশি বেরোন-টেরোন না। এখন তো শয্যাশায়ী হয়ে পড়ার পর কথাই নেই! তাঁর বাড়ির গেটের কাছে বরফ জমে গেলে আমাতে আর মঙ্গতুতে মিলে পালা করে করে সেগুলো পরিষ্কার করি। আমি আজকাল প্রায়শই তাঁর ঘরে সন্ধেটা কাটাই। তাঁর দেখাশোনা হবে বলে ততটা নয়, যতটা আমার নিজের নিরাপত্তা হবে বলে। তাঁর সান্নিধ্যে, তাঁর ঘরে একটি

নিরাপত্তার উষ্ণতা আমি চিরকালই পেয়ে এসেছি। মিস্ জোসুয়া বিছানায় শুয়ে থাকেন, আর আমি ইজিচেয়ারটা টেনে নিয়ে তাঁর কাছে বসি। ইজিচেয়ারটাও তাঁর মতো বৃদ্ধ হয়ে গেছে। চামড়ার গদিটা এখানে-ওখানে ছিঁড়ে গিয়ে এটি এখন একটি লোলচর্ম বৃদ্ধের মতো দেখায়। প্রথম প্রথম বিছানায় শুয়ে শুয়ে তিনি ফক্সল্যান্ডের বিষয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবকথা জিজ্ঞেস করতেন। আমিও মহোৎসাহে নিজের স্মৃতিভাণ্ডার তাঁর সামনে উজাড় করে ঢেলে দিতাম। কিন্তু কিছুক্ষণ ফক্সল্যান্ডের গল্প শুনতে শুনতে তাঁর মন অন্য কোথাও উধাও হয়ে যেত। তারপর হঠাৎ তিনি কুড়ি-তিরিশ বছর আগেকার গল্প শুনতে চাইতেন—আমারও জন্মের আগেকার কথা। আমি তো এ বিষয়ে কিছুই জানি না! তাঁকে কি বলব? কিন্তু মিস্ জোসুয়ার এতে কিচ্ছু যায় আসে না। তিনি আজকাল সর্বদাই যেন কোন এক অপার্থিব আনন্দে মশগুল হয়ে থাকেন। একদিন শুধু আমি মিস্ জোসুয়ার মুখে দুঃখের কালো ছায়া দেখেছি—যেদিন ঝড়ে খুবানী গাছটা ভেঙে পড়ে গিয়েছিল। অদ্ভুত ব্যাপার! ঠিক সেদিনই তাঁর লেটার বক্সটাও কোন মন্ত্রবলে যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। আরও অবাক কাণ্ড! তার হদিশ এত খোঁজাখুঁজি করেও কোথাও পাওয়া গেল না। —"কি করে যে এত বড় একটা লেটার বক্স গায়েব হয়ে গেল!" মিস্ জোসুয়া আকুল হয়ে বারবার আমায় জিজ্ঞেস করতে লাগলেন। —"কাল রাতে ঝড় উঠেছিল না! কালকে অত বড় খুবানীর গাছটাও তো ভেঙে চুরে পড়েছে। লেটার বক্সটাও হয়ত ঘটনাচক্রে কোথাও উড়ে-টুড়ে ..." আমি আমতা আমতা করে বললাম। মিস্ জোসুয়ার এখন আর গাছ-গাছালিতে কোন টান নেই। নিজের অতবড় বাগানটাকে যে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন—তার প্রতিও আর তাঁর কোন আগ্রহ নেই। কত যত্ন করে এই বাগানটিকে তিনি গড়ে তুলেছিলেন—তিনি যখন প্রথম প্রথম এই শহরে আসেন। ... ফেব্রুয়ারী মাস প্রায় শেষ হতে চলল। মিস্ জোসুয়ার গাছে কচি পাতার সমাগম হতে শুরু করেছে ... আমি তাঁর বালিশটা মাঝে মাঝে উঁচু করে দিই—তিনি আধশোয়া হয়ে বাইরের দৃশ্য দেখেন। কিন্তু তাঁর চোখে ভাবলেশহীন দৃষ্টি—সে চোখে কোন ঔৎসুক্য নেই, নেই কোন পরিচিতির অভিব্যক্তি। তাঁর এই ভাবলেশহীন মুদ্রা দেখে এক এক সময় আমি আতঙ্কিত হয়ে উঠি, ভয় পেয়ে যাই। চলন্ত রেলগাড়ি ধরতে না পেরে যেমন কোন যাত্রী অসহায়ভাবে ছুটতে থাকে, অন্যান্য সহযাত্রীরা মরিয়া হয়ে তার হাতটা টেনে ধরে তাকে তোলার বৃথা চেষ্টা করে, ঠিক তেমনই যেন মিস্ জোসুয়া ধীরে ধীরে বহুদূরে সরে যাচ্ছেন, অন্ধকারে তলিয়ে যাচ্ছেন। আমি যেন ট্রেনে যাত্রারত যাত্রী ... প্রাণপণে তাঁর হাত ধরে টেনে তোলার বৃথাই চেষ্টা করে চলেছি।

—"মিস্ জোসুয়া, মিস্ জোসুয়া" আমি আকুল হয়ে ডেকে উঠতে যাই। হঠাৎ তিনি চোখ খোলেন।

—"তুমি কোথায়, কায়া?"

—"এই তো, আমি আপনার সামনেই বসে। কি চাই বলুন?"

ভদ্রমহিলা এদিকে-ওদিকে অসহায়ভাবে তাকাতে লাগলেন। তাঁর প্রয়োজনের তাগিদ যেন বাইরে রাখা রয়েছে। প্রস্রাব পেলেও তিনি বুঝতে পারেন না তাঁর শরীরের মধ্যে কি অস্বস্তি হচ্ছে! বাথরুমে গিয়ে যে তিনি হাল্কা হয়ে আসতে পারেন —সে বোধও তাঁর আস্তে আস্তে কমে যাচ্ছে। তিনি ছটফট করতে থাকলে যখন আমি তাঁর হাত ধরে বাথরুমে নিয়ে যাই, তিনি অভিভূত হয়ে পড়েন। যেন আমি ম্যাজিকের মতো তাঁর অস্বস্তি বুঝতে পেরে তাঁকে বাথরুমে নিয়ে এসেছি আর তাঁর সে অস্বস্তি ছোট্ট একটি জলের ধারায় বেরিয়ে গেল। তিনি বাথরুমে গেলে আমি দরজার ধারে দাঁড়িয়ে থাকি। দরজার ধারে দাঁড়িয়ে আমার নিজেদের ছোট্ট বেলাকার কথা মনে পড়ে যায়। আমি আর ছুট্টু জল্পনা-কল্পনা করতাম যে মিস্ জোসুয়ার মতো ধবধবে সাদা মেমসাহেব কি কমোডের উপর বসার মতো নোংরা কাজ করেন, যা আমরা এই দেশের বাসিন্দারা করি? এই ধরনের কথাকে আমরা 'অসভ্য' কথা বলে ভাবতাম। এখন কিন্তু স-ব স্বাভাবিক বলে মনে হয়। মিস্ জোসুয়া বাথরুমে, আর আমি বাইরে দাঁড়িয়ে। মিস্ জোসুয়ার অসুস্থতা যেন তাঁকে আমাদের কাছাকাছি এনে দিয়েছে। তাঁর ঘরে এলে পর তাঁকে তাঁর অগোছালো, এলোমেলো বিছানায়, ঢিলেঢালা পেটিকোটে পাউডার, ঘামে ও প্রস্রাবের গন্ধে বড় অসহায় দেখায়। তবুও যেন তিনি অন্যের তুলনায় একটু অন্যরকমের! আমি অবশ্য তখন তাঁকে ঠিক বুঝতে পারিনি। আজ বুঝতে পারি যে তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তাঁর এতদিনের একা একা বাস করারই সফল পরিণাম। তিনি নিজের চতুর্দিকে এমন একটি সুরক্ষিত বলয়ের সৃষ্টি করে নিয়েছিলেন যে সেটি ভেদ করে ভিতরে ঢুকে তছনছ করার সাধ্য কারুর ছিল না। তিনি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্না মহিলা!

তাঁর ঘরে ঢুকে তাঁর উষ্ণ সান্নিধ্যে আমিও যেন সবকিছু ভুলে যাই। তিনি চোখ বুজে শুয়ে থাকেন আর আমি চুপটি করে বসে বসে তাঁকে দেখি। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস ধীরে ধীরে গভীর হয়ে ওঠে, বাইরের পাহাড়েও অন্ধকার নেমে আসে। উনি ঘুমিয়ে পড়েছেন ভেবে ধীরে ধীরে আমি যেতে উদ্যত হলেই উনি চোখ খুলে বলেন —"কায়া, যাচ্ছ?"

—"না, মানে ভাবলাম যে আপনি ঘুমিয়ে পড়েছেন, তাই ..."

—"না ঘুমোচ্ছি না। ঘুম আর আসে কই?" —আমি তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। না ঘুমোলে তিনি এতক্ষণ কোন রাজ্যে হারিয়ে গিয়েছিলেন? কোথায় যান উনি বারবার? গিয়ে আবার ফিরে আসেন?

সেদিন বিকেলে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি যে তাঁর শয্যা খালি পড়ে রয়েছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে তারপর দেখা গেল যে তিনি তাঁর রাইটিং টেবিলটার সামনে বসে। টেবিলের ড্রয়ারগুলি খোলা, চারদিকে কাগজপত্র ছড়িয়ে রয়েছে। তাঁর সাদা ধবধবে সিল্কের মতো চুলে টেবিল ল্যাম্পের আলো এসে পড়েছে। লম্বা পানের মতো মুখ, রোগা লিকলিকে শরীর, তার উপর তাঁর লম্বা স্কার্টটা দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন বাঁশের আগায় একটা কাপড় ঝুলছে। তাঁর এক হাত ড্রয়ারে ন্যস্ত—বোধকরি কিছু বের করতে গিয়ে হাতটা টেনে আনার কথা আর খেয়াল নেই। আর একটি হাত চেয়ারের হাতল বেয়ে ঝুলছে। ঘরের মধ্যে একটা চাপা আলো—বরফ পড়ার সময়ে এমন আলো দেখা যায়। সেই আলোয় সব কিছু কেমন রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

সেখানে দাঁড়িয়ে হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল যে মিস্ জোসুয়ার এইরকম একলাপনার দৃশ্য আমি আগেও দেখেছি, যখন তাঁর বিষয়ে ভেবেছি। সেদিন বিরুর সঙ্গে গির্জায় গিয়ে যখন তাকে খুঁজছিলাম, তখন মিস্ জোসুয়ার কথা ভেবেছি আর ঠিক এইরকমই একটি ছবি আমার চেখের উপর ভেসে উঠেছিল।

এখন সেটি বাস্তবে পরিণত হয়েছে। তিনি একা এভাবে বসে আর আমি তা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। আজকের এই ঘটনাটির সঙ্গে অনেক আগে আমার চিন্তার ফসল সেই ঘটনাটি যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত হয়ে আছে। আজকের শীতে আচ্ছন্ন ম্লান আলো, ময়লা বরফের স্তূপ আর সামনে চেয়ারে বসা মিস্ জোসুয়ার অনড় দেহ দেখে আমার মনে হলো—এই দৃশ্য যেন নতুন কিছু নয়, এই দৃশ্যের অবতারণা আগেও হয়েছে। এখন যা ঘটছে তা পূর্বের ঘটনার পুনরাবৃত্তি মাত্র। সে যেন একটি রিহার্সাল ছিল, তারই স্মৃতি আমার মনের মধ্যে গেঁথে আছে। আমি যেন সে ঘটনার একজন সাক্ষী মাত্র। এখন দাঁড়িয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি; —হ্যাঁ কায়া, এক সন্ধ্যায় তুমি মিস্ জোসুয়ার ঘরে গিয়েছিলে, তখন তিনি টেবিলের সামনে স্থির হয়ে বসেছিলেন ... চেয়ারে তাঁর হাত ঝুলে পড়েছে, টেবিলের উপর তাঁর পুরানো চিঠি ডাঁই করা রয়েছে—হলদে হয়ে যাওয়া পুরানো থিয়েটার ও কনসার্টের ফটো সব ছড়িয়ে রয়েছে। আমার পায়ের শব্দ পেয়ে মিস্ জোসুয়া চোখ মেলে তাকালেন। একটু লজ্জাও পেলেন।

—"এক্ষুনি এসেছ?"

—"হ্যাঁ মিস্ জোসুয়া ... আলোটা জ্বেলে দিই?"

—"না, না! টেবিলল্যাম্পের আলোই যথেষ্ট ... জানলাটা বরং খুলে দাও। আজ বড় গরম। আমি দুপুরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙে ওঠার পর বুঝতে অনেকক্ষণ সময় লেগেছে যে এই অন্ধকারটা ভোরের না সন্ধ্যার।"

আমি জানলাটা খুলে দিলাম। ফুরফুরে বাতাস ঘরে এসে ঢুকলো। টেবিলের

কাগজপত্র সড় সড় করে শব্দ তুলল। বাইরে ফেব্রুয়ারী মাসের শান্ত, পরিষ্কার রাত—কুয়াশার নামমাত্র নেই। অন্ধকারেও মিস্ জোসুয়ার বাগানের গাছ বেশ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

—"জানো কায়া, আমি না একটা অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি।"

—"কি স্বপ্ন?" আমার তাঁর রকম-সকম ভালো লাগছিল না। চেয়ারে বসে, সামনে ল্যাম্প জ্বালিয়ে কি কেউ ঘুমোতে পারে?

—"একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। জানি না, এটা স্বপ্ন না সত্যি ... আমি না একটা বিরাট লম্বা চিঠি লিখছিলাম। কিন্তু শেষটা ... জানি না কেন ... কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না। প্রতিবারই লেখার সময় আমি উপসংহারটা বদলে দিই।"

টেবিলল্যাম্পের আলোটা সরাসরি মিস্ জোসুয়ার মুখের উপর পড়ছে। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর চোখে একটি গভীর দৃষ্টি, সে দৃষ্টিতে বিস্ময়!

—"উপসংহারটা বদলে ফেলেন?"

—"হ্যাঁ, অনেক বছর আগে আমি একটা চিঠি লিখেছিলাম। আজও সেই চিঠিটা আমি স্বপ্নে দেখি—স্বপ্নের মধ্যেও চিঠিটা লিখি—কিন্তু ... কিন্তু ... তার শেষটা যে বারবার বদলে যায় .... কিছুতেই মনে করতে পারছি না আমি শেষে কি লিখেছি?"

মনে হচ্ছে উনি প্রলাপ বকছেন। কিন্তু তাঁর মনের গহনে কি লুকিয়ে আছে, যা তিনি ব্যক্ত করতে পারছেন না? উনি কোনদিনও নিজের অতীতের কোন কথা আমাদের বলেননি। তাঁর যে কোন অতীত থাকতে পারে, সে ধারণাই আমার নেই।

মিস্ জোসুয়া কাঁপছিলেন ... তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে গিয়েছে। আমি তাঁর হাত ধরে বললাম—"মিস্ জোসুয়া, এবার একটু শোবেন?" মিস্ জোসুয়া মাথা তুলে ফ্যালফ্যাল করে আমার দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর বাধ্য মেয়ের মতো বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁর গায়ে লেপটা ঢেকে দিলাম। তাঁর গায়ে আমার হাত পড়তেই আমি চমকে উঠলাম—ইস্, জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। ... শরীরে তো আর কিছুই নেই, হাড়ের খাঁচার উপর শুধু চামড়ার আবরণ। জ্বরের তাপে তাঁর এই হাড়ের খাঁচাটা ধক্‌ধক্ করে কাঁপছে।

—"কায়া, তোমার দেরি হয়ে যাচ্ছে না তো?"

—"না, মিস্ জোসুয়া, এই তো সবে সন্ধ্যা রাত্তির!

—"ছুট্টু চলে গেছে?"

—"ছুট্টু?" আমি অবাক হয়ে তাকাই—"মিস্ জোসুয়া, ছুট্টু তো মীরাটে!"

—"তাহলে কোন চিন্তা নেই ..." তিনি লম্বা শ্বাস টানলেন—"তোমাদের দু'ভাই বোনের মধ্যে একজনের সর্বদা উপরে থাকা উচিত।"

ভদ্রমহিলা আবার প্রলাপ বকতে লাগলেন। এক একসময় তাঁর অসংলগ্ন

প্রলাপে মনে হচ্ছিল যে তিনি বোধহয় ইহজগত ছাড়িয়ে অন্য কোন দুনিয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছেন। চোখের সামনে থেকেও তিনি যেন বারবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছেন।

—"কে চেঁচাচ্ছে রে?"

—"কেউ না ... আমি ...।"

—"তুমি চেঁচাচ্ছিলে কায়া?"

—"আপনি ..."

—"আমি?"

মিস্ জোসুয়ার কপালে কুঞ্চন, কিন্তু শরীরে যন্ত্রণার কোন লক্ষণ নেই। এক এক সময় চোখ বুজে তিনি এমনভাবে মুখ বিকৃত করছেন যেন তাঁকে কেউ বিচ্ছিরি, তেতো ওষুধ খাইয়ে দিচ্ছে—যেটি তিনি গিলতেও পারছেন না, ওগরাতেও পারছেন না। কিন্তু এই বিকৃতি বেশিক্ষণ থাকছে না। অসুখের যন্ত্রণাও যেন তাঁর শরীরের ভিতর থেকে উঠে আসতে গিয়ে তাঁর দৃঢ় ব্যক্তিত্বের কাছে পরাজিত হয়ে ফিরে যাচ্ছে। কায়ার দিকে হঠাৎ তাঁর নজর পড়ে—

—"তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

—"আমি তো এখানেই, আপনার কাছটিতে বসে, মিস্ জোসুয়া!"

—"কে এসেছিল?"

—"এখানে তো কেউ আসেনি, মিস্ জোসুয়া! শুধু আপনি আর আমি রয়েছি।"

—"আমি আর তুমি? তবে এরা কেন আসে এখানে?"

—"কারা?"

—"কারা আবার? লোকেরা!" আমার দিকে তিনি ঘোলাটে চোখে তাকান।

বাইরের আলো নিভে গেছে। কিন্তু মিস্ জোসুয়ার মুখে এক অদ্ভুত আলোর আভা ... এখনও যেন আমি সে দৃশ্য দেখতে পাই। মিস্ জোসুয়া সব সময় চশমা পরে থাকেন। সেদিন তাঁর চোখে চশমা ছিল না। এই প্রথম আমি চশমা ছাড়া তাঁর খালি চোখ দেখলাম। সেই চোখে যুগপৎ কাঠিন্য ও অসহায়তা — দুই-ই ফুটে উঠেছে। আমি আগে বা পরে কোনদিনও কারো চোখে এমন পরস্পর বিরোধী ভাবের প্রকাশ দেখিনি।

—"কায়া!' আমার দিকে তাঁর স্থির দৃষ্টি—"আমার পাঠানো কেক পেয়েছিলে?"

—"হ্যাঁ ..." আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম।

—"খেয়েছিলে?"

আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারছিলাম না। যদি জানতাম যে আমায় এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে, তাহলে তাঁর স্নেহের অবদান সেই বাসি কেক কখনই নালায় ফেলতুম না। কিন্তু তখন অতশত কিছু বুঝতেই পারিনি। আমি অত্যন্ত

স্বার্থপর মেয়ে। শুধু নিজেকে নিয়েই থাকতে ভালোবাসি। শীতের সেই লম্বা, একঘেয়ে সময়টা শুধু নিজেকে নিয়েই কাটিয়েছি। কিন্তু মিস্ জোসুয়ার শয্যার পাশে বসে সেদিন আমার মনে হলো—আর নয়, নিজেকে আর শম্বুকের মতো গুটিয়ে না রেখে উন্মুক্ত করে মিস্ জোসুয়াকে কাছে টেনে নিই। যদিও জানি না, কাছে কী করে টানতে হয়, কী করে সেই মৃত্যুপথযাত্রিনীকে দুটো সান্ত্বনার কথা বলে শান্তি দিতে পারি।

আমি ধীরে তাঁর একটি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলাম। মিস্ জোসুয়া আর এবার তাঁর হাত টেনে নিলেন না।

—"কায়া, একটা কাজ করতে পারো?"

—"কি কাজ মিস্ জোসুয়া?" আমি একটু ভয় পেয়ে গেলাম।

—"আলমারির উপরের দেরাজে আমার চাদর আছে— বের করে দেবে?"

—"চাদর? এখন চাদর দিয়ে কি হবে মিস্ জোসুয়া?" আমি অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলাম। মিস্ জোসুয়া আবার প্রলাপ বকতে শুরু করেছেন।

—"বড্ড গা ঘিন্ ঘিন্ করছে রে ... কাল সকালে ঘুম থেকে উঠেই চাদরটা পাল্টে ফেলব।"

আমি কিছুক্ষণ কি করব, ভেবে পেলাম না। তারপর উঠে দাঁড়ালাম। এবার তাঁর অনুমতি না নিয়েই বাতি জ্বালিয়ে, স্টুলের উপর চেপে, আলমারিটা খুলে ফেললাম। ইস্ ... আলমারির নীচের তাকে একগাদা ময়লা কাপড়, উপরে হ্যাঙারে গোটা তিন লম্বা কোট টাঙানো। কোনদিনও আমি তাঁকে এগুলো পরতে দেখিনি। বেওয়ারিশ লাশের মতো এগুলো পড়ে আছে। আরও একটু উপরে বরফের মতো ধবধবে সাদা চাদর সুন্দর করে ভাঁজ করা রয়েছে। হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম — একদম বরফের মতো কনকনে ঠাণ্ডা চাদর। কে জানে, কতবছরের কত পরত বরফ জমা হয়ে আছে এতে! আমি চাদরটা নামিয়ে নিয়ে এক কোণে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। মিস্ জোসুয়া এবার উঠে বসলেন।

—"দেখিতো, ভাঁজে-ভাঁজে থেকে খারাপ হয়ে যায়নি তো চাদরটা?"

আমি চাদরের বান্ডিলটা তাঁর সামনে রেখে দিলাম। তিনি পরম স্নেহে চাদরের গায়ে হাত বোলাতে লাগলেন। তাঁর মুখে এক অনির্বচনীয় আনন্দ ফুটে উঠেছে।

—"আমি দিল্লী থেকে এগুলো কিনেছিলাম।" তিনি খুব ধীরে বললেন। তাঁর স্বরে উদাসীনতা ... যেন চাদর কেনার প্রসঙ্গ ধরে তিনি আরও অনেক কিছু বলতে চাইছেন।

—"মিস্ জোসুয়া, আপনি দিল্লীতেও ছিলেন?"

—"তাই-ই তো ছিলাম।" উনি যেন একটু আহত হলেন খবরটা আমি জানি না শুনে। —"প্রথমে আমি তো সেখানেই ছিলাম ... এখানে তো অনেক পরে

এসেছি। আমার সমস্ত কাজের জিনিস দিল্লী থেকেই কেনা ...।''

তাঁর দৃষ্টি ঘরের আনাচে-কানাচে ঘুরতে লাগল—গ্রামোফোন, পুরানো রেকর্ড, আলমারির মাথায় রাখা বহুদিনের অব্যবহার্য সুটকেস। তাঁর দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্র এমন করে প্যাক করে রাখা রয়েছে যেন তিনি বাড়িতে নয়, কোন হোটেলে আছেন—যতটুকু দরকার তার বেশি জিনিস খুলে তিনি ছড়িয়ে রাখেন না।

—''মিস্ জোসুয়া, চাদরটা পাল্টে দিই?'' আমি বললাম।

—''না, থাক্ ...'' তিনি আবার নিস্তেজ হয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

—''এগুলোকে টেবিলের উপর রেখে দে ... কাল সকালে আমি নিজেই পাল্টে নেব'খন।''

মিস্ জোসুয়া লেপের বাইরে হাত বের করে আমার হাঁটুর উপর রাখলেন। তাঁর হাতটি রোগা ও সরু, কিন্তু কী ফর্সা! হাতটি গরম ও ঘামে ভিজে রয়েছে। তার উপর নীল শিরাগুলি কি স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে।

—''এটা কোন মাস চলছে রে, কায়া?''

—''ফেব্রুয়ারী।'' আমি উত্তর দিলাম। মিস্ জোসুয়া জানলার বাইরে তাকিয়ে ছিলেন। —''মার্চ মাসে বরফ গলতে শুরু করবে, তখন তোর স্কুলও খুলবে।'' আমি তাঁকে কী করে বলি যে স্কুল খুললে পর আমি এখানে থাকবো না—হোস্টেলে চলে যাব, সেখানেই থাকবো। কিন্তু আমি কোন কথা না বলে চুপ করে রইলাম। নিজের কথা এখন আমার নিজের কাছেই খেলো লাগছে। মনে হচ্ছে আমি তাঁকে স্বার্থপরের মতো আঁকড়ে ধরতে চাইছি, আর তিনি আস্তে আস্তে দূরে সরে যাচ্ছেন।

মিস্ জোসুয়া চোখ বুজলেন। তাঁকে এখন শান্ত, সমাহিত দেখাচ্ছে। যেন তিনি বরফ গলার অপেক্ষা করছেন। .... এখন কোত্থাও কোন শব্দ নেই, শুধু একটা পাখি চ্যাঁ চ্যাঁ করে ডাকছে—এক ডাল থেকে অন্য ডালে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। আমি হঠাৎ উপলব্ধি করলাম মিস্ জোসুয়ার বাড়ির পাঁচিলে অচিন পাখির কালো ছায়া ঘনিয়ে আসছে—তার মূক আর্তনাদ থেকে থেকে অন্তরাত্মা কাঁপিয়ে দিয়ে চরাচর স্তব্ধ করে দিচ্ছে।

... আমি যেতে উদ্যত হলাম ... একটুক্ষণ দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আবার পিছন ফিরে তাঁকে দেখলাম। মিস্ জোসুয়া ঘুমোচ্ছেন ... বড় নিশ্চিন্তের নিদ্রা যাচ্ছেন ... বাইরের শব্দ, জঙ্গলের সর্ সর্ আওয়াজেও তাঁর শান্তিভঙ্গ হচ্ছেনা। তাঁর চোখের পাতাদুটি মার্বেল গুলির মতো গোলগোল করে ফুলে উঠেছে। মিস্ জোসুয়াকে ওই অবস্থায় দেখতে দেখতে আমার মন আবার ফক্সল্যান্ডে চলে গেল —বিরুর ঘরের দরজার কাছে ... যেখানে পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ ভেসে আসছে। আমার মনের মধ্যে এক একসময় সবকিছু বিকল হয়ে স্তব্ধ হয়ে যায়। এমন অভিজ্ঞতা আমার আগেও

হয়েছে, যা মনে হয়েছে যা হচ্ছে বা হতে চলেছে তা যেন ইহজগত ছাড়িয়ে অন্য জগতের কোন অলৌকিক ঘটনা। কিন্তু তার আভাস আমি এই জগতেই পাচ্ছি। এমন ঘটনার আভাস পেয়েছি কাকার সঙ্গে তাঁর বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে টেনিস কোর্টের দিকে দেখার সময়, কখনও নিস্তব্ধ দুপুরে একা একা যখন আমি জঙ্গলের মধ্যে হেঁটে বেড়িয়েছি, আর এখন এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি মিস্ জোসুয়ার দরজার চৌকাঠে দাঁড়িয়ে—তিনি পরম আরামে, নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছেন।

এমন অদ্ভুত অভিজ্ঞতা কেন হয়? এর সমাধান কি কেউ আমায় দিতে পারবে?

সেই রাতে আমিও খুব ঘুমিয়েছিলাম—এমন গভীর নিশ্চিন্তের ঘুম বহুদিন ঘুমোইনি। সকালে ঘুম ভাঙলে দেখি পাহাড়ের চারদিকে ধুলো জমে রয়েছে, আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই। বাড়ি একেবারে চুপচাপ। নির্জন। সব ঘর খালি পড়ে রয়েছে। কোথায় গেল সব? ... বারান্দায় বেরিয়ে এলাম। নীচে কথাবার্তার আওয়াজ শোনা যাচ্ছে।

দেখি, বাড়ির সকলে নীচে দাঁড়িয়ে—মিস্ জোসুয়ার ঘরের সামনে ফিসফিস করে কথা কইছে। মা, মঙ্গতু, বাবু, পাড়া-প্রতিবেশীরা! আজ এতদিন পরেও তাদের সকলকে আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাই। মিস্ জোসুয়ার বাগানের গাছপালা, তার নীচে মানুষের জটলা, ভৌ ভৌ করা রাস্তার খেঁকি কুকুরের দল।

কি হয়েছে? ওখানে অত ভীড় কেন?

আমি নীচে এসে দাঁড়ালাম। তখনও বুঝতে পারিনি যে মিস্ জোসুয়া ইহলোকের মায়া কাটিয়ে চলে গিয়েছেন। ... এ যে অবিশ্বাস্য, অসম্ভব! আজ এমন সুন্দর দিনে — আকাশ পরিষ্কার ঝরঝরে নীল, চমৎকার রোদ উঠেছে। এমন দিনে কি কেউ মরে যেতে পারে? না ... না ... এ ভুল ... এও এক ভ্রান্তি ...

মা আর বাবু চুপচাপ বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মঙ্গতু আমায় দেখতে পেয়ে হাত ধরে পা টিপে টিপে ঘরের ভিতরে নিয়ে গেল—খুব সন্তর্পণে আমরা ঘরে ঢুকলাম—পাছে মিস্ জোসুয়ার ঘুম ভেঙে যায়।

মিস্ জোসুয়া সত্যি সত্যিই ঘুমোচ্ছেন—পরম আরামে, চিরশান্তির নিদ্রা। কিন্তু ... কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না। কালও খাটের উপর মিস্ জোসুয়া ঘুমোচ্ছিলেন, আজও ঘুমোচ্ছেন। কাল তিনি ছিলেন—আজ তিনি নেই! কিন্তু কই, কিছু তো বদলায়নি? তবে মৃত্যু কি করে এলো? কাল রাতে তিনি যে টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে বসেছিলেন—সে জায়গায়ও তো কোন পরিবর্তন আসেনি? সব যেমন-কে তেমন রাখা আছে! খাটের সামনে টেবিলের উপর ঠিক সেইভাবেই চাদরটা ভাঁজ করা—অক্ষতযোনী কুমারীর মতো আনকোরা টাটকা, ধবধবে ও হিমশীতল, তবে? মৃত্যুর পরশ কোথায়? কেমন করে সে এলো? ... না, ছোট্ট একটি পরিবর্তন, তুচ্ছ একটি

চিহ্ন সেই করাল কাল ছেড়ে গেছে। মিস্ জোসুয়ার একটি হাত কনুইয়ের ভরে খাড়া হয়ে আছে। রাতে কি তিনি কাউকে হাত নেড়ে ডাকছিলেন? তিনি অনেক দূরে চলে গেছেন ... কিন্তু তাঁর হাত নেড়ে ডাকার সঙ্কেতটা এখনও জীবন্ত হয়ে রয়েছে!

—"মিস্ জোসুয়া ... মিস্ জোসুয়া ... আ ... আ!" আমি চিৎকার করে কেঁদে তাঁর শয্যার পাশটিতে দৌড়ে গেলাম। মঙ্গতু আমার হাত ধরে টেনে নিল। আমার চোখের সামনে সব আবছা হয়ে গেল—রোদ ঝিলমিল করা নীল আকাশ, বাগানে শিরশির করা গাছের পাতা আর ফিসফিস করা পাড়া-প্রতিবেশীর দল। এরা ... এরা এখানে কেন এসেছে? কি করছে সব দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? আমি ... আমিই বা এখানে কেন ... কি করছি? কি হয়েছে আমার ...? ধীরে ধীরে সকলে ফিরে গেল ... শুধু নেড়ি কুকুরের দল বারান্দায় বসে ... থেকে থেকে ভৌ ভৌ করছে।

আমি নীচে নেমে যেতে লাগলাম। কি সুন্দর ঝকঝকে দিন! গাছের তলায় বরফ গলে একটা ছোট চৌবাচ্চা তৈরি হয়ে গেছে। আমার বাড়িতে আর ভালো লাগছে না ... আমি মুক্তি চাই। আমি অনেক নীচে, রেললাইনের ধারে চলে এসেছি। রেললাইনটা সুড়ঙ্গের নীচে কেমন সাফ সুতরো চকচকে দেখাচ্ছে। লাইনের দু'ধারে ঝোপ, তার নীচে বরফ গলা নোংরা জল ক্ষেতের মধ্যে ছোট ছোট নালি দিয়ে চলে গিয়েছে।

আমার মনে পড়ছে না—আমি কখন ও কেমন করে এই সুড়ঙ্গের নীচে চলে এসেছি। ক্ষেতের মধ্যে ছাগল ও ভেড়ার দল চরে বেড়াচ্ছে, মাঝে মাঝে তাদের ব্যা-ব্যা রব শোনা যাচ্ছে। এরই পাশের ঝোপটা আমার বড় চেনা!

সব একে একে চলে গেল। লামা নিজের পথ বেছে নিয়েছে। মিস্ জোসুয়াও সকল সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পেয়ে সেখানে অন্তর্ধান করেছেন। আমি কার টানে এখানে বসে আছি? কার পথ চেয়ে আছি? আমি তো সদাই ভয় ও আতঙ্কের হাত থেকে রেহাই পেতে ছটফট করেছি। কিন্তু ফেব্রুয়ারী মাসের মিঠে রোদের দুপুরে ওই সুড়ঙ্গের উপর বসে বসে মনে হলো—আমি নিজের উপরেই নিজে একটা ভারের মতো চেপে বসে রয়েছি। যতক্ষণ না আমার 'আমি' মুক্তি পাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার এই জড়ভরত দেহের বোঝা আমায় টেনে বেড়াতেই হবে। একদিন এই মুক্তি পাবার জন্য আকুলতা আমি গিনীর স্বচ্ছ নীল চোখের মধ্যে দেখেছি। (লামা তাকে 'আত্মা' আখ্যা দিয়েছিল)। গিনীর সেই আর্তি, সেই ছটফট করা ব্যাকুলতা এখন আমি আমার মধ্যে অনুভব করছি। কিন্তু আমার 'আমি' বড্ড ছোট-বড় সীমিত ... তাকে ধরে রাখার সাধ্য আমার নেই ... এই মুক্তির ব্যাকুলতা

আমার দেহের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করে চক্রাকারে ঘুরে চলেছে —সে যেন আবর্তের বাইরে আসতে পারছে না ... আমার নিজেকে উন্মোচন করে তাকে মুক্ত করতে হবে ... এই ব্যাকুলতার ভারী বোঝা আমি আর বইতে পারছি না ... তার উন্মত্ত ক্ষুধার নিবৃত্তি—সান্ত্বনার দু চারটি বাণীতে ভরিয়ে তোলা আর আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না ... আমি এবার তাকে ছেড়ে দেব—মুক্ত করব আমার 'আমি' হতে—এই স্বার্থপর আমি, যে আজ পর্যন্ত নিজের মধ্যেই কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে ... এক্ষুনি, এই মুহূর্তে—অন্যের কাছ থেকে নিজেকে মুক্ত করার পরিবর্তে—ওই উন্মত্ত, ক্ষুধার হাহাকার করা, অধীর অস্থির চিৎকার শূন্যে চক্রাকারে ঘোরা আমারই সত্তাকে আজ মুক্ত করে দেব ...

আমি বুক ভরে নিঃশ্বাস নিলাম—এই অনন্ত আকাশের নীচে, খোলা মুক্ত বাতাসে আজ আমি প্রথম নিঃশ্বাস নিলাম।

... দূর থেকে সেই শব্দ শোনা গেল .... সুড়ঙ্গের বাইরে থেকে সেটা ভেসে আসছে। সামার হিল-কালকার ট্রেন আসছে। রোজই এই সুড়ঙ্গের তলা দিয়ে যায়। পাখির দল কিচ্ কিচ্ করতে করতে ডানা মেলে রেললাইনের ধারে উড়তে লাগল। আমার মনের মধ্যে থেকে এক বিচিত্র আকুলতা যেন রুদ্ধ প্রাচীর ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল—সে আকুলতায় কোন দ্বিধা বা দ্বন্দ্ব নেই, সেখানে নেই কোন মলিনতা। সমস্ত শঙ্কা ও সন্দেহের উর্ধ্বে, জঙ্গলের গভীরতা নিয়ে যেন সে আমায় আমন্ত্রণ জানালে—মুক্তির আমন্ত্রণ—সে আমন্ত্রণে সকল কলুষতা মুছে যায়, সব জ্বালা ও যন্ত্রণার অবসান হয়—আলেয়ার মতো সে বারবার হাতছানি দিয়ে ডাকে—এই আমন্ত্রণ অমোঘ! আমি নীচে নামতে লাগলাম ... আরও নীচে ... এই শব্দ কতদূর পর্যন্ত পরিব্যপ্ত হয়ে আছে—কি অদ্ভুত তীব্র ... আমি এই শব্দ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলতাম। লামা বিদ্রূপ করে হাসত—"তুই একটা ভীরু, সবসময় নিজেকে বাঁচিয়ে চলিস, গায়ে আঁচটি পর্যন্ত লাগতে দিস না!" লামা কোনদিনই আমার উপর আস্থা রাখেনি। ট্রেনের ঘড় ঘড় শব্দ কাছে এগিয়ে এলো। আমার হঠাৎ ইচ্ছে করল যে রেললাইনের ধারে না থেকে আমি রেললাইনের মাঝে চলে যাই—রেললাইনটা দুপুরের উজ্জ্বল রোদে ঝকঝক করছে—কোন মালিন্য নেই সেখানে। এর মধ্যে আমি অভয়বাণী খুঁজে পাব—বিরুকে আমার একমাত্র সেটুকুই দেয়। এখানে আমার মুক্তির আস্বাদ আছে, আছেন আমার ঈশ্বর—যার কাছে গিয়ে আমি আমার মনের মালিন্য, অন্তরের ক্লেদ ধুয়ে মুছে ফেলতে পারি—আমার মতো ভীরু ও স্বার্থপর মানুষের পক্ষে এই পথই একমাত্র কাম্য! ... আমি ভীরু, কিন্তু সেই দুপুরে কোন্ এক অমোঘ নির্দেশে আমি আত্মবিস্মৃত হয়ে, মন্ত্রমুগ্ধের মতো স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করতে করতে সুড়ঙ্গের নীচে, রেললাইনের ধারে নেমে এলাম। লাইনের দুধারে সবুজ ঘাসের দল মাথা উঁচিয়ে রয়েছে। এই সময় আমার মন

একেবারে অসাড় হয়ে ছিল—কোন পিছুটান বা অনুতাপ অথবা কোন দুঃসহ যন্ত্রণা —কিছুরই বোধ নেই। ... আকাশে তার শব্দের গুঞ্জন ... ভীরু উড়ন্ত পাখির দল ... আর আমার মধ্যে এক নৈর্ব্যক্তিক উন্মত্ত আকুলতা ... যেন বহুবছরের পুরানো পুঁজে ভরা ক্লেদাক্ত বিস্ফোটকটা ফেটে গিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে ... সে শব্দ মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে ... আরও এগিয়ে ... আরও কাছে!

দূর থেকে ট্রেনটা দেখা গেল ... আর হঠাৎ এক দুরূহ যন্ত্রণার ঢেউ যেন আমার দেহের শিরায় শিরায় বয়ে গেল। আমার হাত সেই যন্ত্রণার উৎস খুঁজতে আমার শরীরের ভিতরে, জানুর কাছে গিয়ে পৌঁছল ... একটা চটচটে, গরম রক্তিম স্রাব আমার হাতে এসে লাগল, আমার পরণের জাঙ্গিয়ার মধ্যে দিয়ে তা বয়ে এসে আমার হাঁটুর উপর জমাট বাঁধতে লাগল ... এই কি পাহাড়ি ডালিমের রস? হঠাৎ মনে হলো, ঝোপের আড়ালে কেউ হেসে উঠলে। আমি এক ঝটকায় আমার হাত ভিতর থেকে বের করে ঘাসে মুছতে লাগলাম। সহসা মনে পড়ে গেল —এই ঘাস, এই ঝোপের মাঝে গিনীর রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। আমি সুড়ঙ্গ ছেড়ে আবার উপরে উঠতে লাগলাম ... উঠতে উঠতে ঘাস ও পাথরে হোঁচট খেতে খেতে পাকদণ্ডীর রাস্তা ধরে উর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলাম। সেই পাথরের চাতালটা নজরে পড়তেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। আর ... আর ... ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি হাল্কা বোধ করলাম ... আমি সমস্ত ক্লেদ ও গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে গেছি ... আমি মুক্ত ... স্বচ্ছ ও নির্মল ... আমার কল্পনার বিচিত্র শহর মাটির তলায় বসে গেছে ... চিরদিনের মতো তার বিলয় হয়েছে আর আমি সেই মরা শহরটার উপর বসন্তোদগমের কচিঘাসে ও কাদায় মাখা বরফে রক্তেভেজা হাতটা ঘসে ঘসে তুলে ফেলছি ... মুছে ফেলছি আমার ক্লেদাক্ত 'আমিকে' ... আমি নব কলেবরে, নবযৌবনা হয়ে উঠেছি .... আমি অন্তরের সব গ্লানি মিটিয়ে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে ... তাঁরও সীমানা পেরিয়ে গেছি ... □□

Printed at Impress Offset E-17, Sector 7, NOIDA-201301